☐ প্রথম প্রকাশ ঃ শ্রাবণ ১৩৬৬

☐ প্রকাশিকা ঃ লতিকা সাহা। মডার্ন কলাম। ১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯

☐ মুদ্রাকর ঃ অনিলকুমার ঘোষ। নিউ ঘোষ প্রেস। ৪/১ই, বিডন রো, কলকাতা-৬

☐ প্রচ্ছদ ঃ অনুপ রায়

প্রীতিভাজন নিখিল সেনের
স্মৃতির উদ্দেশে

□ লেখকদের গল্প □

ঈস্কাইলাসকে বলা হয় ট্র্যাজেডির জনক। আর সফোক্লিস ট্র্যাজেডির কুশলী শিল্পী। সফোক্লিসের বয়স যখন পঁচিশ তখন তিনি গুরু ঈস্কাইলাসকে নাটক প্রতিযোগিতায় পরাজিত করেছিলেন। এর আগে সফোক্লিসের কোনো নাটকই অভিনীত হয়নি। দর্শকদের সামনে প্রথম যে নাটকের অভিনয় হলো তা-ই তাঁকে অকস্মাৎ খ্যাতির শীর্ষদেশে স্থাপন করল।

এই সাফল্য সফোক্লিসের জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করল। অন্য সব কাজ ছেড়ে তিনি শুধু নাটক রচনায় মত্ত হয়ে গেলেন। দিনরাত্রি কেবল নাটক আর নাটক। একটা শেষ হয় তো আর একটা নতুন নাটক শুরু হয়। কেউ বাড়ী এলে নাটক পড়ে শোনাতে শুরু করেন।

তাঁর ছেলেরা বাবার উপর খুব চটে গেছে। সংসারের দিকে দৃষ্টি নেই, কেবল নাটক আর নাটক। কি হয় ও দিয়ে? এসব বদ খেয়াল ছেড়ে যদি জমিজমার তদারক করতেন তাহলে আয় বাড়ত। কিন্তু বাবা কিছুতেই কথা শোনেন না, নাটকের নেশা থেকে তাঁকে মুক্ত করা অসম্ভব।

নিরুপায় হয়ে ছেলেরা আদালতের শরণাপন্ন হলো। বাবার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি সাংসারিক দায়িত্ব অবহেলা করেছেন। সন্তানের প্রতি পিতার যে দায়িত্ব পালন করা উচিত, তা করেননি। বাবা এখন বুড়ো-হাবড়া হয়ে গেছেন, তাঁর অভিভাবকত্ব আইনত ছেলেদের হাতে দেওয়া হোক।

আদালত থেকে শমন এলো। তিনি এখন অথর্ব, কেন তাঁকে ছেলেদের অভিভাবকত্বে দেওয়া হবে না তার কারণ দেখাও। সফোক্লিস আদালতে নির্দিষ্ট দিনে উপস্থিত হলেন; হাতে সদ্যসমাপ্ত নাটক ঈডিপাস অব কলোনস।

বিচারকরা অভিযোগের মর্ম বুঝিয়ে সফোক্লিসকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ সম্বন্ধে আপনার কি বলবার আছে?

সফোক্লিস বললেন, হুজুর, আমি কিছুই বলব না। তবে যদি একটু সময় দেন তো আমার নতুন লেখা থেকে কিছু অংশ পড়ে শোনাতে চাই।

অনুমতি পেয়ে নাটক পড়তে আরম্ভ করলেন। বিচারকরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনলেন শেষ পর্যন্ত।

পাঠ সমাপ্ত করে সফোক্লিস জিজ্ঞাসা করলেন, হুজুর, এই নাটক যে লিখতে পারে তার কি কোনো অভিভাবকের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়?

—না, না—সমস্বরে বিচারকরা বলে উঠলেন। তাঁকে অভিযোগ থেকে

সসম্মানে মুক্তি দিয়ে ছেলেদেরই বললেন, এমন বাবার বিরুদ্ধে যারা অভিযোগ আনে তারাই পাগল।

*　　　　*　　　　*

ষোড়শ শতকের দুই ব্রিটিশ নাট্যকার—বোমোণ্ট ও ফ্লেচারের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব। দু'জনে একসঙ্গে কয়েকটি নাটক রচনা করেছেন। একটি নতুন নাটকের আইডিয়া মাথায় এসেছে। ঐতিহাসিক নাটক। দুই বন্ধু এক ট্যাভারনে এসে বসলেন। পরিকল্পিত ট্র্যাজেডির খসড়াটা শেষ করতে হবে। ফ্লেচার লিখবেন ইতিহাসের রাজাকে হত্যার অংশ। তিনি খসড়া শেষ করে বন্ধুকে শোনালেন।

এক পরিচারক কাছেই কোথাও ছিল। ফ্লেচারের কথা শুনে তার তো চক্ষুস্থির। তখন ষড়যন্ত্রের যুগ। পরিচারক ভাবলে, নিশ্চয়ই এই লোকদুটো রাজাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে। তৎক্ষণাৎ খবর চলে গেল পুলিশের কাছে। দুই বন্ধুকে গ্রেপ্তার করে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হলো। তবে দুর্ভোগ বেশীদূর গড়ায়নি। নাট্যকারদের যখন পরিচয় পাওয়া গেল এবং নিঃসংশয়ে বোঝা গেল তাঁরা থিয়েটারের রাজাকে খুন করছিলেন, তখন তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হলো।

*　　　　*　　　　*

ফরাসী নাট্যকার মোলিয়ের নিজের নাটকে অভিনয় করতেন। তাঁর শেষ নাটক 'দি ইম্যাজিনারি ইনভ্যালিড', অভিনীত হয় ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। কাহিনীর নায়ক নিজেকে সর্বদাই অসুস্থ মনে করে। মাথাব্যথা, বুকব্যথা, কাশি ইত্যাদি একটা যায় আর একটা আসে। রোগ-কল্পনা তার বিলাস, তার আনন্দ। এই চরিত্রে অভিনয় করছিলেন মোলিয়ের। নায়ক যদিও অসুস্থতার ভান করে, মোলিয়ের কিন্তু সত্যি অসুস্থ। বুকের ব্যথা আর কাশিতে ভুগছিলেন। সেদিন শেষ রাত্রির অভিনয়। মোলিয়ের খুবই অসুস্থ। খুব কাশি, বুকে নিজেই হাত বুলাচ্ছেন। দর্শকরা মুগ্ধ হয়ে অভিনয় দেখছে, হাসির রোলে প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ। এমন চমৎকার অভিনয়, যেন সত্যি অসুস্থ। মোলিয়ের যত ব্যথায় আকুল হন, কাশি যত বাড়ে, দর্শকরা তত বেশী তারিফ করে অভিনয়ের।

যখন কাশতে কাশতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন স্টেজের উপরে, তখন তাঁকে বাড়ী আনা হলো। কয়েকবার রক্তবমির পরই তাঁর মৃত্যু হলো। থিয়েটার করবার জন্য যে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তা করার সময় পাননি বলে মোলিয়েরকে খ্রীষ্টান রীতি অনুযায়ী সমাধিস্থ করা সম্ভব হয়নি।

*　　　　*　　　　*

ভিক্টর হুগোকে আমরা বিশেষ করে মানবতাবাদী লেখক হিসাবেই জানি। তাঁর সর্বাধিক পঠিত উপন্যাস Les Miserables এবং অন্যান্য অনেক কাহিনী থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত জীবন থেকে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। অন্তত একটি ক্ষেত্রে।

একুশ বছর বয়সে হুগো বিয়ে করেন সুন্দরী তরুণী আদেলেকে। এই মেয়েকে বিয়ে করায় মা'র ছিল প্রবল আপত্তি। তাই মা বেঁচে থাকতে বিয়ে হতে পারেনি। বিয়ে হলো তাঁর মৃত্যুর পরে। বিয়ের পরে কয়েক বছর বেশ সুখেই কাটল। তারপরে হুগোর সব সময় মনে হত স্ত্রীর ভালোবাসার জোয়ারে ভাটা এসেছে। কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। কেউ কেউ বলেন এর জন্য হুগোর অমিত যৌনলিপ্সাই দায়ী। হৃদয়ের যে স্থানটা স্ত্রী অপূর্ণ রেখেছেন তা পূর্ণ করতে হুগো খুঁজে পেলেন জুলিয়েতকে। জুলিয়েত সুন্দরী তরুণী অভিনেত্রী। সে বহুজনবল্লভা।

হুগোর সঙ্গে যখন প্রথম পরিচয় তখন বহুদিন বিলাসের জীবন যাপন করে জুলিয়েত দেনায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত। উদ্ধারের কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। পথ দেখালেন হুগো। তিনি বললেন, আমি সব দেনা শোধ করে দেব, সারাজীবন তোমার গ্রাসাচ্ছাদনের দায়িত্ব নেব। শর্ত হবে তুমি অন্য কারো সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখতে পারবে না। নিরুপায় জুলিয়েত শর্ত মেনে নিল। তার বাড়ীতে প্রতি রাত্রি উজ্জ্বল দীপমালায়, গ্লাশের ঠুং ঠাং শব্দে, গানবাজনার ধ্বনিতে, নানা হৈ-হুল্লোড়ে ছিল মুখরিত। এখন সে বাড়ী সন্ধ্যার পরে স্তব্ধ। শুধু হুগোর প্রতীক্ষায় বসে থাকা। তাঁর নির্দেশের অপেক্ষা।

অল্পদিনের মধ্যেই জুলিয়েতের জীবন একেবারে পাল্টে গেল। সুন্দর বাড়ীটি ছাড়তে হল। এসে উঠল এক ছোট্ট অন্ধকার ঘরে। অতি-সাধারণ পোশাক। সামান্য খাওয়া। হুগো বোধহয় ভেবেছিলেন দারিদ্র্যে নিত্য যন্ত্রণা মানুষকে সংযত রাখবার বড় শিক্ষক। কিন্তু জুলিয়েত কি ক্রীতদাসীর জীবন নীরবে মেনে নিয়েছিল? সে কি শুধু দেনার দায় থেকে মুক্তি পাবার জন্য? কিংবা হুগোর প্রবল ব্যক্তিত্বের কাছে সে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করেছিল? রুটিচোর জাঁ ভালজাঁর উপর যাঁর এত দরদ দেখা যায়, নর্মসহচরীর প্রতি তাঁর এত নিষ্ঠুরতা কেন?

হুগোর বাড়ীর কাছাকাছি কোনো বস্তিতে থাকত জুলিয়েত। হুগো যদি অন্য কোথাও যেতেন, সঙ্গে যেত জুলিয়েত। ছায়ার মতো অনুগামিনী। হুগো স্ত্রী-সন্তান-সন্ততি নিয়ে প্রাসাদোপম বাড়ীতে থাকতেন, আর অদূরে বস্তিতে স্থান নির্দিষ্ট হত জুলিয়েতের। সারাদিন তার শুধু একটি কাজ। হুগোকে দীর্ঘ চিঠি লেখা। এখন দু'হাজারের বেশী চিঠি পাওয়া যায়। প্রতিদানে কি পেয়েছে জুলিয়েত? হুগো তাকে উদ্দেশ করে কয়েকটি প্রেমের কবিতা লিখেছেন। সেখানেই সে লুকিয়ে বেঁচে আছে।

* * *

প্রখ্যাত ফরাসী লেখক এমিল জোলার নাম উঠলেই আমাদের মনে পড়ে যায় 'নানা' প্রভৃতি উপন্যাসের কথা। কিন্তু পতিতার জীবনকাহিনী কিংবা যৌন-জীবনের চিত্রই তাঁর উপন্যাসের একমাত্র উপজীব্য নয়। তাঁর দুর্ভাগ্যের কথা যে,

জার্মিনাল-এর মতো উপন্যাসকে আমরা মনে রাখিনি। তাছাড়া বাস্তব জীবনে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি স্বেচ্ছায় যে লাঞ্ছনা ভোগ করেছিলেন তা এক বিরল ঘটনা।

সেটা সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ সালের কথা। ফরাসী সেনাবাহিনীর জেনারেলের হাতে একটুকরো কাগজ পড়ল, যা স্বাক্ষরবিহীন কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তা থেকে জানা গেল যে জার্মান সেনাবাহিনীকে গোপন সামরিক তথ্য পাচার করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে এক গোপন তদন্ত কমিটি বসল। হাতের লেখা পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞরা সিদ্ধান্ত করলেন এ লেখা ক্যাপ্টেন ড্রেফুসের। আদালতে বিচার হলো। ড্রেফুসের বিরুদ্ধে কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করা হলো না। সুতরাং অভিযোগ খণ্ডনের সুযোগ তিনি পেলেন না। তবু তাঁর বিচার হলো এবং শাস্তি হলো যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, দেশদ্রোহিতার অভিযোগে। এই শাস্তি ভোগ করতে হবে ডেভিল দ্বীপে, যা ছিল ব্রিটিশ আমলের আন্দামানের চেয়েও ভয়ংকর। অনেকে বলতে লাগলেন, ড্রেফুস জাতিতে ইহুদি বলেই তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয়েছিল। প্রকাশ্য স্থানে যখন ড্রেফুসের সামরিক পোশাক ইত্যাদি খুলে ফেলা হচ্ছিল তখন সমবেত জনতা উন্মত্তের মতো চীৎকার করতে লাগল, 'দ্বীপান্তর নয়, ওকে গুলি করে মারো!'

কয়েক বছর পরে প্রকাশ পেল, ষড়যন্ত্র করে ড্রেফুসকে দ্বীপান্তরে পাঠানো হয়েছে। যে তাঁর হাতের লেখা নকল করেছিল সে ভয়ে আত্মহত্যা করল। আর একজন স্বীকার করল তার অপরাধ। সরকার ড্রেফুসকে দ্বীপান্তর থেকে ফিরিয়ে আনলেন। কিন্তু তাঁকে পূর্ব-পদে বহাল করা হলো না। এই ষড়যন্ত্রের ঘটনা নিয়ে সমগ্র ফ্রান্স তোলপাড় হলো। জোলা ব্যাপারটা প্রথম থেকেই লক্ষ্য করছিলেন। গোড়া থেকেই তাঁর ধারণা ছিল ড্রেফুস নিরপরাধ। এখন নিশ্চিত প্রমাণ পেলেন। সরকারের ঔদাসীন্যে তিনি ক্রুদ্ধ হলেন। ১৩ই জানুয়ারি ১৮৯৮ সালে 'অরোর' পত্রিকায় এক দীর্ঘ চিঠি লেখেন। এ চিঠি I Accuse নামে বিখ্যাত। কারণ চিঠির অনেকগুলি অনুচ্ছেদ 'আমি অভিযোগ করি' দিয়ে শুরু হয়েছে। চিঠিতে ইচ্ছে করেই ষড়যন্ত্রকারীদের নাম উল্লেখ করেছেন। কারণ মানহানির মামলা হলে আদালতে তিনি সব ব্যাপারটা প্রকাশ করে দিতে পারবেন।

অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হলো। আদালতে যাবার পথে জনতা তাঁকে দেশদ্রোহী বলে ধিক্কার দিল। বিচারের প্রহসন মাত্র। কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করতে দেওয়া হলো না। বিচারে তাঁর হলো একবছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং বিরাট অঙ্কের জরিমানা। বন্ধুরা পরামর্শ দিল দেশত্যাগ করে শাস্তি এড়াও। তাই করলেন জোলা। প্রায় ষাট বছর বয়সের বৃদ্ধ স্বদেশ, বন্ধু-বান্ধব, লেখার জগৎ সব কিছু ত্যাগ করে চলে গেলেন ইংলণ্ড।

জোলার আন্দোলনে ফল হয়েছিল। আমরা আত্মহত্যা, স্বীকারোক্তি ইত্যাদির

কথা যা আগে লিখেছি তা ঘটেছিল জোলার চিঠি প্রকাশের পরে। ড্রেফুসকে ফিরিয়ে আনা হলেও ১৯০৬ সালের পূর্বে তাঁকে স্ব-পদে পুনর্বহাল করা হয়নি। জোলা তা দেখে যেতে পারেননি। তাঁর মৃত্যু হয়েছে ১৯০২ সালে।

জোলা যাঁর জন্য স্বেচ্ছায় এত দুঃখ বরণ করেছিলেন তাঁকে তিনি কখনো চোখেও দেখেননি। শুধু অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেই তিনি নির্ভীকভাবে এগিয়ে এসেছিলেন। অথচ একটি প্রতিবাদমূলক উপন্যাস লিখলেই লেখক হিসাবে তাঁর কর্তব্য শেষ হত।

কিন্তু তিনি লেখকের চেয়ে বড় প্রকৃত মানুষের কাজ করেছেন।

* * *

বিশ্ব-সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হেনরি ফীলডিং-এর 'টম জোন্স'। উপন্যাসটির পাণ্ডুলিপি শেষ করেই ফীলডিং এক ছোট প্রকাশকের কাছে উপস্থিত। টাকার এত অভাব যে অপেক্ষা করতে পারছেন না। যত কম হোক রয়েলটি হিসাবে কিছু টাকা পেলেই পাণ্ডুলিপি প্রকাশককে দিয়ে দেবেন। প্রকাশক কয়েকটি পাতা উল্টে-পাল্টে দেখে বলল, আজ কিছু বলতে পারব না, কাল আসবেন। পরদিন যেতেই প্রকাশক পাণ্ডুলিপি ফেরত দিয়ে বলল, এ বই ছাপাবার মতো সাহস নেই তার। এর গুণাগুণ কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ফীলডিং শেষবারের মতো অনুনয় করে বললেন, পঁচিশ পাউণ্ড পেলেও আমি পাণ্ডুলিপি দিয়ে দেব।

এক বন্ধুর পরামর্শে পরদিন পাণ্ডুলিপি নিয়ে গেলেন আর এক প্রকাশকের কাছে। বড় প্রকাশক। প্রকাশক গল্প-উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে স্ত্রীর মতামতের উপর নির্ভর করেন। কয়েকদিন পরে স্ত্রী পরামর্শ দিলেন, এ পাণ্ডুলিপি কিছুতেই যেন ছাড়া না হয়। প্রকাশক ফীলডিংকে আমন্ত্রণ করে বললেন, যদি দু'শো পাউণ্ডে রাজী হন, তবে এ বই ছাপতে পারি।

প্রকাশক বলেছিলেন ভয়ে ভয়ে। হয়তো লেখক রাজী হবেন না এত কম পারিশ্রমিকে। ফীলডিং কিন্তু আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। এত বেশী পাওয়া ছিল ওঁর আশার অতীত। বন্ধুদের খাইয়ে দিলেন খুব করে। প্রকাশক তাঁর জীবিতকালে আঠারো হাজার পাউণ্ড এ বই থেকে লাভ করেছিলেন।

* * *

ওলিভার গোল্ডস্মিথ একবার চাকরির জন্য সাক্ষাৎকারে যাবেন। কিন্তু পোশাক এমনই মলিন ও জীর্ণ যে নিশ্চয়ই তাঁকে নির্বাচন করা হবে না, যদিও চাকরি খুবই সামান্য। অথচ একটা উপার্জনের ব্যবস্থা না হলে না খেয়ে মরতে হবে। সুতরাং 'মান্থলি রিভিউ' পত্রিকার প্রকাশকের সুপারিশে এক দোকান থেকে একসেট পোশাক ধার করে আনলেন। কথা রইলো, সাক্ষাৎকার হয়ে গেলেই ফিরিয়ে দিতে হবে।

নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেল, গোল্ডস্মিথ পোশাক ফিরিয়ে দিচ্ছেন না। তাগিদের পর তাগিদ আসছে। কিন্তু গোল্ডস্মিথ ফেরত দেবেন কি করে? এমন কঠোর দারিদ্র্য যে লোভ সংবরণ করা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। সাক্ষাৎকার থেকে বেরিয়েই ধার-করা পোশাক বন্ধক দিয়ে কিছু টাকা সংগ্রহ করতে হয়েছিল গোল্ডস্মিথকে। পোশাক ফেরত না দিলে প্রকাশক যখন জেলে যাবার ভয় দেখাল তখন গোল্ডস্মিথ উত্তর দিলেন, সেটা বরং ভালো; বাইরে থাকলে সাংঘাতিক কিছু হয়ে যেতে পারে!

*　　　*　　　*

একবার একজন ছাত্র গ্যেটের বাড়ী এসে উপস্থিত। বিখ্যাত লেখককে দেখতে চায়। এরকম অচেনা লোকের সঙ্গে তিনি সাধারণত দেখা করেন না, বিশেষ করে যাদের কোনো সুনির্দিষ্ট বক্তব্য নেই। যাই হোক, এই ছাত্রের অনুরোধে কি জানি কেন গ্যেটে রাজী হলেন। বসবার ঘরে ছাত্রটি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর গ্যেটে নীরবে ঘরে ঢুকলেন। একটি কথাও না বলে ঘরের মাঝখানে একটি চেয়ারে এসে বসলেন। গ্যেটের এই গম্ভীর নীরব আবির্ভাব ছাত্রটিকে অপ্রস্তুত করতে পারেনি। ঘরের মধ্যে একটি মোমবাতি জ্বলছিল। ছাত্রটি মোমবাতিটি হাতে করে প্রস্তরমূর্তির মতো অধিষ্ঠিত গ্যেটের চারপাশে ঘুরে ঘুরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল কবিকে। দেখা শেষ হবার পর মোমবাতি যথাস্থানে রেখে একটি রৌপ্যমুদ্রা বের করল পকেট থেকে। দর্শনী হিসাবে সেই মুদ্রাটি গ্যেটের চোখে পড়ে এমন এক জায়গায় রেখে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল ছাত্রটি।

*　　　*　　　*

এডমণ্ড স্পেন্সার তাঁর বিখ্যাত কাব্য 'ফেয়ারী কুইন' সমাপ্ত করে আর্ল অব সাদাম্পটনের বাড়ী চলে গেলেন। শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে আর্লের খুব নাম। কেউ তাঁর কাছ থেকে শুধু হাতে ফিরে আসেনি কোনদিন।

পাণ্ডুলিপি আর্লের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে স্পেন্সার বাইরের ঘরে বসে আছেন। কয়েক পৃষ্ঠা পড়ে খুব ভালো লাগল। আর্ল স্পেন্সারকে কুড়ি পাউণ্ড পাঠিয়ে দিলেন। এদিকে পড়া চলছে। আরো কিছুদূর পড়ে আবার কুড়ি পাউণ্ড দিতে বললেন। যতই পড়েন ততই ভালো লাগে; আর একবার কুড়ি পাউণ্ড পাঠানো হলো। ক্রমশ বেশী ভালো লাগছে। মুগ্ধ হয়ে পড়ে যাচ্ছেন আর্ল। আর একবার কুড়ি পাউণ্ড পাঠাবার কথা বলতে গিয়েই তাঁর চৈতন্য হলো। দারোয়ানকে ডেকে বললেন, ওরে, ওই যে কবি বসে আছে, তাকে এখুনি বিদেয় করে দে। যেমন লেখা লিখেছে তার পুরস্কার দিতে গেলে আমি ফতুর হয়ে যাবো।

*　　　*　　　*

লেখকদের সহধর্মিণীরা সব সময় লেখার সহায় হয় না। ফরাসী নাট্যকার রাসিন স্ত্রীর কাছ থেকে পেয়েছেন উপেক্ষা, কোনো প্রেরণা পাননি। নাট্যকার হিসাবে

রাসিনের খ্যাতি যখন ছড়িয়ে পড়েছে, সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, তখন তাঁর হঠাৎ ইচ্ছে হলো সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন। কিন্তু গুরু বুঝিয়ে বললেন, তোমার পক্ষে সেই কঠিন জীবন যাপন করা সম্ভব হবে না। তুমি বিয়ে-থা করে সংসারী হও, সংসারকর্মেই শান্তি পাবে।

গুরুর নির্দেশে রাসিন বিয়ে করলেন। বিবাহ-পূর্ব প্রেমের প্রশ্ন ছিল না। বেশ গুরুগম্ভীর মহিলা; সংসারের দৈনন্দিন কাজ ছাড়া অন্য কিছু সম্বন্ধে আগ্রহ ছিল না। রাসিনের স্ত্রী স্বামীর একটি নাটকেরও অভিনয় দেখেননি, নাটক পড়েননি এবং এ বিষয়ে কোনো আগ্রহ প্রকাশ করেননি। য়ুরোপের সর্বত্র স্বামীর নাম ছড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু স্ত্রীর মনে তার জন্য বিন্দুমাত্র গৌরববোধ ছিল না। সব নাটকের নামও তিনি শোনেননি। একবার চতুর্দশ লুই রাসিনকে পুরস্কৃত করলেন। মূল্যবান পুরস্কার বাড়ীতে এনে স্ত্রীকে ডেকে উচ্ছ্বসিত ভাষায় বলতে গেলেন। কিন্তু স্ত্রী থামিয়ে দিয়ে বললেন, রাখো, তোমার পুরস্কারের কথা। ছেলেটা যে দু'দিন যাবৎ বই হাতে করেনি আগে তার ব্যবস্থা করো দেখি।

* * *

সক্রেটিসের স্ত্রীর বদমেজাজের কথা প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। স্বামীকে সর্বদা কঠোর কথা বলতেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য কোনো শ্রদ্ধার লক্ষণ দেখা যেত না স্ত্রীর আচরণে। একদিন বিশ্রি গালাগাল দিয়েও তৃপ্ত না হয়ে স্ত্রী স্বামীর মাথায় একগামলা ময়লা জল ঢেলে দিলেন। শান্ত কণ্ঠে দার্শনিক বললেন, হ্যাঁ, এত গর্জনের পর একটু বৃষ্টি তো হবেই।

* * *

মিল্টন অন্ধ হবার পর যাঁকে বিয়ে করেছিলেন তাঁর কথাবার্তা ছিল ক্ষুরধার। ডিউক অব বাকিংহাম এই নতুন স্ত্রীর রূপ দেখে প্রশংসা করে বললেন এ যে গোলাপ!

অন্ধ কবি উত্তর দিলেন, গোলাপের রং কেমন বলতে পারব না। তবে তার কাঁটার খোঁচা রোজই পাই।

* * *

বিখ্যাত শিল্পী ও কবি উইলিয়াম ব্লেক যাঁকে বিয়ে করেছিলেন তিনি লিখতে বা পড়তে জানতেন না। তার জন্য যে তাঁদের জীবনে কোনো অশান্তি ছিল তার প্রমাণ নেই।

* * *

থ্যাকারের স্ত্রী ইসাবেলা তৃতীয় কন্যার জন্মের পরে উন্মাদ হয়ে যান। উন্মাদ স্ত্রীর ঝক্কি সামলাতে গিয়ে থ্যাকারের সাহিত্য-জীবনের প্রভূত ক্ষতি হয়েছিল।

* * *

জন্মের হিসাব দিয়ে প্রতিভার বিচার করা যে সম্ভব নয় তার প্রমাণ দেখা

যায় লেখকদের জীবন থেকে। বিখ্যাত নাট্যকার মার্লোর জন্ম হয়েছিল মুচির ঘরে। রূপকথার জাদুকর হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসনও মুচির ছেলে। কার্লাইলের বাবা ছিলেন পাথর দিয়ে বাড়ী তৈরী করবার কুশলী মিস্ত্রী। মাইকেল অ্যাঞ্জেলো যাঁর কাছে প্রতিপালিত হয়েছিলেন তিনিও ছিলেন তাই। জ্যাক লন্ডন ছিলেন এক পাগলাটে জ্যোতিষীর অবৈধ সন্তান।

* * *

অস্কার ওয়াইল্ডের ছেলেবেলা কেটেছে মা'র অনেক অত্যাচারের মধ্য দিয়ে। মা ছিলেন একটু ক্ষ্যাপাটে ধরনের। তাঁর ছিল মেয়ের শখ। তাই ছেলে জন্মাবার পর হতাশ হয়েছিলেন। কিন্তু মেয়ের শখ মেটাতেন ছেলেকে মেয়ের পোশাকে সাজিয়ে। ছেলেবেলায় অস্কার ওয়াইল্ডকে অনেকদিন মেয়ের পোশাক পরে থাকতে হয়েছে।

* * *

ওয়ার্ডসওয়ার্থ সত্য ও সুন্দরের পূজারী, এ কথাই আমরা জানি। কিন্তু তিনিও একবার ভুল করেছিলেন এবং ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করবার মতো সাহস দেখাতে পারেননি। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ওয়ার্ডসওয়ার্থ ফ্রান্স গিয়েছিলেন এবং সেখানে ছিলেন প্রায় এক বছর। ওর্লিয়াঁতে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয় সম্ভ্রান্ত বংশের ফরাসী তরুণী অ্যানেট ভ্যালোঁর সঙ্গে। রুশোর সমাজ-দর্শন নিয়ে প্রথম তাঁদের মধ্যে আলাপ চলত। ক্রমশ নিরিবিলিতে দেখা হতে লাগল, হৃদয়-বিনিময় হলো। অ্যানেটের গর্ভে এলো কবির সন্তান। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার আগেই ওয়ার্ডসওয়ার্থ ইংলন্ডে ফিরে এলেন। ডরোথির মাধ্যমে অ্যানেটকে বিয়ে করবার অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন বাবার কাছে। কিন্তু অনুমতি পাওয়া যায়নি। বাধ্য ছেলের মতো পিতার নিষেধ স্বীকার করে অ্যানেটকে বিয়ে করবার অভিপ্রায় ত্যাগ করলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ।

* * *

শেলির একটা মজার শখ ছিল। তা হলো কাগজের নৌকা তৈরী করে জলে ভাসানো। জলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই তাঁর নৌকা ভাসানোর খেলার জন্য মন চঞ্চল হয়ে উঠত। হাতের কাছে যত বাজে কাগজ সব শেষ হয়ে গেলে কম দরকারী চিঠি দিয়ে নৌকা তৈরী করতেন আর জলে ভাসিয়ে চেয়ে থাকতেন। দেখতেন, নৌকার কি হয়, কতদূরে যায়, কখন ডোবে। যেন কাগজের নৌকার সঙ্গে জীবনের যোগ আছে। জীবন আর কাগজের নৌকা দুই-ই ক্ষণস্থায়ী, দুই-ই অন্যের দ্বারা তাড়িত হয়। নিজের জীবনকে যেন দেখতে পেতেন নৌকার ভাগ্যের মধ্যে। তাই এ খেলায় ছিল তাঁর দুর্নিবার নেশা।

সঙ্গের সব কাগজ শেষ হয়ে গেলে বইয়ের ফ্লাই লীফ ছিঁড়ে নৌকা বানাতেন। শেলি দূরে বা কাছে যেখানেই বেড়াতে যেতেন সঙ্গে দু'একটি বই থাকত। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের বহু বইয়েরই ফ্লাই লীফ ছিল না।

একদিন বেড়াতে বেড়াতে এক নদীর তীরে এসে উপস্থিত হলেন। নদীতে স্রোত দেখে তাঁর ঘুমন্ত নেশাটা জেগে উঠল। কিন্তু সঙ্গে একটুকরো কাগজও ছিল না। একটু আগে অন্যত্র সব কাগজ শেষ করে এসেছেন।

আর একবার পকেটে হাত দিলেন। হ্যাঁ, একটুকরো কাগজ আছে। তবে আজকের মূল্যমানে প্রায় এগারোশ' টাকার একটি ব্যাংক নোট। অনেকক্ষণ যাবৎ নিজের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করলেন। তারপরে নেশার কাছে হার মানলেন। নোটটি পকেট থেকে বের করে নৌকা বানিয়ে ছেড়ে দিলেন নদীর জলে। দূরে ভেসে যেতেই অনুশোচনা হলো, এ কী করলেন! এই তো ছিল শেষ সম্বল। কিন্তু ভাগ্য সেদিন ছিল সুপ্রসন্ন। কিছুক্ষণ পরে বাতাসে মূল্যবান কাগজের নৌকা ভেসে এলো তাঁর পায়ের কাছে। তিনি সাগ্রহে তুলে নিলেন।

□ টুর্গেনিভ-টলস্টয়ঃ দ্বন্দ্বযুদ্ধ □

টুর্গেনিভের মতো বন্ধুবৎসল লেখক বিরল। রাশিয়ান লেখকদের জন্য তিনি অনেক কিছু করেছেন। কিন্তু তিনি রাশিয়ার বাইরে বেশী থাকতেন, তাই অন্য দেশের—বিশেষ করে ফরাসী লেখকদের—নানাভাবে সহায়তা করেছেন। ফ্লোবের, জোলা, মোপাসাঁ, গঁকুর ভ্রাতৃযুগল প্রভৃতি তাঁর কাছে ঋণী ছিলেন। জোলা নিজেই বলেছেন যে, যখন তিনি উপবাসে দিনযাপন করছিলেন তখন তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন টুর্গেনিভ। তিনি যে সাময়িক অর্থসাহায্য করতেন তাই নয়। এঁদের বই যাতে প্রচার লাভ করে, লেখা থেকে যাতে উপযুক্ত পারিশ্রমিক এঁরা পেতে পারেন, তার জন্য অক্লান্তভাবে চেষ্টা করতেন তিনি। ফ্লোবের, জোলা ও মোপাসাঁর অনেক লেখা টুর্গেনিভ নিজে অনুবাদ করেছেন রাশিয়ান ভাষায়। এঁদের লেখার জন্য রাশিয়ান সম্পাদক বা প্রকাশক পারিশ্রমিক দিতে বিলম্ব করলে টুর্গেনিভ নিজেই অগ্রিম অর্থ দিয়ে দিতেন। সে টাকা প্রায়ই ফিরে আসত না তাঁর কাছে। কিন্তু এজন্য কোনো দুঃখ ছিল না তাঁর মনে। একজন প্রতিভাবান লেখকের জন্য না হয় কিছু টাকা গেল। তাতে কি এসে যায়।

ফরাসী লেখকরা টুর্গেনিভের দ্বারা উপকৃত হয়েছেন। হয়তো তার জন্য তাঁরা উপযুক্ত পরিমাণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেননি। কিন্তু উপকারকের বিরুদ্ধে তাঁরা দাঁড়াননি। নিজের দেশের লেখকরাই তাঁর বিরোধিতা করেছেন, লাঞ্ছিত করতে চেষ্টা করেছেন।

টুর্গেনিভের মা বলতেন, লেখক আর কেরানীতে কোনো তফাত নেই। দু'জনেই কালির আঁচড় টেনে কাগজ ময়লা করে। তা সত্ত্বেও টুর্গেনিভ কিন্তু লেখার দিকেই ঝুঁকলেন। ১৮৪৭ সাল নাগাদ পত্রিকায় তাঁর কতকগুলি সুখপাঠ্য রেখাচিত্র বেরিয়েছে। সেই সূত্রে তাঁর আলাপ হল দু'বছরের বড় এবং একটি উপন্যাসের লেখক আইভান গঞ্চারফের সঙ্গে। গঞ্চারফ সরকারী কর্মচারী। আয় বেশী নয়। টুর্গেনিভ প্রচুর সম্পত্তির মালিক—যদিও কর্তৃত্ব সব মা'র হাতে। তবু যতটুকু তাঁর হাতে ছিল তা দিয়েই অনেক সাহায্য করা চলত। গঞ্চারফ তার সুযোগ গ্রহণ করেছেন। টুর্গেনিভ প্রায়ই তাঁর বাড়ি আসতেন, অগ্রজ লেখককে নিজের লেখা শুনিয়ে মতামত চাইতেন। গঞ্চারফও শোনাতেন তাঁর নতুন লেখা। প্রায় দশ বছর এমনি করে চলল। শেষের দিকে গঞ্চারফ প্রায়ই অভিযোগ করতেন যে, টুর্গেনিভের লেখায় তাঁর রচনার ছায়া পড়েছে; অনেক ক্ষেত্রে প্রায় নকল।

টুর্গেনিভের 'এ নেস্ট অব জেন্টল্ ফোক' এবং গঞ্চারফের 'ওব্লোমোভ' প্রায় একই সময়ে বের হয়। সমালোচকরা টুর্গেনিভের প্রশংসায় পঞ্চমুখ; 'ওব্লোমোভ' সম্বন্ধে বিশেষ উচ্ছ্বাস নেই। এতে রুষ্ট হয়ে গঞ্চারফ টুর্গেনিভকে লিখলেন: তুমি জীবনের উপরতলায় ঘুরে বেড়াচ্ছ; আর আমার কলম আলোকিত করেছে জীবনের গভীরতম প্রদেশকে।

এরপরে টুর্গেনিভের 'অন দি ইভ' যখন বের হল, আলোড়ন তুলল সাহিত্য-জগতে—তখন গঞ্চারফের ঈর্ষা জ্বলে উঠল নতুন করে। গঞ্চারফ অভিযোগ করলেন, টুর্গেনিভ প্লট এবং প্রত্যেকটি চরিত্র চুরি করেছেন তখনও অসমাপ্ত উপন্যাস 'দি প্রিন্সিপিস্' থেকে। যতদূর লেখা হয়েছে তা পড়ে শুনিয়েছিলেন টুর্গেনিভকে। শুনে চুরি করেছেন টুর্গেনিভ।

গঞ্চারফ এই চুরির কথা এমন করে প্রচার করতে লাগলেন যে, টুর্গেনিভের আত্মপক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হয়ে পড়ল। মুশকিল এই যে, গঞ্চারফের বই তখনো প্রকাশিত হয়নি; সুতরাং পাঠকদের তুলনা করে দেখবার সুযোগ ছিল না। তাই প্রবীণ লেখকদের নিয়ে এক বিচারসভা বসল। সভা রায় দিলেন, টুর্গেনিভ চুরি করেননি।

গঞ্চারফ কিন্তু শান্ত হলেন না। তাঁর কেবল সন্দেহ, চর ঘুরে বেড়াচ্ছে—যা-কিছু তিনি লিখবেন সব নিয়ে টুর্গেনিভের হাতে তুলে দেবে। একদিন সেন্ট পীটার্সবার্গ পার্কে হঠাৎ দু'জনের দেখা। অমনি গঞ্চারফ চীৎকার করে উঠলেন, 'চোর! চোর।' ঘনায়মান জনতাকে সমস্ত ইতিহাস শুনিয়ে নিবৃত্ত করা কঠিন। তাই দৌড়ে পালিয়ে বাঁচলেন টুর্গেনিভ।

গঞ্চারফের চেয়ে বেশী আঘাত টুর্গেনিভকে করেছেন ডস্টয়েভস্কি। জুয়ার নেশা কিছুকাল পেয়ে বসেছিল ডস্টয়েভস্কিকে। একবার ব্যাডেন ব্যাডেনে জুয়া খেলে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়লেন। একটি পয়সা নেই হাতে, উপবাসে থাকতে হবে এমন অবস্থা। টুর্গেনিভ তখন সেখানে ছিলেন। ডস্টয়েভস্কি তাঁর কাছ থেকে টাকা ধার করলেন, যত শীঘ্র পারেন ফেরত দেবেন এই শর্তে। অনেকদিন হয়ে গেল; ফেরত দেওয়া আর হলো না। দিতে যে দেরি হচ্ছে সে কথাও জানালেন না টুর্গেনিভকে। একদিন টুর্গেনিভ দেখতে পেলেন ডস্টয়েভস্কিকে। ডস্টয়েভস্কি তখন বুঝতে পারেননি। পরে যখন শুনলেন টুর্গেনিভ তাঁকে দেখে গেছেন, তখন মনে হল মহাজনের সঙ্গে গিয়ে দেখা করা উচিত। না হলে টুর্গেনিভ ভাববেন টাকা শোধ না করে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

টুর্গেনিভের সামনে উপস্থিত হয়ে অধমর্ণের হীনম্মন্যতায় ডস্টয়েভস্কি অভিভূত হয়ে পড়লেন। টুর্গেনিভের নতুন বই 'স্মোক' বেরিয়েছে। কথা আরম্ভ হল সেই নিয়ে। ডস্টয়েভস্কি বললেন, এই উপন্যাসে রাশিয়ানদের এত ছোট করে দেখানো হয়েছে যে, বইটি প্রকাশ্যে পোড়ানো উচিত। টুর্গেনিভ অসীম ধৈর্যের সঙ্গে নীরবে

তাঁর কথা শুনলেন। ডস্টয়েভস্কি এতেই ক্ষান্ত হলেন না। তিনি টুর্গেনিভ সম্বন্ধে নানা বিরূপ মন্তব্য লিখে পত্রিকায় চিঠি পাঠালেন।

টুর্গেনিভের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্বেষ ডস্টয়েভস্কি চিরস্থায়ী করে রেখেছেন 'দি পসেস্‌ড' নামক উপন্যাসে। এই উপন্যাসের কারমাজিনভ চরিত্রটি টুর্গেনিভেরই ব্যঙ্গচিত্র। তাঁর যত চারিত্রিক ত্রুটি, যত বাতিক, সব কিছুকেই বিদ্রূপ করা হয়েছে। টুর্গেনিভ খুবই আঘাত পেয়েছিলেন। তিনি অনুরোধ জানিয়েছিলেন, আমার অস্তিত্ব সবাই ভুলে যাক, তাতে হয়তো একটু শান্তি পাব।

টলস্টয়ের 'দি স্টোরি অব মাই চাইল্ডহুড' তখন ধারাবাহিকভাবে একটি সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। টুর্গেনিভ সম্পাদককে লিখলেন, চমৎকার লেখা—প্রতিভার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। লেখককে আমার অভিনন্দন জানাবেন। ১৮৫৫ সালের নভেম্বর মাসে তাঁদের দেখা হয়। পনেরো দিন টলস্টয় থাকলেন টুর্গেনিভের বাড়ী। টুর্গেনিভ এক বন্ধুকে লিখলেন, এই তরুণ লেখকের জন্য এক অদ্ভুত স্নেহের আকর্ষণ অনুভব করি, অনেকটা বাৎসল্যরস। টলস্টয়ও তাঁর প্রতি তেমনি আকর্ষণ অনুভব করতেন।

১৮৫৭ সালে টলস্টয় প্যারিস এলেন টুর্গেনিভের সঙ্গে দেখা করতে। টুর্গেনিভের সঙ্গেই থাকলেন টলস্টয় অনেকদিন। টলস্টয় বিদায় নেবার পর দিনলিপিতে টুর্গেনিভ লিখলেন: 'সে চলে যাবার পর আমি কেঁদেছি। কেন তা ঠিক জানি না। খুব ভালোবাসি তাকে। আমাকে সে নতুন মানুষ করে তুলেছে।'

অবশ্য পরিচয়ের প্রথম পর্বের উষ্ণতার মধ্যেও মাঝে মাঝে বিরোধের স্ফুলিঙ্গ দেখা যেত। কিন্তু মিলন হতে দেরি হত না। স্থায়ী বিরোধের সূত্রপাত হয় কবি আফানাসি ফেটের বাড়ীতে। কবি ওঁদের দুজনকেই তাঁর মফস্বলের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করলেন ১৮৬১ সালের মে মাসে। একটা রাত্রি চমৎকার কাটল। পরদিন সকালে চায়ের টেবিলে মাদাম ফেট টুর্গেনিভকে প্রশ্ন করলেন: আপনার মেয়ের নতুন ইংরেজ শিক্ষয়িত্রী কেমন পড়াচ্ছেন?

—খুব ভালো। টুর্গেনিভ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। শিক্ষয়িত্রী শুধু ভালো পড়ান তা-ই নয়, তিনি চরিত্র গঠনেও সহায়তা করছেন। মেয়ে পলিন কোথায় কোথায় কি পরিমাণ টাকা দান করবে তাও তিনি স্থির করে দেন। সম্প্রতি শিক্ষয়িত্রী স্থির করেছেন যে, পলিন দরিদ্র লোকদের বাড়ী গিয়ে ছেঁড়া পোশাক নিয়ে আসবে এবং সেলাই করে ফেরত দেবে। এর ফলে দারিদ্র্যের সঙ্গে পলিনের পরিচয় ঘটবে, সম্পদের অহংকার মাথা ঘুরিয়ে দেবে না।

টলস্টয় নীরবে শুনছিলেন। হঠাৎ বললেন: এই কি ভালো শিক্ষার আদর্শ? ধনীর মেয়ে কোলের উপর ছেঁড়া ময়লা পোশাক রেখে সেলাই করছে, এমন একটি ছবি মনে পড়লেই থিয়েটারের অভিনয়ের সঙ্গে তুলনা এসে যায়। পলিন যদি আপনার বৈধ সন্তান হত তাহলে নিশ্চয়ই তার শিক্ষার অন্য ব্যবস্থা হত।

টুর্গেনিভ রাগে অপমানে জ্বলে উঠলেন। যৌবনের প্রারম্ভে বাড়ীর এক তরুণী ঝি'র সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। পলিনের জন্ম তারই ফলে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে টুর্গেনিভ দাঁড়িয়ে উঠে বললেন ঃ তুমি যদি চুপ না করো তাহলে থাপ্পড় মেরে তোমার মুখ বন্ধ করব।

একটু পরেই টুর্গেনিভের সংবিৎ ফিরে এলো। ক্ষমা চাইলেন মাদাম ফেটের কাছে। টলস্টয়ের দিকে তাকিয়েও অস্পস্ট ভাষায় দুঃখ প্রকাশ করলেন। তারপর দু'জনেই বিদায় নিলেন। টলস্টয় আলাদা গাড়িতে নিকটেই এক জায়গায় গিয়ে উঠলেন। সেখান থেকে চিঠি লিখলেন টুর্গেনিভকে ঃ মুখে যে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন, অবিলম্বে তা লিখে পাঠিয়ে দিন।

টুর্গেনিভ দ্বিধা না করে লিখিতভাবে ত্রুটি স্বীকার করলেন। কিন্তু চিঠির ঠিকানা ভুল লেখায় টলস্টয়ের হাতে পেঁছিতে দেরি হল। টলস্টয় অধৈর্য হয়ে উঠলেন চিঠি না পেয়ে। ক্ষিপ্ত হয়ে টুর্গেনিভকে আহ্বান করলেন দ্বন্দ্বযুদ্ধে। সত্যিকারের যুদ্ধ—একজনের মৃত্যুর মধ্যেই যার সমাপ্তি।

তারপরেই টুর্গেনিভের চিঠি এসে পেঁছিল। সুস্পষ্ট ভাষায় তিনি জানালেন, তাঁরই দোষ হয়েছে।

মাস তিনেক পরের কথা। টুর্গেনিভ রাশিয়ার বাইরে আছেন। টলস্টয় বিনীত-ভাবে ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখলেন। টুর্গেনিভের প্রতি তিনিও অবিচার করেছেন। টুর্গেনিভ তেলে-বেগুনে জ্বলে আছেন। তাঁর অভিযোগ, টলস্টয় নাকি ক্ষমা-চেয়ে-লেখা চিঠিখানি বন্ধুবান্ধবদের দেখিয়ে বেড়াচ্ছেন। সুতরাং এবার দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলেন টুর্গেনিভ। দেশে ফিরে দ্বন্দ্বযুদ্ধের ব্যবস্থা করা হবে। টলস্টয়কে তিনি জানিয়ে দিলেন। টলস্টয়ের চিঠি পেয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান নাকচ করলেন। কিন্তু তাঁদের সম্পর্কে যে ফাটল ধরেছে তা আর কখনো জোড়া লাগেনি।

টুর্গেনিভ কবি ফেটকে লিখলেন ঃ টলস্টয়কে আমি পছন্দ করি। তার লেখা সাগ্রহে পড়ি, তার কল্যাণ কামনা করি। কিন্তু যতক্ষণ দূরে থাকি ততক্ষণই ভালো ; কাছে এলেই অন্যরকম, বিরোধ শুরু হয়ে যায়। মনে হয় আমাদের দু'জনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। সুতরাং দূরে দূরে থাকাই ভালো।

এরপর সতেরো বছর তাঁরা দূরে দূরে ছিলেন। টলস্টয়ের জীবনে আমূল পরিবর্তন আসবার পর আত্মাভিমান ত্যাগ করে তিনি টুর্গেনিভের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। তাঁর পক্ষে এটা চিত্তশুদ্ধির জন্য অবশ্যকর্তব্য ছিল। কিন্তু প্রথম পর্বের সেই মধুর বন্ধুত্ব আর পাওয়া যায়নি।

টুর্গেনিভ মৃত্যুশয্যায়, এ খবর পেয়ে টলস্টয় লিখলেন ঃ আজ উপলব্ধি করতে পারছি আপনার প্রতি আমার আকর্ষণ কত গভীর। আপনাকে দেখবার জন্য প্যারিস যাব কিনা ভাবছিলাম। আপনার অবস্থা আমাকে অবশ্যই জানাবেন।

টুর্গেনিভ মৃত্যুশয্যা থেকে শেষ চিঠিতে লিখলেন : তোমার মতো লেখকের সমসাময়িক হতে পেরে গৌরব বোধ করছি। শেষবারের মতো একটি অনুরোধ করব, আবার লেখায় মন দাও। আমার অনুরোধ তুমি রক্ষা করেছ এ কথা জেনে যেতে পারলে সুখে মরতে পারতাম।

টলস্টয় তখন বিশুদ্ধ সাহিত্যের চর্চা ছেড়ে দিয়েছিলেন। সাহিত্যকে তিনি ব্যবহার করছিলেন তাঁর নতুন জীবন-দর্শনের বাহন হিসাবে। টলস্টয়ের শিল্পীমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল আদর্শের মোহে। টুর্গেনিভের শেষ অনুরোধ টলস্টয় রক্ষা করতে পারেননি।

□ ডিকেন্স-থ্যাকারের কলহ □

লেখকের সহানুভূতি, মনের ঔদার্য এবং মানবিকতাবোধের উপরে তাঁর রচনার মহত্ত্ব বহুলাংশে নির্ভরশীল। কিন্তু তাই বলে লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকরা ব্যক্তিগত জীবনে এই গুণগুলি যে সর্বদা অনুশীলন করে চলেন তা বলা যায় না। খ্যাতিমান লেখকরা তুচ্ছ কারণে পরস্পরকে ঈর্ষা করেছেন, একে অন্যের সঙ্গে কলহে লিপ্ত হয়েছেন; সাহিত্যের ইতিহাসে তেমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। ডিকেন্সের সঙ্গে থ্যাকারের দ্বন্দ্বের কাহিনী ভিক্টোরিয়ান যুগের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

দু'জনেই ঔপন্যাসিক; সমবয়সী,—ডিকেন্স থ্যাকারের এক বছরের ছোট। বিবাহিত জীবনে দু'জনেই অসুখী। ডিকেন্স নানা কারণে স্ত্রীকে ভালোবাসতে পারেননি, ভালোবাসার সন্ধান করেছেন অন্য রমণীর মধ্যে। থ্যাকারের স্ত্রী তিনটি সন্তানের জন্ম দেবার পর উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। যতদিন জীবিত ছিলেন থ্যাকারে স্ত্রীর যত্ন করেছেন। ডিকেন্স কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদ করেছিলেন। ডিকেন্স ছিলেন রূপবান পুরুষ; আর থ্যাকারের কুশ্রী চেহারা ছিল ঠাট্টার বিষয়। এক দুর্ঘটনায় তাঁর নাকের হাড় ভেঙে গিয়েছিল। সেই থ্যাবড়া নাক নিয়ে অনেকেই পরিহাস করত। থ্যাকারে ঔপন্যাসিক হিসাবে সহজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেননি। এদিক থেকে ডিকেন্স অনেক বেশী ভাগ্যবান ছিলেন বলা যায়।

থ্যাকারের ছেলেবেলা থেকেই ছবি আঁকার দিকে ঝোঁক ছিল। তিনি ভালো করে ছবি আঁকা শেখার জন্য প্যারিসেও ছিলেন কিছুদিন। ছবির সঙ্গে লেখা যোগ করে দিলে সম্পাদকরা সহজে গ্রহণ করে বলে তিনি লেখা শুরু করেছিলেন। ছবি এঁকে অর্থ উপার্জন করবেন,—এই ছিল তাঁর ধারণা।

ডিকেন্সের 'পিকুইক পেপার্সে'র' ছবি আঁকবার জন্য একজন শিল্পীর প্রয়োজন। শিল্পী নির্বাচনের ভার প্রকাশক দিয়েছে ডিকেন্সের উপরে। ডিকেন্স কয়েকজন শিল্পীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। এদের মধ্যে একজন ছিলেন থ্যাকারে। সাক্ষাৎকারের পর থ্যাকারের ধারণা হল যে ছবি আঁকার কাজটা তিনিই পাবেন। সেই আনন্দে নাইট ব্রাউনি নামে আর একজন সাক্ষাৎকারীকে তিনি চা ও খাবার খাইয়ে দিলেন। অনেকদিন অপেক্ষা করবার পর থ্যাকারে জানতে পারলেন, কাজটা তিনি পাননি; পেয়েছে নাইট ব্রাউনি। এই অপমান থ্যাকারে ভুলতে পারেননি। 'পিকুইক পেপার্সে'র' অভূতপূর্ব সাফল্য দেখে তাঁর ক্ষোভ নিশ্চয়ই বেড়েছিল।

কিন্তু এই সাক্ষাৎকারের সূত্র ধরেই দু'জনের মধ্যে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। গ্যারিক ক্লাবে দু'জনেই নিয়মিত যেতেন। ডিকেন্স থ্যাকারের 'অধ্যাপক' গল্পটি

'মিসেলেনির' সেপ্টেম্বর (১৮৩৭) সংখ্যায় ছেপেছিলেন। ডিকেন্স এখন সাহিত্যের ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ; দিন দিন তাঁর খ্যাতি বেড়ে চলেছে। থ্যাকারেও লিখছেন ; তবে ডিকেন্সের জনপ্রিয়তার সঙ্গে তাঁর বইয়ের কাটতির তুলনাই হয় না। থ্যাকারের 'মিসেস পার্কিনস্ বল' উপন্যাসটি সম্বন্ধে একজন মন্তব্য করেছিল, বইটি ভালোই বিক্রি হচ্ছে। থ্যাকারে ক্ষোভের সঙ্গে উত্তর দিলেন, হুঁ, আমার বই আবার ভালো চলবে! আমার বই পঁচিশ কপি বিক্রি হলেই ভালো বলে সবাই। আমার পাঁচশ' আর ডিকেন্সের পঁচিশ হাজার।

খ্যাতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ডিকেন্সের একটি অন্ধ ভক্তের দল সৃষ্টি হয়েছে। শুধু লেখা নয়, ডিকেন্সের জীবন, চরিত্র, ব্যবহার সবকিছু ভালো—এই ছিল ভক্তদের বিশ্বাস। কেউ কোনরকম বিরূপ সমালোচনা করলে কলহ বেধে যেত। আর সব মন্তব্য এদের মারফত পৌঁছে যেত ডিকেন্সের কাছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে ডিকেন্সের ব্যক্তিগত জীবনে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটেছিল যা নিয়ে সর্বত্রই আলোচনা চলত। অন্যের মন্তব্য ডিকেন্স এবং তাঁর ভক্তরা উপেক্ষা করলেও, থ্যাকারের মন্তব্য উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। কারণ থ্যাকারেও লেখক। এবং তাঁর 'ভ্যানিটি ফেয়ার' জনপ্রিয় হওয়ায় ডিকেন্সের ভক্তরা মনে মনে রুষ্ট হয়েছিল। ডিকেন্সের একচ্ছত্র আধিপত্য ক্ষুন্ন করে থ্যাকারে অপরাধ করেছেন,—এমনি একটা ভাব।

দাম্পত্যজীবনে ডিকেন্স যে সুখী ছিলেন না, তা তিনি বন্ধুবান্ধবদের বলতেন। ক্যাথারিন ডিকেন্সের সঙ্গে থ্যাকারের পরিচয় ছিল। শ্রীমতী ডিকেন্সকে তাঁর ভালো লাগত এবং তাঁর সহানুভূতি ছিল ক্যাথারিনের উপর। ডিকেন্স খবর রাখতেন কে তাঁর পক্ষে, কে তাঁর স্ত্রীর পক্ষে। স্ত্রীর পক্ষে যারা ছিল তাদের তিনি শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করতেন। থ্যাকারেও সেই দলে।

এলেন টারনান নামে এক তরুণী অভিনেত্রী ডিকেন্সকে আকৃষ্ট করেছিল। ডিকেন্সের থিয়েটারের প্রতি ছিল সহজাত আকর্ষণ। এলেনের সঙ্গে তাঁর প্রায়ই দেখা হত। এতবড় খ্যাতিমান লেখকের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়ে এলেন গর্বিত। ডিকেন্স বিচিত্র বিষয়ের গল্প করতেন, এলেন মুগ্ধ হয়ে শুনত। ডিকেন্সের ইচ্ছা হল এলেনকে কিছু উপহার দেবেন। দোকানে গিয়ে পছন্দ করলেন একজোড়া ব্রেসলেট। এলেনের নাম লিখে তার ঠিকানায় পাঠিয়ে দিতে হবে। কিন্তু দোকানদার ভুল করে এলেনের পরিবর্তে মিসেস ডিকেন্সের নামে ব্রেসলেট পাঠিয়ে দেওয়ায় যত গোল বাধল। এলেন টারনানের নাম দেখে ক্যাথারিনের কিছু বুঝতে বাকী রইলো না। অভিনেত্রীর সঙ্গে ডিকেন্সের প্রণয়ের কাহিনীটা সকলের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল।

একদিন গ্যারিক ক্লাবে এক বন্ধু থ্যাকারেকে জিজ্ঞাসা করল, শুনেছ, ক্যাথারিন নাকি ডিকেন্সকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ক্যাথারিনের বোনের সঙ্গে ডিকেন্স এমন

অশোভন আচরণ করেছেন যে তা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রচণ্ড কলহ হয়ে গেছে।

থ্যাকারে বললেন, 'না, তা তো শুনিনি। এক অভিনেত্রীর সঙ্গে নাকি—'

শালীর সঙ্গে প্রেম করা ভিক্টোরিয়ান যুগে মারাত্মক অপরাধ বলে গণ্য করা হত। কয়েক বছর পূর্বেও স্ত্রীর বোনকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ ছিল। সুতরাং থ্যাকারের উদ্দেশ্য ছিল ছোট অপরাধ দিয়ে বড় অপরাধকে ঢাকা। উদ্দেশ্য যা-ই থাক, ফল কিন্তু ভালো হয়নি। থ্যাকারের উত্তর বিকৃতভাবে ডিকেন্সের কানে উঠেছিল। যেন তিনি কুৎসা প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। সুতরাং থ্যাকারের নাম শত্রুর খাতায় উঠতে দেরি হল না।

ডিকেন্সের এক বন্ধুর ছেলে এডমাণ্ড ইয়েটস্ সামান্য বেতনে পোস্টাপিসে চাকরি করত। উপরি আয়ের জন্য 'টাউন টক' নামে ক্ষুদ্র সাপ্তাহিকে ফীচার লিখত। মাঝে মাঝে সে বিখ্যাত লোকদের চরিত্রচিত্র পাঠকদের উপহার দেয়। ডিকেন্সের কথা লেখা হয়ে গেছে। এক সংখ্যায় লিখল থ্যাকারের কথা। এই রচনায় শ্রদ্ধা ছিল না, অবজ্ঞার ভাবটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। থ্যাকারের চেহারা সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য তো আছেই, তার উপর বলা হয়েছে যে লেখক হিসাবেও তিনি ব্যর্থ। এছাড়া নানা চরিত্রগত ত্রুটির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

থ্যাকারে এই প্রবন্ধ পড়ে চটে গেলেন। ইয়েটস্‌কে কড়া চিঠি লিখলেন। ইয়েটস্ চিঠি পেয়ে ক্ষুব্ধ হল। থ্যাকারে যৌবনে সমসাময়িক লেখকদের উপরে অনেক প্যারডি লিখেছেন ; আর এখন নিজে এইটুকু সইতে পারবেন না কেন ?

যাই হোক, ইয়েটস্‌ও উপযুক্ত উত্তরের খসড়া লিখল। মনে হলো, চিঠি পাঠাবার আগে কাউকে দেখিয়ে নিলে ভালো হয়। গ্যারিক ক্লাবের একজন সভ্যকে দেখাতে গেল। কিন্তু দেখা হলো না তার সঙ্গে। তখন ইয়েটস্ এলো ডিকেন্সের কাছে। ডিকেন্স বললেন, 'টাউন টকের' লেখাটি সুরুচির পরিচায়ক নয়। আর থ্যাকারের চিঠির উত্তরে ইয়েটসের চিঠি বেশ আক্রমণাত্মক হয়েছে। সুতরাং জবাব ডিকেন্স মুখে বলে দিলেন, ইয়েটস্ তা লিখে থ্যাকারেকে পাঠিয়ে দিল। ডিকেন্সের রচিত চিঠিটিও অবশ্য কম অপমানজনক ছিল না।

থ্যাকারে এবার প্রতিকারের অন্য পথ ধরলেন। তিনি ইয়েটসের প্রবন্ধ এবং যেসব চিঠিপত্রের আদানপ্রদান হয়েছে তাদের নকল গ্যারিক ক্লাবের গভর্নিং কমিটির নিকট পেশ করলেন। তিনি আবেদনে জানালেন, ক্লাবের সভ্যদের মধ্যে এ ধরনের কলহ চললে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ ক্ষুণ্ণ হবে। ভদ্রসমাজে এমন আক্রমণাত্মক মনোভাব নিন্দনীয়। ইয়েটসের বিরুদ্ধে অভিযোগ যথার্থ কিনা তা বিচারের ভার থ্যাকারে কমিটিকেই দেন।

কমিটি বিবেচনার পর ইয়েটস্‌কে ক্ষমা চাইতে বলল। ইয়েটস্ সম্মত হলো না। সে বলল, আমি তো গ্যারিক ক্লাবের বিরুদ্ধে কিছু লিখিনি ; সুতরাং ব্যক্তিগত ব্যাপারে ক্লাবের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।

ক্লাবে থ্যাকারের সমর্থকের সংখ্যাই ছিল বেশী। ডিকেন্সের বন্ধু ছিল কম। তাছাড়া সকলেই বুঝতে পেরেছিল ইয়েটসের পশ্চাতে ডিকেন্স আছেন এই ব্যাপারে। কমিটি নির্দেশ দিল, ইয়েটস্‌কে ক্ষমা চাইতে হবে; না হলে ক্লাব ত্যাগ করতে হবে।

ইয়েটস্ এবার বিপদ বুঝে সুর নরম করল। বলল, ক্লাবের কাছে ক্ষমা চাইতে রাজী আছি; থ্যাকারের কাছে ক্ষমা চাইব না।

অথচ ইয়েটস্ ক্লাবের বিরুদ্ধে কিছু লেখেনি। অপমানিত করেছে থ্যাকারেকে। সুতরাং ক্লাবের নিকটে ক্ষমা চাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কমিটি স্থির করল মাসখানেক পরে ক্লাবের সকল সভ্যদের একটি সাধারণ সভা আহ্বান করে এই ব্যাপারের মীমাংসা করা হবে।

ইতিমধ্যে ডিকেন্সের পারিবারিক জীবনে ভাঙন ধরেছে। স্ত্রীকে তিনি আলাদা এক বাড়ীতে রেখে তার জন্য ভাতা ঠিক করে দিয়েছেন। এই নিয়ে লোকের মুখে মুখে নানা গুজব ছড়িয়ে পড়ছে। ডিকেন্স ভাবলেন, প্রকৃত ব্যাপার জানিয়ে *একটি বিবৃতি প্রকাশ করলে মিথ্যা গুজব বন্ধ হবে। তিনি কাগজে বিবৃতি পাঠালেন। তাঁর নিজের কাগজ 'হাউসহোল্ড ওয়ার্ল্ডস'-এ বেরুল। কিন্তু* সবচেয়ে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করল 'নিউইয়র্ক ট্রাইবিউন'। ডিকেন্স আত্মপক্ষ সমর্থনে বলেছেন: আমরা দীর্ঘকাল অসুখী দাম্পত্য-জীবন সত্ত্বেও একত্র বাস করেছি। যাঁরা আমাদের সঙ্গে পরিচিত তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন যে আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের লোক। আমার স্ত্রীর কনিষ্ঠা ভগিনী জর্জিনা হগার্থ ঘরের সব কাজ করেছে, ছেলেমেয়েদের দেখাশুনা করেছে এবং তার জন্যই এতদিন সংসারে ভাঙন ধরতে পারেনি। ক্যাথারিন মাঝে মাঝে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে; সুতরাং তার হাতে ছেলেমেয়েদের মানুষ করবার ভার থাকতে পারে না।....দু'জন দুষ্ট লোক এক নিরপরাধ তরুণীর নাম এই সঙ্গে জড়িয়ে আমাকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করছে।

এই তরুণী এলেন টারনান। এবং দু'জন 'দুষ্ট' লোকের মধ্যে একজন হলেন থ্যাকারে। গ্যারিক ক্লাবে এক বন্ধুর উক্তির উপর যে মন্তব্য করেছিলেন ডিকেন্স তা ভুলতে পারেননি।

আত্মসমর্থনে ডিকেন্স যা-ই বলুন না কেন, তিনি যে এলেন টারনানের সঙ্গে বাস করতেন তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। অবশ্য ওঁরা মিঃ ও মিসেস ট্রিঙ্গহাম ছদ্মনামে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বাস করতেন।

গ্যারিক ক্লাবের সাধারণ সভা আহ্বান করা হল জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে। ইয়েটস্ এবং থ্যাকারের বিরোধ মীমাংসা করা হবে। সভায় ডিকেন্স প্রকাশ্যে ইয়েটসের পক্ষ সমর্থন করলেন। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক উইলকি কলিন্সও ছিলেন ইয়েটসের পক্ষে। জয় হল থ্যাকারের। সত্তরজন সভ্য থ্যাকারের পক্ষে, আর ছেচল্লিশজন ভোট দিল ইয়েটসের পক্ষে। সভায় প্রস্তাব পাশ হল যে ইয়েটস্‌কে

থ্যাকারের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে অথবা ক্লাব ছেড়ে চলে যেতে হবে। ক্লাবের এই সিদ্ধান্তে ডিকেন্স অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। সিদ্ধান্ত যে ঘোরতর অন্যায় হয়েছে তা সভায় ঘোষণা করতে তিনি দ্বিধা করেননি। ইয়েটস্‌কে ক্লাবের বিরুদ্ধে মামলা করবার জন্যও প্ররোচিত করেছিলেন ডিকেন্স। কিন্তু ব্যয়বহুলতার আশঙ্কায় ইচ্ছা সত্ত্বেও ইয়েটস্‌ মামলা করেনি।

ডিকেন্স কিন্তু এখানেই থামলেন না। আলোচনার দ্বারা ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলবার জন্য তিনি নতুন প্রস্তাব করলেন। ডিকেন্স থ্যাকারেকে লিখলেন, 'আমি ইয়েটসের প্রতিনিধি হিসাবে আলোচনায় যোগ দেব; আপনিও আপনার একজন প্রতিনিধি পাঠাবেন।' থ্যাকারে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে লিখলেন, 'আমাদের কলহে আপনি যে ইয়েটসের পরামর্শদাতা ছিলেন তা জেনে মর্মাহত হয়েছি।' ডিকেন্সের প্রস্তাবে থ্যাকারে সম্মত হননি।

ইয়েটসের রাগ সহজে যায়নি। কয়েক মাস পরে 'ইলাস্ট্রেটেড টাইমস' পত্রিকায় সে একটি কবিতা ছাপাল, —লেখক *ডব্লু, এম, টি; অর্থাৎ, উইলিয়াম মেকপীস থ্যাকারে নিজেই। তিনি যেন পাঠকদের বলছেন, জীবনে সুস্থ ও সুন্দর কিছু* নেই, সবই খারাপ। অর্থাৎ, থ্যাকারে নিজে খারাপ লোক বলে ভালো দেখতে পান না। সেই কবিতার একটি স্তবক এই ঃ

I show the vices which besmirch you,
The slime with which you're covered o'er,
Strip off each rag from female virtue,
And drag to light each festering sore.

ইয়েটস্‌-থ্যাকারে কলহের মতো ফরস্টার-থ্যাকারে কলহেও ডিকেন্স জড়িয়ে পড়েছিলেন। থ্যাকারে বিখ্যাত ঔপন্যাসিকদের রচনার প্যারডি করে একটি সিরিজ লিখেছিলেন 'পাঞ্চ' পত্রিকায়। এক সংখ্যায় বুলওয়ার লিটনের আড়ম্বরপূর্ণ স্টাইলের প্যারডি বের হল। লিটনের বন্ধুদের মধ্যে জন ফরস্টারই প্যারডি পড়ে সবচেয়ে বেশী ক্রুদ্ধ হয়েছিল। ফরস্টারের ক্যারিকেচার করে ছবি এঁকে পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের দেখাতেন থ্যাকারে। সে খবর পেয়েছে ফরস্টার। তাই ফরস্টার টম টেলর নামক এক সাংবাদিকের নিকট মন্তব্য করল, 'থ্যাকারে হলেন ফলস্‌ অ্যাজ হেল।' টেলর থ্যাকারের কাছে এ মন্তব্য পৌঁছে দিতে বিলম্ব করেনি। থ্যাকারে এতই অপমান বোধ করলেন যে, এক পার্টিতে ফরস্টার যখন তাঁর দিকে হাত এগিয়ে দিল তখন তিনি তার সঙ্গে করমর্দন করতে অস্বীকার করলেন। প্রকাশ্যে এরূপ অপমান করবার জন্য ফরস্টার ডিকেন্সকে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করলেন। ফরস্টারের পক্ষ অবলম্বন করলেন ডিকেন্স। কিছুদিন পরে একটি মিলন-ভোজের আয়োজন করে উভয় পক্ষের বন্ধুরা কলহ মিটিয়ে ফেলেছিল।

শিল্পী ও লেখকদের মধ্যে কলহের প্রধান কারণ তাঁদের সৃষ্টি ও শিল্পকর্মের

তুলনামূলক বিচারে অসন্তুষ্টি। প্রতিভা সম্বন্ধে কেউ পরোক্ষ বা প্রকাশ্যে কোনো সন্দেহ প্রকাশ করলে কিংবা বিরূপ সমালোচনা করলে লেখকরা ক্ষুব্ধ হন। ডিকেন্স ও থ্যাকারের মধ্যে মনোমালিন্যের এটাও কারণ ছিল। ঔপন্যাসিক হিসাবে ডিকেন্স থ্যাকারের অনেক আগেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। থ্যাকারে যখন ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে আরম্ভ করলেন তখন ডিকেন্স ও তাঁর সমর্থকরা তা সুনজরে দেখেননি। ১৮৫৭ সালে জর্জ ইলিয়ট বলেছিলেন যে, থ্যাকারে জীবিত ঔপন্যাসিকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। এ ধরনের মন্তব্য নিশ্চয়ই ডিকেন্স ও তাঁর ভক্তদের ভালো লাগার কথা নয়।

থ্যাকারের 'হেনরি এসমণ্ড' সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক জর্জ সেণ্টসবারি বলেছেন, 'এ গ্রেটার নভেল দ্যান হেনরি এসমণ্ড আই ডু নট নো।' কিন্তু ডিকেন্সের স্তাবক ইয়েটস্ সেই উপন্যাসকেই বলেছে, 'অলমোস্ট স্টিল-বর্ণ ফ্রম দি প্রেস।' ছাপিয়ে বের হবার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু হয়েছে 'হেনরি এসমণ্ডের'। 'দি ভার্জিনিয়ান' এই কাহিনীর শেষাংশ। ইয়েটস্ এই বইকেও ব্যর্থ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। 'ভ্যানিটি ফেয়ার' পড়ে কার্লাইলের স্ত্রী স্বামীকে লিখেছিলেন যে 'ভ্যানিটি ফেয়ার' 'ভেরি গুড ইনডীড, বীটস্ ডিকেন্স আউট অব দি ওয়ার্ল্ড'।' কিন্তু ইয়েটসের ভালো লাগেনি। সে 'ভ্যানিটি ফেয়ারের' মধ্যে থ্যাকারের প্রতিভার অবনতির লক্ষণ দেখতে পেয়েছে।

থ্যাকারে ডিকেন্সের 'ক্রিস্‌মাস ক্যারল', 'ডেভিড কপারফিল্ড' ইত্যাদি গ্রন্থের প্রশংসা করেছেন। ডিকেন্সের 'দি ব্যাটল অব লাইফ' গ্রন্থটি প্রকাশের দিনই তেইশ হাজার কপি বিক্রি হয়েছিল। দুই বোন একই যুবককে ভালোবেসেছে। ছোট বোন বুঝতে পেরেছে, দিদি ভালোবাসলেও মুখে কখনো প্রকাশ করতে পারবে না। দিদি যাতে বিয়ে করে সুখী হতে পারে সেজন্য সে অন্য একজনকে ভালোবাসার অভিনয় করে ওদের মিলনের পথ প্রশস্ত করে দিল। কাহিনীর বিষয়বস্তু হল এই। থ্যাকারের বইটি ভালো লাগেনি। তিনি বলেছেন, বাজে লেখা। থ্যাকারের মন্তব্যকে ঈর্ষাপ্রণোদিত বলা যায় না। কারণ 'টাইমস' এ বইয়ের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছে: বড়দিনের বইয়ের বাজার যে-সকল ট্র্যাশ বইয়ে ছেয়ে যায় 'দি ব্যাটল অব লাইফ' তাদের মধ্যে নিকৃষ্ট।

১৮৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসে থ্যাকারের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে তিনি ডিকেন্সের কন্যা কেটির সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। ডিকেন্সের সঙ্গে বিরোধের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন থ্যাকারে। কেটি বলল, কথা বলে মিটমাট করে ফেলুন না!

'আমার চেয়ে তোমার বাবাই যে বেশী দোষী তা তো জানো।' কেটি বলল, বাবা মুখচোরা। নিজে এগিয়ে এসে কথা বলে যে মিটমাট করে নেবেন তা পারেন না।

থ্যাকারে বললেন, তাহলে তো কখনোই মিটমাট হবে না। একটু ভেবে আবার বললেন, আমি এগিয়ে গেলে আমাকে যদি অপমান করে? যদি কথা না বলে?

কেটি আশ্বাস দিয়ে বলল, সে বিষয়ে ভাববেন না। বাবা নিশ্চয়ই আপনার কথা শুনবেন।

কয়েকদিন পরে অ্যাথিনিয়াম ক্লাবের হলে দাঁড়িয়ে থ্যাকারে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন ডিকেন্স সামনে দিয়ে চলে গেলেন। একবার চেয়েও দেখলেন না,—যেন, কোনোদিনই পরিচয় ছিল না। থ্যাকারে তাড়াতাড়ি এগিয়ে সিঁড়ির কাছে ধরে ফেললেন ডিকেন্সকে। বললেন, বোকার মতো আমরা অনেক ঝগড়া করেছি। আর নয়, এস এবার সব মিটিয়ে ফেলি।

দু'জনে করমর্দন করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নানা বিষয়ে কথা বলে হাসিমুখে দু'দিকে চলে গেলেন।

কেটির সঙ্গে দেখা করে থ্যাকারে সানন্দে জানালেন, মিটমাট হয়ে গেছে।

—কেমন করে হল?

একটু গর্বের সঙ্গে থ্যাকারে বললেন, হবে না? তোমার বাবারই তো যত দোষ। তাই অনেক করে বারবার ক্ষমা চাইল।

কেটি হেসে বলল, আপনি বানিয়ে বলছেন। সত্যি কি ঘটেছে শীগগীর বলুন।

থ্যাকারে বললেন, কি আর হবে? আবার আমরা দু'জনে বন্ধু হয়েছি।

এরপরেই থ্যাকারের মৃত্যু হল। শোকযাত্রীদের মধ্যে ছিলেন ডিকেন্স। সবাই চলে যাবার পরেও ডিকেন্স বহুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে সমাধিক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

□ লেখক বনাম লেখক □

লেখকদের সঙ্গে সমালোচকদের রেষারেষি চিরকালের। লেখকদের অভিযোগ, পেশাদার সমালোচকরা রসবিচারে অক্ষম। এই অক্ষমতার অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। যে বইকে সমালোচক বাতিল করে দিয়েছে, পরবর্তীকালে সে বই-ই হয়তো জনপ্রিয়তার শীর্ষস্থান অধিকার করেছে; আবার সমালোচকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা সত্ত্বেও কত বই চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেছে। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত সমালোচনার নাম করে লেখকদের উপর প্রায়ই নিষ্ঠুর ব্যক্তিগত আক্রমণ করা হত। এর ফলে লেখক ও সমালোচকের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল।

সমালোচক নিজে সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনা করতে পারে না বলেই লেখকদের উপরে তার আক্রোশ। ডিসরায়েলির সংজ্ঞা অনুযায়ী শিল্পে সাহিত্যে ব্যর্থকাম ব্যক্তিরাই সমালোচক। যারা সফলকাম হয়েছে তাদের উপর তাই এদের ঈর্ষা।

কিন্তু শুধু পেশাদার সমালোচকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে কি হবে? লেখকরাও পরস্পরের রচনা সম্বন্ধে কম বিরূপ সমালোচনা করেনি। এইসব বিরূপ মন্তব্য প্রসঙ্গে প্লেটোর কথা মনে পড়ে। তিনি বলেছিলেন, কবি কবিকে এবং কুমোর কুমোরকে ঘৃণা করে। সে যুগে কবি বলতে মোটামুটি সব লেখককেই বোঝাত। লেখকরা যে পরস্পরকে সুনজরে দেখেন না, বর্তমানেও তার প্রমাণের অভাব নেই।

বিরূপ মন্তব্য যে সব সময় ঈর্ষামূলক, তা অবশ্য নয়। কারণ শেক্সপীয়রের সঙ্গে ভলটেয়ারের কিসের শত্রুতা? অথচ তিনি বলছেন: শেক্সপীয়র নিজে মাতাল ও বর্বর; তাঁর লেখা 'হ্যামলেট' এমন অমার্জিত ও বর্বরোচিত যে ফ্রান্স ও ইটালীর সবচেয়ে ইতর শ্রেণীর লোকরাও তা সহ্য করবে না।

শুধু ভলটেয়ারের কেন? শেক্সপীয়রের শত্রুসংখ্যা নেহাত কম নয়—কেউ সমসাময়িক, কেউ বা পরবর্তী যুগের। সমসাময়িক নাট্যকার রবার্ট গ্রীন শেক্সপীয়র সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন: এই এক ভুঁইফোঁড় কাক, যে আমাদের পালক ধার করে নিজেকে সাজিয়েছে। এই প্রসংগে বলা যেতে পারে যে শেক্সপীয়র সত্যিই গ্রীনের কাছে ঋণী। 'উইন্টার্স টেল' নাটকটি গ্রীনের 'প্যাণ্ডোস্টোর' উপর ভিত্তি করে রচিত।

কবি ও নাট্যকার ড্রাইডেন শেক্সপীয়রের রচনায় বাক্য গঠনে অসঙ্গতি, অর্থ প্রকাশে মারাত্মক ত্রুটি এবং দুর্বল ও অক্ষম কাহিনীর অভিযোগ জানিয়েছেন। তাঁর মতে শেক্সপীয়রের রচনার অনেক অংশ একান্ত বাজে লেখকের রচনা অপেক্ষাও নিম্নমানের।

স্যামুয়েল পেপিস নাকি যত নাটক দেখেছেন তার মধ্যে নিকৃষ্ট নাটক 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট'। টলস্টয়ও বলেছেন, 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট' মহৎ শিল্পকর্মের সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না।

স্কটল্যান্ডের দার্শনিক ও ঐতিহাসিক ডেভিড হিউম শেক্সপীয়রের রচনা পড়ে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, শেক্সপীয়র হলেন বিকৃত আকারের এক বিরাট দৈত্য, যার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য নেই এবং খুব নিম্নমানের শিক্ষা লাভ করেছেন তিনি। টি, এস, এলিয়ট 'হ্যামলেট'কে শিল্পকর্ম হিসাবে ব্যর্থ বলে ঘোষণা করেছেন।

ভলটেয়ার বিশ্বসাহিত্যের বিখ্যাত বই 'ডিভাইনা কমেডিয়া'কে নির্বোধের অতিশয়োক্তি এবং অমার্জিত বলে ঘোষণা করতে দ্বিধা করেননি। ওয়ালপোলের বিচারে দান্তের রচনা অতিশয়োক্তিপূর্ণ, অসম্ভব এবং বিরক্তিকর।

গ্যেটের 'ফাউস্ট' সকল দেশের পাঠকদের আনন্দ দেয়, কিন্তু কোলরিজ নিজে কবি হয়েও 'ফাউস্টের' মধ্যে মহান শিল্পকর্মের সন্ধান পাননি। তাঁর মতে 'ফাউস্ট' হল ম্যাজিক লণ্ঠনের শ্রেণীবদ্ধ ছবি, যার অধিকাংশই অশ্লীল এবং ভগবানের নিন্দাসূচক।

বায়রন স্পেন্সারের রচনায় কোনো রসের সন্ধান পাননি। চসারের রচনাকে তিনি চিহ্নিত করেছেন অশ্লীল বলে। ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'এক্সকারসান' তাঁর বিচারে অসংবদ্ধ।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ ভলটেয়ারের 'কাঁদিদ'কে নীরস ব্যঙ্গাত্মক রচনা হিসাবে উপেক্ষা করেছেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ কীটসের 'এনডাইমিয়ন' এবং শেলির 'অ্যালাস্টরের' মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাব্যগুণ দেখতে পাননি। কোলরিজের 'এনশেণ্ট মেরিনার' তাঁর ভালো লাগেনি; তাই 'লিরিক্যাল ব্যালাডস্'-এর দ্বিতীয় সংস্করণে এটি বাদ দিতে চেয়েছিলেন। কবি সাদেও 'এনশেণ্ট মেরিনার' পছন্দ করতেন না।

মিলটনের 'প্যারাডাইস লস্ট' সম্বন্ধে ডঃ জনসন বলেছেন: পাঠকরা 'প্যারাডাইস লস্টের' প্রশংসা করে, কিন্তু একবার রেখে দিলে আবার তুলে নিতে ভুলে যায়। মানবিকতার অভাবের জন্য 'প্যারাডাইস লস্ট' পড়া কর্তব্যের, আনন্দের কাজ নয়।

টলস্টয় বোদলেয়ারের 'ফ্লর দ্যু মাল'-এর মধ্যে এমন একটি কবিতাও পাননি যা সহজ এবং বিশেষ চেষ্টা ছাড়া বোঝা যেতে পারে।

টলস্টয় মানবিকতার মাপকাঠি দিয়ে সাহিত্য বিচার করতেন, তাই 'আংকল টমস্ কেবিন' তাঁর কাছে মহৎ শিল্পসৃষ্টি; কিন্তু গ্যেটের 'বিলহেল্‌ম মাইশটার' তাঁর মতে শিল্প-সংজ্ঞার বাইরে। 'ওডিসি' ও 'ইলিয়াডে' হোমার ক্রোধ ও নিষ্ঠুরতাকে বড় করে দেখিয়েছেন; সুতরাং টলস্টয়ের নিকট এ দুটি মহাকাব্য নীতিহীনতার দোষে দোষী। ফরাসী নাট্যকার রাসিনের রচনা মূল্যহীন; কেন

না, তিনি লিখতেন শুধু অভিজাত শ্রেণীর জন্য। টলস্টয়ের বিচারে শেক্সপীয়র অক্ষম ও অশ্লীল কবি।

ডুবার্শিট নামে একজন লেখক ফ্লোবেয়ারের 'মাদাম বোভারি' সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন: এই উপন্যাসে অনুভূতি, আবেগ বা প্রাণ কিছুই নেই।

কোলরিজ স্কটের উপন্যাসে শিল্পকর্মের মহৎ নিদর্শন দেখতে পাননি। 'আইভান হো' তাঁর মতে ব্যর্থতার একটি শোচনীয় দৃষ্টান্ত।

ওয়াল্ট হুইটম্যান কখনো ন্যাথানিয়েল হথর্নের রচনা পড়ে আনন্দ পাননি। কোনো বয়স্ক ব্যক্তিই পাবে না। কেন না, লেখার মধ্যে অপরিণত মনের ছাপ রয়েছে।

স্যামুয়েল বাটলার কুড়ি বছর ধরে 'দি ওয়ে অব অল ফ্লেশ' লিখেছেন। লেখা শেষ করে পাণ্ডুলিপি দেখতে দিলেন প্রকাশক চ্যাপম্যান অ্যাণ্ড হলকে। এই কোম্পানীর রীডার ছিলেন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক জর্জ মেরিডিথ। মেরিডিথ পাণ্ডুলিপি প্রকাশের অযোগ্য বলে মত দিলেন। বাটলারের মৃত্যুর পরে বেরিয়েছে 'দি ওয়ে অব অল ফ্লেশ'। এখন এ বই ইংরেজী সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

সরাসরি মন্তব্য না করে অনেকে পরোক্ষ বিরূপতা প্রকাশ করেছেন। গ্যেটে যেমন বলেছেন, তিনি বায়রনের রচনার বিশেষ ভক্ত। শেলি, কীটস, ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতার আবেদন তাঁর কাছে অপেক্ষাকৃত কম ছিল।

একবার টমাস মানকে প্রশ্ন করা হয়েছিল—আপনার নিজস্ব পুস্তক সংগ্রহটি যদি হঠাৎ আগুন লেগে পুড়ে যায় তাহলে কোন্ বইগুলি নতুন করে প্রথম কিনবেন? মান যে ক'টি বইয়ের তালিকা দিয়েছিলেন তার মধ্যে ফ্লোবেয়ারের 'মাদাম বোভারি' ছিল না, ছিল 'সেণ্টিমেণ্ট্যাল এডুকেশান'। গ্যেটের 'বিলহেল্মে মাইশটার' ছিল, ছিল না 'ফাউস্ট'। ক্নুট হামসুনের 'গ্রোথ অব দি সয়েল' তিনি নির্বাচন করেননি, করেছিলেন 'ভিক্টোরিয়া'।

উপরের সঙ্কলন থেকে দেখা যাবে খ্যাতনামা লেখকরা প্রসিদ্ধ বই সম্বন্ধে এমন মন্তব্য করেছেন, যা গ্রহণযোগ্য নয়। অবশ্য এসব বিরূপ মন্তব্য বইয়ের প্রচার কিংবা খ্যাতি ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারেনি। কারণ মন্তব্যকারীরা তাঁদের মতামত জোর করে কারো উপর চাপিয়ে দিতে চাননি। একমাত্র ড্রাইডেন নিজের মন্তব্যকে প্রমাণ করবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিলেন। ড্রাইডেন শেক্সপীয়রের 'অ্যাণ্টনি অ্যাণ্ড ক্লিওপেট্রা'র মধ্যে এত ত্রুটি দেখতে পেয়েছিলেন যে নাটকটি পুনর্লিখনের প্রয়োজন তিনি অনুভব করেছিলেন। এবং সত্যি সত্যি ড্রাইডেন শেক্স-পীয়রের উপর গুরুগিরি করবার জন্য একই বিষয় নিয়ে লিখেছিলেন 'অল ফর লাভ'। ড্রাইডেনের 'আবিষ্কৃত' ত্রুটি সত্ত্বেও 'অ্যাণ্টনি অ্যাণ্ড ক্লিওপেট্রা' অমর হয়ে আছে; আর 'অল ফর লাভ'-এর স্থান এখন শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসের পাতায়।

পেশাদার সমালোচককে আমরা অবিবেচনার জন্য অভিযোগ করে তৃপ্তি অনুভব করতে পারি। কিন্তু যাঁরা নিজেরা রসসৃষ্টি করেন, বিখ্যাত সাহিত্যকীর্তি সম্বন্ধে তাঁদের অভিমতের বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। এর একমাত্র ব্যাখ্যা এই যে, প্রত্যেক মানুষ তার ব্যক্তিগত রুচি ও বিচারবুদ্ধি অনুসারে শিল্পকীর্তি সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করে। এজন্য নির্দিষ্ট কোনো মানদণ্ড নেই। সমালোচনার উপর আমরা অকারণে বড় বেশী আস্থা স্থাপন করি। এটা অবশ্য সৃষ্টিমূলক রচনার পক্ষে প্রযোজ্য ; তথ্যমূলক রচনার কথা আলাদা।

॥ ২ ॥

ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, অধ্যাপক ইত্যাদি কত অসংখ্য জীবিকাধারী লোক আছে সংসারে। তাদের মধ্যে কলহ ও হাতাহাতি হবার দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পাতায় বড় একটা পাওয়া যায় না। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে লেখকদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের কাহিনী অনেক পাওয়া যায়। লেখক বলেই এই ইতিহাস দীর্ঘকাল পাঠকদের চিত্তবিনোদন করতে পারছে। কারণ ডাক্তার যখন ডাক্তারের বিরুদ্ধে লাগে তখন সেটা কেউ লিখে রাখে না। কিন্তু লেখকদের বেলায় ঠিক উল্টো। হয় দুই বিবদমান পক্ষ কিংবা অন্য কোনো লেখক দ্বন্দ্বের বিবরণ লিখে রাখেন। কারণ বিষয়-বস্তু হিসাবে এসব ঘটনা চিত্তাকর্ষক।

লেখকদের কলহ পুরনো দিনের কথা নয়। এখনো কলহ এবং হাতাহাতি চলে। অবশ্য আমাদের দেশের লেখকরা মাত্রা রক্ষা করে চলেন। তাঁরা সমালোচনা করেন, গালাগাল করেন, কটূক্তি করেন—কিন্তু তার বেশী সাধারণত যান না। পশ্চিমী লেখকরা মাত্রা অতিক্রম করতে দ্বিধা করেন না। বর্তমান শতকের কয়েকটি পশ্চিমী কলহের কথা এখানে বলছি।

দেহের আঘাত মিলিয়ে যায়, বেদনার উপশম হয় কিছুকাল পরে। কিন্তু লেখার মধ্য দিয়ে যদি আঘাত করা হয়, তার জ্বালা ভোগ করতে হয় মৃত্যু পর্যন্ত। বিশেষ করে লেখক যদি শক্তিশালী হন এবং তাঁর রচনাটি যদি রসোত্তীর্ণ হয়। এমনি একটি বই সমারসেট মম্-এর 'কেকস্ অ্যাণ্ড এইল'।

বই তখনো বাজারে বের হয়নি। প্রকাশক প্রুফ কপি পাঠিয়েছে বুক সোসাইটিতে। সোসাইটির মনোনয়ন পেলে বিক্রি বেড়ে যাবে সেই আশায়। বইটি পড়ল সোসাইটির প্রভাবশালী সদস্য হিউ ওয়ালপোলের হাতে। তিনিও নামকরা ঔপন্যাসিক, তখন পর্যন্ত প্রায় ত্রিশখানি বই লিখেছেন। ওয়ালপোল মমের অনেকদিনের বন্ধু। বন্ধুর নতুন বই বলেই তিনি আগ্রহ নিয়ে এসেছেন এবং বাড়ীতে এসেই পড়তে বসলেন।

কয়েক পৃষ্ঠা পড়বার পর ওয়ালপোলের কেমন সন্দেহ হল। উপন্যাসের একটি

চরিত্র—অ্যালরয় কীর—যেন তাঁরই ছায়া নিয়ে লেখা। আরও কিছুদূর অগ্রসর হবার পর আর সন্দেহ রইলো না। ওয়ালপোলেরই ক্যারিকেচার এই চরিত্রটি। স্কুল মাস্টার ওয়ালপোল খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক হবার সংকল্প নিয়ে লিখতে শুরু করেছিলেন। সাহিত্য জগতে তিনি নবাগত ; সুতরাং প্রতিষ্ঠিত লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য তিনি সবকিছু করতে প্রস্তুত ছিলেন। কেউ তাঁর বইয়ের বিরূপ সমালোচনা করলে ওয়ালপোল কখনো চটতেন না। তাঁকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করে সমালোচকের অন্তর্দৃষ্টির প্রশংসা করতেন। বলতেন, না হলে অন্য কারো চোখে যে ত্রুটি ধরা পড়েনি তা ইনি কি করে বুঝতে পারলেন ?

বলা বাহুল্য, এই সমালোচকই ওয়ালপোলের পরবর্তী বইটির প্রশংসা করেছেন।

মম্ ও অন্যান্য লেখকরা ওয়ালপোলের চরিত্রের এইসব দুর্বলতার কথা জানতেন। তবে মম্ কখনো এ সম্বন্ধে তাঁকে কিছু বলেননি। বরং অন্য লেখকদের—যেমন হেনরি জেমস্ বা টমাস হার্ডি—সম্বন্ধে প্রায়ই বিরূপ মন্তব্য করতেন।

ওয়ালপোল বই ছেড়ে উঠতে পারছেন না। নিজের ছবি দেখছেন অন্যের চোখ দিয়ে। জ্বালা ধরে যায় পড়তে পড়তে। তবু শেষ না করে শুতে পারলেন না। দীর্ঘকাল মম্ তাঁর কথাবার্তা চালচলন সব নিপুণভাবে লক্ষ্য করে অ্যালরয় কীরকে সৃষ্টি করেছেন। এমন সব কথা উদ্ধৃত করা হয়েছে যা মম্ ছাড়া আর কারো জানবার কথা নয়।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই ওয়ালপোল ব্যাপারটা জে বি প্রিস্টলিকে বললেন। প্রিস্টলিও বুক সোসাইটির মেম্বার এবং তিনিও 'কেকস্ অ্যাণ্ড এইল'-এর প্রুফ কপি পেয়েছেন। প্রিস্টলি নিজেই ওয়ালপোল ও কীর-এর মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করে মমকে প্রশ্ন করেছিলেন। মম্ নাকি জানিয়েছেন, কীর নেহাত কাল্পনিক চরিত্র।

সাময়িকভাবে শান্ত হলেন ওয়ালপোল। কিন্তু বেশীদিনের জন্য নয়। বই বাজারে না বেরুতেই কথাটা লেখকমহলে রাষ্ট্র হয়ে পড়ল। এই উপন্যাসে টমাস হার্ডির প্রতিরূপও সৃষ্টি করা হয়েছে এডওয়ার্ড ড্রিফিল্ডের চরিত্রে। বই বেরুবার পর কোনো কোনো সমালোচক টমাস হার্ডিকে হেয় করবার জন্য মমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন। ওয়ালপোল নিশ্চিন্ত হবার জন্য মমের কাছে চিঠি লিখলেন। মম্ তাঁর দীর্ঘ জবাবে স্পষ্ট করেই জানালেন কীর-এর সঙ্গে ওয়ালপোলের এবং ড্রিফিল্ডের সঙ্গে টমাস হার্ডির কোনো যোগ নেই। দুটি চরিত্রই কাল্পনিক। তিনি ওয়ালপোলকে সান্ত্বনা দেবার জন্য কীর-এর সঙ্গে তাঁর যেখানে যেখানে পার্থক্য তা ব্যাখ্যা করে দিলেন সবিস্তারে।

ওয়ালপোল একটু শান্ত হলেও সন্দেহ গেল না। দু'বছর আগে হার্ডির মৃত্যু হয়েছে। তাঁকে ক্যারিকেচার করায় সকলে ক্ষুব্ধ। ওয়ালপোলের ক্যারিকেচার নিয়ে অনেকেই মজা উপভোগ করে। কীর-এর চরিত্র তাঁকে সর্বদা তাড়া করে। কীর যদি

সত্যি ওয়ালপোল হয়—তিনি ডায়েরীতে লিখলেন—তাহলে আমার পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়া ভালো।

ভাগ্যের পরিহাস। বছরখানেক পরেই মমকে ওয়ালপোলের অবস্থায় পড়তে হল। আমেরিকা থেকে একটি উপন্যাসের প্রুফ কপি পেলেন মম্। বইটির নাম 'জিন অ্যান্ড বিটার্স'। লেখক এমন এক ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন যার অর্থ 'প্রত্যাঘাত'।

উপন্যাসের নায়ক লেভারসন হুরলে একজন কৃতী ইংরেজ ঔপন্যাসিক। তার চারিত্রিক ত্রুটিগুলি নিয়ে সাহিত্যগুণসম্পন্ন ব্যঙ্গ করা হয়নি, করা হয়েছে নির্মম উদ্ঘাটন। সারারাত জেগে মম্ বইটি শেষ করলেন। তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইলো না যে উপন্যাসের নায়ক তিনিই। তাহিটি এবং নিকটবর্তী দ্বীপসমূহে সভ্যমানুষের দৃষ্টির অন্তরালে তিনি যে জীবন যাপন করেছেন, তারও চিত্র উদ্ঘাটিত করা হয়েছে নিপুণতার সঙ্গে। হুরলে লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তাদের জীবনের গোপন কথা, বেদনার কথা জেনে নেয়—তারপর একদিন গল্পে বা উপন্যাসে তা প্রকাশ করে বন্ধুত্বের মর্যাদা না রেখে। পাত্র-পাত্রীদের নাম-বদল প্রায়ই তাদের চিহ্নিত করবার পথে বাধা হয় না। মৃত এবং জীবিত লেখকদের নিয়ে বিদ্রূপাত্মক রচনা লিখতে সে অভ্যস্ত। হুরলের সৃষ্টির ক্ষমতা এতই সীমাবদ্ধ যে বাস্তব ঘটনা বা প্রত্যক্ষ চরিত্রের অবলম্বন না পেলে তার লেখা হয় না।

সমালোচকরা পূর্বেও এসব বিষয়ে মমের আলোচনা করেছেন। 'জিন অ্যান্ড বিটার্স' ইংলন্ডে প্রচারিত হবার পর সাহিত্যজগতে সকলেরই স্বাভাবিকরূপেই ধারণা হল যে এই উপন্যাসটির লেখক ওয়ালপোল। বছরখানেক পূর্বে প্রকাশিত 'কেকস্ অ্যান্ড এইল'-এর প্রতিশোধ নিয়েছেন তিনি। লেখকের 'প্রত্যাঘাত' ছদ্মনামটিতে এই প্রতিশোধস্পৃহা স্পষ্টতর হয়েছে।

ওয়ালপোল শঙ্কিত হলেন, পাছে মমও বিশ্বাস করেন তিনিই হুরলে চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং চিঠি লিখে জানিয়ে দিলেন, তিনি লেখেননি এবং কে লিখেছে তাও জানেন না। ওয়ালপোল পরামর্শ দিলেন, ইনজাংশন জারি করে দেওয়া উচিত। তাঁর এই উপদেশ মম্ হয়তো শুনেছিলেন। তাই 'জিন অ্যান্ড বিটার্স' ইংলন্ডে 'ফুল সার্কল' নামে বের হবার সঙ্গে সঙ্গেই বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়।

কিন্তু ওয়ালপোলের উপর থেকে সন্দেহটা সহজে দূর হয়নি। অনেক অনুসন্ধানের পর জানা গেল এলিনর মোরডন্ট নামে এক মহিলা বইটির লেখিকা। মম্ যেসব জায়গায় বেড়াতে গিয়েছেন, থেকেছেন, সেসব জায়গা ঘুরে তিনি তথ্য সংগ্রহ করে লিখেছেন এই কাহিনী। এলিনর কেন যে মমকে হেয় করে এমন একটি বই লিখেছেন তার কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ জানা যায় না।

যাই হোক, মোরডন্টের বই ইংলন্ডে নিষিদ্ধ হলেও মমের 'কেকস্ অ্যান্ড এইল'-

এর জনপ্রিয়তা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল। আর সেই সঙ্গে বাড়তে লাগল ওয়াল-পোলের মানসিক যন্ত্রণা। কিছু একটা প্রতিকার করতে গেলেই আইনের আশ্রয় নিতে হয়। তাতে কলহের সৃষ্টি হবে। এর চেয়ে অপমান সহ্য করেও এতবড় খ্যাতিমান ঔপন্যাসিককে নিজের বন্ধু হিসাবে প্রচার করায় আত্মপ্রসাদ আছে। মৃত্যুর মাত্র চার বছর পূর্বে ওয়ালপোল তাঁর উপন্যাস 'দি লাইফ অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার্স অব জন কর্নেলিয়াস'-এ আন্টি বারট্রান্ডের চরিত্রে মমকে বিদ্রূপ করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা এত দুর্বল যে, প্রায় কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। অ্যালরয় কীর যে হিউ ওয়ালপোল নয়, শুধু মমের নিজের স্বীকৃতির এই সান্ত্বনাটুকু নিয়ে তিনি পরলোকগমন করেন ১৯৪১ সালে।

ঝঞ্ঝাট এড়াবার জন্যই মম্ সত্য গোপন করেছিলেন। সত্য প্রকাশ করেন দশ বছর পরে। 'কেকস্ অ্যান্ড এইল'-এর একটি নতুন আমেরিকান সংস্করণের ভূমিকায় প্রথম ঘোষণা করেন যে, অ্যালরয় কীরকে সৃষ্টি করবার সময় ওয়ালপোল তাঁর মনের সামনে উপস্থিত ছিলেন।

মম্ অবশ্য কৈফিয়ত দিয়েছেন যে, ঔপন্যাসিক তার পরিচিত লোক থেকেই চরিত্র গ্রহণ করে সত্য, কিন্তু লেখক পরিচিতকেই অপরিচিত করে তোলে দু-একটি রেখার টানে। ওয়ালপোলকে কীর-এর মধ্যে চিনুক এটাই ছিল মমের উদ্দেশ্য। মম্ আর-এক লেখকের এমন একটি বিদ্রূপাত্মক চরিত্র সৃষ্টি করেছেন যা আজও লোকে পড়ে আনন্দ উপভোগ করে, ভবিষ্যতেও করবে। লেখকদের মধ্যে দ্বন্দ্বের এমন একটি দৃষ্টান্ত বিরল। অখ্যাত লেখিকা এলিনর মোরডন্ট-এর হুরলে চরিত্র লোকের ভুলে যেতে দেরি হয়নি।

আমেরিকার আর-একজন স্বল্পখ্যাত লেখক বার্নার্ড ডি ভোটো উপন্যাসের চরিত্রের মধ্য দিয়ে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ঔপন্যাসিক সিনক্লেয়ার লুইসকে বিদ্রূপ করবার চেষ্টা করেছিলেন। মোরডন্টের প্রচেষ্টার মতো এটাও যে ব্যর্থ হয়েছিল তা বলা বাহুল্য।

ডি ভোটো ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক। আকাঙ্ক্ষা হল লেখক হিসাবে নাম করবার। সেই নতুন পথে যাত্রার প্রথম পর্বে অকস্মাৎ ট্রেনে একদিন দেখা হয়েছিল প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক সিনক্লেয়ার লুইসের সঙ্গে। তিনি উৎসাহ দিয়েছিলেন, দু-একজন সম্পাদকের নিকট সুপারিশপত্র দিয়ে সাহায্যও করেছিলেন। সেই থেকে তাঁদের সহৃদয় সম্পর্ক।

ডি ভোটো নিজের ঐকান্তিক সাধনায় সমালোচক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন। প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে বড় নিদর্শন ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত বিখ্যাত 'স্যাটারডে রিভিয়ু অব লিটারেচার'-এর সম্পাদনা করবার সুযোগ। সমালোচক হিসাবে ডি ভোটো মোটেই জনপ্রিয় ছিলেন না। বয়োজ্যেষ্ঠ প্রাজ্ঞ সমালোচক ব্রুকস্-এর মতবাদ এবং প্রচলিত মতামতের বিরুদ্ধে কলম ধারণ করাকেই তিনি ব্যক্তিত্ব ও বিশিষ্টতার প্রমাণ

বলে মনে করতেন।

সিনক্লেয়ারের যখন এত খ্যাতি তখন বোধ হয় ডি ভোটোর মনে হল যে তাঁকে অপদস্থ করে কিছু লিখলেই পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে। সিনক্লেয়ার লুইসের প্রতিরূপ ব্যঙ্গচিত্র হিসাবে ডি ভোটো তাঁর উপন্যাস 'উই অ্যাকসেপ্ট উইথ প্লেজার'-এ ফ্র্যাঙ্ক আরচার চরিত্র আনেন। ডি ভোটো যে জন আগস্ট ছদ্মনামে উপন্যাস লিখতেন একথাটা আগে বলা হয়নি। সমালোচকদের মত ছিল যে এগুলি তৃতীয় শ্রেণীর রচনা।

'উই অ্যাকসেপ্ট উইথ প্লেজার'-এ সিনক্লেয়ারকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে, আমেরিকান সমাজকে তিনি অনেক বিদ্রূপ করেছেন, আমেরিকান মহাপুরুষরা হয় শঠ, নয় নির্বোধ; আমেরিকানদের ধর্ম, বিশ্বাস, আদর্শ, প্রেম সবই মূল্যহীন। পাঠকরা কতদিন আর নিজেদের নিন্দা শুনবে ক্রমাগত?

সিনক্লেয়ারের যে চিত্র ডি ভোটো আঁকলেন তা প্রায় কারোরই দৃষ্টি আকর্ষণ করল না। ডি ভোটো কিন্তু প্রসঙ্গটি ভোলেননি। প্রায় দশ বছর পরে 'দি লিটারারি ফ্যালাসি' নামে তাঁর একটি সমালোচনার বই বের হয়। এ বইয়ে আক্রমণ করা হয় সমালোচক ভ্যান ওয়াইক ব্রুকস এবং প্রথম যুদ্ধোত্তর সকল প্রধান প্রধান আমেরিকান লেখকদের। সিনক্লেয়ার লুইস এই প্রধানদের একজন। ডি ভোটোর অভিযোগ যে, ব্রুকস-এর সমর্থন পেয়ে এই লেখকরা আমেরিকার জীবন ও আদর্শের বিকৃত রূপ স্বদেশে এবং বিদেশে তুলে ধরছে। যে কোনো গোঁড়া স্বদেশপ্রেমিক সিনক্লেয়ারের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ বেশ জোরের সঙ্গেই করতে পারে। কারণ তিনি সমসাময়িক সমাজের একেকটি দুর্নীতি ও মিথ্যাচারকে উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করে তাকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেছেন।

সাধারণভাবে সিনক্লেয়ারকে আক্রমণ করেই ডি ভোটো ক্ষান্ত রইলেন না। যে উপন্যাসের জন্য তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে সেই বইকে নানা দিক থেকে আক্রমণ করা হল 'দি লিটারারি ফ্যালাসি'তে। মার্টিন অ্যারোস্মিথ কি নায়ক হবার যোগ্য? ও তো নির্বোধের চরিত্র। অবশ্য সিনক্লেয়ারের কোন্ চরিত্রই বা জীবন্ত? সব নরনারীই অপরিণত, বোকা-বোকা বলে মনে হয়। জীবনের প্রকৃত ছবি কোনো উপন্যাসে ফুটে ওঠেনি। অথচ সিনক্লেয়ার প্রমুখ ঔপন্যাসিকরাই জনপ্রিয়তার শিখরখ্যাতি ভোগ করছে!

এটা সম্ভব হয়েছে পাঠকেরা লেখকদের অবাধ সুযোগ দিয়েছে বলে। পাঠকেরা রুখে দাঁড়ালেই এই শ্রেণীর লেখকদের শায়েস্তা করা যেতে পারে। আর এই উদ্দেশ্যে হয়তো 'মূর্খ' এবং 'মিথ্যাবাদী' শব্দ দুটি নতুন করে সাহিত্যক্ষেত্রে আমদানী করতে হবে।

অথচ ১৯২৫ সালে 'অ্যারোস্মিথ' প্রকাশিত হবার পরেই ডি ভোটো ঘোষণা করেছিলেন যে, এ উপন্যাস আমেরিকান জীবনের বাস্তব চিত্র। অন্য সমালোচক-

কোনো ত্রুটি দেখালে তিনি প্রতিবাদ করেছেন।

যাই হোক, সিনক্লেয়ার 'দি লিটারারি ফ্যালাসি' পড়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর মনে হল, ডি ভোটোর এই ব্যবহার বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া কিছু নয়। ডি ভোটোকে গালাগালি দিয়ে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেন সিনক্লেয়ার। তিনি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন ঃ

'I denounce Mr. Berned Devoto as a fool and a tedious and egotistical fool, as a liar and a pompous and boresome liar.'

সাহিত্যের সাম্প্রতিক ইতিহাসে এমন কঠোর নির্মল গালাগালি একজন লেখক আর-একজনকে দেননি। সবাই ভাবল, ডি ভোটোর লেখা এ জন্মের মতো শেষ হয়ে গেল, আর কখনো তাঁর পক্ষে মাথা তুলে দাঁড়ানো সম্ভব হবে না। কিন্তু আশ্চর্য, এর পরেও ডি ভোটোর নতুন নতুন বই বেরিয়েছে এবং তার চেয়েও আশ্চর্য, তিনি আবার নতুন করে সিনক্লেয়ারের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছেন।

হেমিংওয়ে বড় লেখক, নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই করেছেন, শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে নেমেছেন, পাহাড়-পর্বতে উঠেছেন, বনে-জঙ্গলে ঘুরেছেন,—এসব আমরা জানি। কিন্তু তিনি যে কত বড় অকৃতজ্ঞ, তা তেমন জানা নেই। যাঁরা তাঁকে সাহিত্য-জীবনে নানাভাবে সাহায্য করেছেন, সফলতা অর্জন করবার পর হেমিংওয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে লিখেছেন অকুণ্ঠচিত্তে। বোধ হয় কৃতজ্ঞতা অস্বীকার করবার তাগিদেই এমন করেছেন।

হেমিংওয়ের বয়স তখন বছর তেইশ। চিকাগো শহরের একটি ফ্ল্যাটে থাকেন আরও কয়েকজন লেখক-যশঃপ্রার্থী তরুণের সঙ্গে। এঁদের মধ্যে হেমিংওয়েরই আছে জীবন সম্বন্ধে কিছু গভীর অভিজ্ঞতা। প্রথম মহাযুদ্ধে তিনি যোগ দিয়েছিলেন অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার হিসাবে। তাছাড়া সংবাদপত্রের রিপোর্টারের কাজ করবার অভিজ্ঞতাও তিনি অর্জন করেছেন।

এই ফ্ল্যাটেই মাঝে মাঝে আসতেন আমেরিকার প্রবীণ ঔপন্যাসিক শেরউড অ্যাণ্ডারসন। অ্যাণ্ডারসন হেমিংওয়ের চেয়ে প্রায় বাইশ বছরের বড়, সমকালীন আমেরিকান সাহিত্যে নেতৃস্থানীয়। লেখক-প্রসিদ্ধি-লিপ্সু তরুণদের লেখা পড়ে দেখেন, মন্তব্য করেন, আবার অনেক সময় নিজের নতুন লেখা তাদের পড়ে শোনান। হেমিংওয়ের উপর অ্যাণ্ডারসনের অনেক আশা। তাঁর বিশ্বাস, একদিন তিনি সাহিত্য জগতে নাম করবেন।

বছরখানেক পরে হেমিংওয়ে স্থির করলেন প্যারিস যাবেন। সেখানে তখন আরও কয়েকজন তরুণ আমেরিকান সাহিত্যচর্চা করছেন। হেমিংওয়ের সঙ্গে অবশ্য তাঁদের আলাপ ছিল না। নতুন জায়গায় হেমিংওয়ের যাতে একটু সুবিধা হয় এজন্য অ্যাণ্ডারসন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে গারট্রুড স্টেনকে একটি চিঠি লিখে দিলেন। শ্রীমতী স্টেনের সঙ্গে হেমিংওয়ের পরিচয়ের সূত্রপাত করে দিলেন অ্যাণ্ডারসন। এই পরিচয়ের

ফলে হেমিংওয়ের প্রতিষ্ঠা সহজ এবং দ্রুত হয়েছে। সাহিত্যিক প্রভাব তো পড়েছেই। শ্রীমতী স্টেনের গদ্যরীতির প্রভাব হেমিংওয়ের রচনায় সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত করা যায়। হেমিংওয়ের সঙ্গে সম্পর্কের বিবরণ তিনি লিখে গেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে।

প্রথম পর্বে শ্রীমতী স্টেনের প্রতি হেমিংওয়ের শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। সব লেখা তাঁকে পড়তে দিতেন, নির্মম সমালোচনা শুনতেন, নির্দেশ অনুসারে লেখা বদলাতেন। সব খবর শ্রীমতী স্টেনকে না বললে তৃপ্তি পেতেন না। কোথায় মাছ ধরা হল, বক্সিং খেলা বা ষাঁড়ের খেলা হল, লেখা কতটুকু অগ্রসর হয়েছে ইত্যাদি। আবার স্টেনের কাজও করে দিতেন। যেমন, তাঁর সুবৃহৎ উপন্যাস 'দি মেকিং অব আমেরিকান্স'-এর পাণ্ডুলিপি ছাপার জন্য তৈরী করে দেবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন হেমিংওয়ে। চব্বিশ বছরের বড় স্টেনকে তিনি গুরুর আসনে বসিয়েছিলেন। স্টেনের নির্দেশেই তিনি 'টরোণ্টো ডেইলি স্টার'-এর সংবাদদাতার কাজ ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্ণভাবে লেখায় আত্মনিয়োগ করেন।

অথচ পরে হেমিংওয়ে অ্যাণ্ডারসন ও গারট্রুড স্টেন—এই দু'জনের বিরুদ্ধেই বিষোদ্‌গার করেছেন। কিন্তু তার আগে আর-এক বন্ধুকে ঘায়েল করেছিলেন। সেই বন্ধুর নাম হ্যারল্ড লোয়েব। লোয়েব তখন য়ুরোপে থেকে একটি সাহিত্যপত্র সম্পাদনা করছেন। তাঁর প্রথম উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি নিউইয়র্কের এক প্রতিষ্ঠাপন্ন প্রকাশক-সংস্থা গ্রহণ করেছে। এই সম্পর্কে লোয়েব শীঘ্রই নিউইয়র্ক যাবেন। হেমিংওয়েকে পরামর্শ দিলেন, 'তোমার কিছু লেখা নির্বাচন করে আমার প্রকাশককে পাঠিয়ে দাও না। আমি তো যাচ্ছি, যাতে ওরা ছাপে তার ব্যবস্থা করব।'

হেমিংওয়ের বিশেষ ভরসা নেই। কি হবে মিছিমিছি পাঠিয়ে, নতুন লেখকের বই এমনিতে কে ছাপে! তবু লোয়েবের আগ্রহে শেষ পর্যন্ত কিছু লেখা সংকলন করে পাঠিয়ে দিলেন।

লোয়েব নিউইয়র্ক এসে কিছুদিন নানা কাজে ব্যস্ত ছিলেন। হেমিংওয়ের তাগিদ-পত্র পেয়ে প্রতিশ্রুতির কথা মনে পড়ে গেল। প্রকাশকের অফিসে খোঁজ করবার পর দেখা গেল পাণ্ডুলিপি সেদিনই ডাকে ফেরত যাচ্ছে—প্যাক করা, ঠিকানা লেখা সব হয়ে গেছে। লোয়েব অনুরোধ জানালেন ঃ এখনই ফেরত পাঠাবেন না। আর একবার পড়ুন আপনারা। ও সত্যি লিখতে জানে। ফিরিয়ে দিলে আপনারাই ঠকবেন।

এক সপ্তাহ পরে আবার খোঁজ নিতে গিয়ে লোয়েব জানলেন তাঁর অনুরোধ প্রকাশক রক্ষা করেছেন, বই তাঁরা ছাপাবেন। তখনি লোয়েব কেব্‌ল পাঠালেন হেমিংওয়েকে। সে রাত্রিতে হেমিংওয়ে ঘুমুতে পারেননি। হাজারো প্রশ্ন করে চিঠি লিখলেন ঃ বই কবে বেরুবে, পাণ্ডুলিপির সবটাই ছাপাবে তো, কত টাকা দেবে, ইত্যাদি। লোয়েবের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ছাড়া হেমিংওয়ের 'ইন আওয়ার টাইম'

বইটি তখন বেরুতে পারত না।

অথচ আশ্চর্য, কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে হেমিংওয়ে বন্ধুকে ক্যারিকেচার করেছেন তাঁর প্রথম সফল উপন্যাস 'দি সান অলসো রাইজেস'-এ। এই কাহিনীর রবার্ট কনের চরিত্রে লোয়েবকে চেনা যায়। লোয়েবের পারিবারিক পটভূমিকা, তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, দৈনন্দিন জীবনের রীতিনীতি ইত্যাদি সবকিছুকেই বিদ্রূপ করা হয়েছে। সবচেয়ে মর্মান্তিক তাঁর লেখক হবার আকাঙ্ক্ষাকে আঘাত করা এবং যে একটিমাত্র উপন্যাস ছাপা হয়েছিল তাকে নস্যাৎ করা।

লোয়েবের পরেই এলো শেরউড অ্যান্ডারসনের পালা। বাইরে থেকে কোনো কারণ দেখা যায় না, অথচ উপকারকের পেছনে লাগা ছিল হেমিংওয়ের সারাজীবনের অভ্যাস। একটা কারণ শুধু অনুমান করা যেতে পারে যে, হেমিংওয়ে সর্বদাই নিজের শক্তির দম্ভ করতে ভালোবাসতেন। সাফল্যের জন্য তিনি যে অন্য কারো সহায়তার উপর নির্ভর করেননি, স্ব-শক্তি বলেই আত্মপ্রতিষ্ঠা করেছেন, এই কথাটা ঘোষণা করবার জন্যই হয়তো তিনি উপকারকদের এমন করে অবমাননা করেছেন।

তখনও হেমিংওয়ের প্রথম শ্রেণীর রচনা একটিও বের হয়নি। সেই সময় (১৯২৫) বেরুলো তাঁর 'দি টরেন্ট্স অব স্প্রিং'। সমস্ত বইটিতে শেরউড অ্যান্ডারসনের রচনারীতির প্যারডি, তাছাড়া গারট্রুড স্টেন, হেনরি জেমস, ফোর্ড প্রভৃতির ব্যঙ্গানুকৃতি পাওয়া যাবে বিভিন্ন চরিত্রে। শুভার্থী অনেকের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটল এই বই বেরুবার পর।

হেমিংওয়ে সুযোগ পেলেই নিজের গায়ের জোরের কথা জাহির করতেন। প্যারিসের পথে অন্যমনস্ক হয়ে পথ চলতে চলতে হয়তো অদৃশ্য প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বক্সিংয়ের প্যাঁচ কষছেন। মাঝে মাঝে বক্সিংয়ে নামেনও। তরুণ লেখক স্কট ফিটজেরাল্ড হেমিংওয়ের শক্তিমত্তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখবার জন্য ব্যগ্র। তাঁরই আগ্রহে কানাডার লেখক মর্লি কালাঘান-এর সঙ্গে একদিন বক্সিং খেলতে রাজী হলেন হেমিংওয়ে। স্কট শুধু দর্শক নন, সময়রক্ষকও। তিন মিনিট হয়ে গেলেই দু'পক্ষকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে, এবার বিশ্রামের সময় হয়েছে। দু-এক রাউন্ডের পরেই কালাঘানের আঘাতে হেমিংওয়ের নাক-মুখ দিয়ে রক্ত বেরুতে লাগল। একটু পরেই এক প্রচণ্ড ঘুষিতে হেমিংওয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন। স্কট তো এসব কাণ্ড-কারখানা দেখে একেবারে থ' বনে গেছেন, ভুলে গেছেন সময়ের কথা। সময়-সংকেত যখন দেওয়া হল তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। হেমিংওয়ে তো চটে লাল! স্কটের ভুলের জন্যই তাঁর হার হয়েছে এমনি ভাব দেখালেন।

কালাঘান তো বাড়ী চলে গেছেন। এদিকে নিউইয়র্কে এক কাগজে হেমিংওয়ে ও কালাঘানের বক্সিংয়ের কাহিনী এমন করে ছাপা হল যে, হেমিংওয়ের শোচনীয়

পরাজয়টাই বড় হয়ে ওঠে পাঠকের কাছে। প্যারিসে বসে হেমিংওয়ে তো রেগে আগুন! নিশ্চয় এটা কালাধানের কাজ। শুরু হলো পত্রযুদ্ধ। চলেছিল বেশ কিছুদিন, আর তাতে স্কটও জড়িয়ে পড়েছিলেন। ভাগ্যে একটা মহাসমুদ্রের ব্যবধান ছিল, না হলে দু'জনের মধ্যে আমৃত্যু বাক্সিং শুরু হয়ে যেত!

আরও কয়েক বছর পরের কথা। হেমিংওয়ের কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। সেই সময় তাঁর রচনার সমালোচনা করেন বন্ধু ম্যাক্স ঈস্টম্যান, সাময়িক পত্রিকায়। এই প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল এই যে, হেমিংওয়ের মধ্যে কোথাও এমন একটা দুর্বলতা আছে যা ঢাকবার জন্য তিনি ক্রমাগত আপন শক্তিমত্তা জাহির করার কাজে ব্যস্ত। তাঁর অনুকরণে একদল তরুণ লেখক বুকে পরচুলা লাগিয়ে শক্তির দম্ভ দেখাচ্ছে (বুকে লোম থাকা শক্তিমত্তার লক্ষণ)।

এসব মন্তব্য চার বছর পরেও হেমিংওয়ের মনে জ্বালার সৃষ্টি করছিল। একদিন হঠাৎ বিখ্যাত প্রকাশক চার্লস স্ক্রিবনার্স সন্স-এর অফিসে ঈস্টম্যানের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কোম্পানীর উপদেষ্টা ম্যাক্সওয়েল পারকিন্স-এর সামনে বসে আছেন ঈস্টম্যান। হেমিংওয়ে ঘরে ঢুকে তাঁর দিকে চেয়েই বলে উঠলেন, এই যে, কুত্তীর বাচ্চা!

ঈস্টম্যান হঠাৎ এমন সম্বোধনে হকচকিয়ে গেলেন। এদিকে হেমিংওয়ে জামা খুলে বুকের কুঞ্চিত কেশদাম দুই হাতের মুষ্টিতে টেনে লম্বা করে ঈস্টম্যানের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, টেনে দেখ—এ পরচুলা, না আসল?

ঈস্টম্যান একটু অপ্রস্তুত হয়ে হেসে বললেন, না না আসল!

আর একটু এগিয়ে এসে হেমিংওয়ে জামার বোতাম এক টানে ছিঁড়ে ফেলে ঈস্টম্যানের বিরলকেশ বক্ষ উন্মুক্ত করে ফেললেন। বুমেরাং-এর মতো তাঁর মন্তব্য তাঁকেই এসে আঘাত করল। মাথা নিচু করে রইলেন ঈস্টম্যান। হেমিংওয়ের অভিযোগ তখনো শেষ হয়নি। 'প্যারিসে ট্যাক্সিতে যেতে যেতে আমার স্ত্রীকে জোর করে চুমো দিতে চেয়েছিলে কেন?'

ঈস্টম্যান তো আকাশ থেকে পড়লেন। 'কখনো না।'

'আলবৎ চেষ্টা করেছিলে, পারোনি তাই রক্ষা। তাছাড়া তুমি লিখেছ আমার পৌরুষ নেই, শক্তি-সামর্থ্য নেই ইত্যাদি। এই সব মিথ্যা প্রচার করে আমার অপমান করেছ। কেন করলে?'

হেমিংওয়ে ঈস্টম্যানকে দু' হাতে জড়িয়ে ধরলেন। ঈস্টম্যান মুক্তির জন্য উঠলেন মরিয়া হয়ে। তার ফলে দু'জনে আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় মিঃ পারকিন্স-এর টেবিলের উপর গড়াগড়ি যেতে লাগলেন। মিঃ পারকিন্স প্রথম বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠে দু'জনকে অনেক কষ্টে ছাড়িয়ে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

যে গারট্রুড স্টেন প্রথম প্যারিস জীবনে হেমিংওয়ের অভিভাবক ছিলেন তাঁকেও

আঘাত করেছেন 'গ্রীন হিলস অব আফ্রিকা'য় । কোনো রকমে বই ছাপিয়ে মহিলার গর্বের শেষ নেই । আত্মপ্রশংসায় ডুবে আছেন । আগে তো উনি ডায়ালগ লিখতে পারতেন না । হেমিংওয়ের লেখা থেকে শিখেছেন । তাতেই যত মুশকিল হয়েছে । যাঁর কাছ থেকে শিখেছেন তাকে ভুলতে চান ।

অথচ প্রথম প্যারিস এসে হেমিংওয়ে স্টেনের পায়ের কাছে বসে থাকতেন, বিনয়ে নত হয়ে বার বার বলতেন, আপনার কাছ থেকেই আমি লিখতে শিখেছি ; আগে তো কিছুই জানতাম না । ...মুখে বলে তৃপ্তি হত না, বাড়ী ফিরে ছোট ছোট চিঠি পাঠাতেন ।

হেমিংওয়ের চরিত্রের একটি দিক সম্বন্ধে কৌতুক অনুভব করতেন শ্রীমতী স্টেন । প্রচণ্ড দৈহিক শক্তির অধিকারী হিসাবে তিনি বক্সিং, ষাঁড়ের লড়াই ইত্যাদিতে অংশ-গ্রহণ করতেন আর তাঁর লেখায় আদিম মানবের শক্তির বিচ্ছুরণ প্রকাশ করতে চাইতেন ।

শ্রীমতী স্টেন জানতেন দৈহিক শক্তির এই দম্ভ অনেকটাই মিথ্যা । একটু বেশী-দূর হাঁটলে, ছুটলে বা পরিশ্রম করলে হেমিংওয়ের হাঁফ ধরে যেত । এই নকল বীরকে তিনি বিদ্রূপ করতেন তাঁর প্রিয় কুকুরকে হেমিংওয়ের পার্ট দিয়ে । ষাঁড়কে উত্তেজিত করবার জন্য তার সামনে লাল রুমাল দেখানো হয় । তেমনি কুকুরের সামনে রুমাল নেড়ে স্টেন বলতেন, হেমিংওয়ে, তোমার আদিম হিংস্রতায় জেগে ওঠ, দেখে সার্থক হই ।

শ্রীমতী স্টেনের এইটে ছিল সন্ধ্যাবেলার প্রিয় খেলা ।

□ প্রথম বই □

প্রদীপ জ্বালাবার আগে সলতে পাকাবার একটা ইতিহাস থাকে। কিন্তু সে ইতিহাস জানবার আগ্রহ কম আমাদের।

লেখকদের আমরা বিচার করি তাঁদের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ ফসল দিয়ে। সবচেয়ে ভালো বইগুলির কথাই আমরা মনে রাখি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রথম বই অথবা প্রথম পর্বের রচনা প্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শন হিসাবে স্বীকৃতি পায় না। অথচ এদের বাদ দিয়ে কোনো লেখক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিচার সম্ভব নয়। প্রথম বই সাহিত্য-প্রতিভার উৎস-স্বরূপ। উৎসের পরিচয় পেলে প্রতিভার প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা করা সহজ হয়।

প্রথম বই থেকে লেখকের সহজাত প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তী রচনায় অভ্যাস ও অধ্যবসায়ের ছাপ পড়ে। প্রথম বইয়ের পটভূমিকার সন্ধান করলে দেখা যায় কত বিচিত্র ঘটনার আবর্তে পড়ে অনেকে সাহিত্যের পথে এসেছেন। আবার দেখা যায়, যাঁর হয়তো ছিল কবি হবার আকাঙ্ক্ষা, নানা কারণে তিনি হয়েছেন ঔপন্যাসিক ; নাট্যকার হিসাবে খ্যাতি লাভের যাঁর বাসনা ছিল, পরবর্তী জীবনে তিনিই হয়তো কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন দেখা যায়। এই শাখা পরিবর্তনের কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ পাওয়া যায় সাহিত্যের ইতিহাসে।

প্রথম বইকে কেন্দ্র করে লেখকের মনে যত আনন্দ-বেদনার সৃষ্টি হয়, পরবর্তী কোনো বইয়ের বেলাতেই তা হয় না। প্রশংসা পেলে আরো ভালো লেখার জন্য উদ্দীপনা পাওয়া যায় ; বিরূপ সমালোচনা নবীন শিল্পীকে যেমন আঘাত দেয় তেমনি কখনো কখনো লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভের সংকল্পও কঠোর করে। নতুন লেখক এঁদের দৃষ্টান্ত থেকে বাধা অতিক্রম করবার শক্তি পেতে পারেন।

লেখকের নিকট তাঁর প্রথম বই প্রথম প্রেমের মতোই অবিস্মরণীয়। পাঠকরা উপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশের নিদর্শন হিসাবে প্রথম রচনাকে লেখক ভুলতে পারেন না। তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য এবং জীবনদর্শনের আভাস প্রথম বইতে পাওয়া যায়। প্রথম বই অনেক লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রথম প্রেম ও প্রথম বইয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগও বিরল নয়।

লেখকদের জীবনী থেকে এসবের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। যখন জীবনী লেখার প্রথা ছিল না, সে যুগের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বাল্মীকি। ক্রৌঞ্চ-দম্পতির দুঃখে বেদনা-বিদ্ধ হয়ে এক সাধারণ মানুষ অকস্মাৎ মহাকবি হলেন।

বেদনা এখনো সাহিত্য-সৃষ্টির প্রধান প্রেরণা। তবে নিছক বন্ধুর প্রতি সহানুভূতির জন্যই প্রথম বই ছাপতে দেবার দৃষ্টান্ত হয়তো বেশী পাওয়া যাবে না। ওয়াল্টার স্কটের জীবন থেকে এর উদাহরণ পাওয়া যায়।

স্কট কবিতা ভালোবাসতেন ছেলেবেলা থেকেই। মাঝে মাঝে দু'একটা কবিতা লিখতেনও। কিন্তু এটা ছিল তাঁর কাছে নিছক বাতিক। লেখক হিসাবে খ্যাতি লাভ করবেন এবং লিখে অর্থ উপার্জন করতে পারবেন এটা ছিল কল্পনারও অতীত। তখন তিনি সেলকার্ক শহরের শেরিফ। সেখানে স্কুলের সহপাঠী জেমস্ ব্যালেণ্টাইন ছাপাখানা খুলেছেন। কিন্তু যথেষ্ট কাজ নেই। স্কট স্থির করলেন বন্ধুকে সাহায্য করতে হবে। তিনি সীমান্ত অঞ্চলের ব্যালাড সংগ্রহ করছিলেন অনেকদিন থেকে। সেগুলি সম্পাদনা করে এক প্রকাশককে দিলেন এই শর্তে যে, বই ছাপাতে হবে ব্যালেণ্টাইনের প্রেসে। বন্ধুকে সহায়তা করবার তাগিদেই স্কটের সম্পাদনায় প্রথম বই 'মিনস্ট্রেলসি অব দি স্কটিশ বর্ডার' প্রকাশিত হলো। এই বই বিশেষ বিক্রি হয়নি।

চৌত্রিশ বছর বয়সে বের হলো তাঁর প্রথম মৌলিক বই 'দি লে অব দি লাস্ট মিনস্ট্রেল' (১৮০৫)। এই গাথা-কাব্য থেকেও পয়সা পাবেন এমন আশা তাঁর ছিল না। জীবনে তাঁর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল আইনজীবী হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করা। কিন্তু এ বই থেকে খ্যাতি ও অর্থ দুই-ই তিনি পেলেন। তাতে তাঁর লেখার আগ্রহ বাড়ল।

কাব্যের সাধনা করলেন মধ্য বয়স পর্যন্ত। ১৮০৫ সালে 'ওয়েভার্লি'র সাতটি পরিচ্ছেদ লিখে বন্ধুকে দেখতে দিলেন। উপন্যাস রচনায় এই তাঁর প্রথম প্রচেষ্টা। নিজের উপরে আস্থা ছিল না। যদি কোনো সম্ভাবনাই না থাকে তাহলে এ পথে অগ্রসর হয়ে লাভ কি? বন্ধু বললেন, কিচ্ছু হয়নি; লেখা পুড়িয়ে ফেল। উপন্যাস লেখা তোমার কোনো কালেই হবে না।

স্কট বন্ধুর উপদেশ মেনে নিলেন। তবে পাণ্ডুলিপি না পুড়িয়ে ফেলে রাখলেন এক কোণে। আট বছর পরে একদিন মাছ ধরবার সরঞ্জাম খুঁজতে গিয়ে হঠাৎ বাজে জিনিসপত্রের মধ্য থেকে আবিষ্কার করলেন সেই অসমাপ্ত উপন্যাসের সাতটি পরিচ্ছেদ। এতদিন পরে নতুন করে পড়ে কিন্তু খারাপ লাগল না। শেরিফের চাকরিতে যথেষ্ট অবসর। অনেকটা যেন অবসর কাটাবার জন্যই তিনি কাহিনী শেষ করলেন এবং তা ছাপাও হল। এটি তাঁর প্রথম উপন্যাস এবং বিখ্যাত ওয়েভার্লি সিরিজের প্রথম বই। কিন্তু বেনামীতে বেরিয়েছিল। উপন্যাস তখনো আজকের মর্যাদা পায়নি। শেরিফের পক্ষে উপন্যাস লেখা সম্মানজনক মনে হয়নি।

ব্যালেণ্টাইনের প্রেস যাতে বড় হয় এবং নিজেও লাভবান হতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে স্কট প্রেসের অংশীদার হয়েছিলেন কিছু টাকা দিয়ে। কিন্তু ব্যালেণ্টাইনের অব্যবস্থার ব্যবসা ফেল পড়ল, দেনা প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা। ব্যালেণ্টাইন দেউলিয়া

নাম লিখিয়ে দেনার দায় থেকে মুক্তি পেল। কিন্তু স্কট এই সহজ পথ গ্রহণ করলেন না। সংকল্প করলেন সকল দেনা তিনি মিটিয়ে দেবেন। কিন্তু টাকা কোথায়? বই বিক্রির টাকা দিয়ে দেনা শোধ করাই একমাত্র উপায়। অবিশ্রান্ত লিখে চললেন তিনি। মৃত্যুশয্যায় শুয়েও মুখে বলে গেছেন, একান্ত সচিব লিখে নিয়েছে। দেনা শোধের ব্যবস্থা তিনি করে গিয়েছিলেন। সুতরাং স্কটের সাহিত্য-জীবনের উপর সহপাঠী ব্যালেন্টাইনের প্রভাব গভীর।

টুর্গেনিভ গদ্য লিখতে আরম্ভ করেন আকস্মিকভাবে। পুশকিন 'সমকালীন' সাহিত্যপত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর টুর্গেনিভের সহায়তা লাভ করে কবি নেক্রাসভ কাগজের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কাগজের নবপর্যায়ের প্রথম সংখ্যায় পাদপূরণ হিসাবে শেষের দিকে টুর্গেনিভের একটি ছোট্ট গদ্য রচনা ছাপা হয়। টুর্গেনিভ কবিতা লিখতেন, গদ্যের দিকে মোটেই ঝোঁক ছিল না। সম্পাদকের অনুরোধে রাশিয়ার অবহেলিত অত্যাচারিত ভূমিদাসদের সম্বন্ধে একটি রেখাচিত্র লিখে দেন। পাঠকেরা এই রচনাটিকে অভিনন্দিত করে। তারপর সম্পাদকের তাগিদে তাঁকে ধারাবাহিকভাবে কতকগুলি লেখা দিতে হয়। এগুলি সংকলন করে ১৮৫২ সালে প্রকাশিত হয় টুর্গেনিভের প্রথম বই, 'এ স্পোর্টস্‌ম্যানস্ স্কেচেস'। ভূমিদাসদের প্রতি লেখকের গভীর সহানুভূতি ফুটে উঠেছে এ বইয়ে।

উদারপন্থীরা বই পড়ে খুশি হলো। রক্ষণশীল সম্প্রদায় এর মধ্যে দেখতে পেল বিপ্লবের পূর্বাভাস। শিক্ষামন্ত্রী সম্রাটকে গোপন চিঠি পাঠিয়ে জানালেন, এ বই পড়ে ছোটরা আর বড়দের সম্মান করবে না। টুর্গেনিভ মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে বলেছিলেন যে, 'এ স্পোর্টসম্যানস্ স্কেচেস' রাশিয়ার ভূমিদাসদের মুক্তি দেবার জন্য যা করেছে সে কথা যেন তাঁর সমাধি ফলকে উৎকীর্ণ করা হয়। সম্রাট আলেকজাণ্ডার তাঁকে বলেছিলেন যে, এ বই পড়ে ভূমিদাসদের মুক্তি দেওয়া সম্বন্ধে তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন।

প্রথম বইয়ের এতবড় প্রভাব বড় দেখা যায় না।

এডগার অ্যালান পো এক অভিনেত্রীর পুত্র। দু'বছর পরে মা'র মৃত্যু হলো। এক ধনী ব্যক্তি তাঁকে পালিত পুত্র হিসাবে গ্রহণ করলেন। যত্ন ও স্নেহের অভাব ছিল না। কিন্তু কল্পনা-প্রবণ কিশোরের কবিমন এই আশ্রয়ের মধ্যে সহানুভূতি খুঁজে পায়নি। শীঘ্রই বিরোধ দেখা দিল। পো বাড়ী ছেড়ে কিছুদিন আশ্রয়হীন হয়ে অনাহারে ঘুরে বেড়ালেন। তারপর বোস্টন শহরে এসে নাম লেখালেন সেনাবাহিনীতে। এই সময়ে (১৮২৭) তাঁর প্রথম বই 'ট্যামারলেন অ্যাণ্ড আদার পোয়েম্‌স' প্রকাশিত হয়। চল্লিশ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকার মধ্যে তৈমুরলঙের কাহিনীটিই উল্লেখযোগ্য। তৈমুরলঙ পৃথিবী জয় করে যখন বাড়ী ফিরল তখন বিরহযাতনা ভোগ করে প্রেয়সীর মৃত্যু হয়েছে। প্রেয়সীকে দেবার জন্যই পৃথিবীর সম্পদ আহরণ করতে সে বেরিয়েছিল। অকস্মাৎ তৈমুরের জীবন শূন্য হয়ে গেল।

এ বইয়ের এক কপিও বিক্রি হয়েছিল কি-না সন্দেহ। কোনো পত্রিকাই বইটিকে সমালোচনার যোগ্য মনে করেনি। শুধু দুটি কাগজে প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়েছিল। পো আধুনিক সাহিত্যে একটি মৌলিক ধারার প্রবর্তন করেছিলেন; বোদলেয়ার প্রমুখ অনেক লেখক তাঁর রচনার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন। প্রথম বইয়ের মধ্যেই তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্যের আভাস পাওয়া যায়।

পো পরিচিত ও প্রত্যক্ষ জগৎ থেকে তাঁর বিষয়বস্তু গ্রহণ করেননি। টলস্টয়ের প্রথম এবং পরবর্তী রচনা বাস্তব জীবনের উপর ভিত্তি করে রচিত। তাঁর সৃষ্ট অনেক চরিত্রের মধ্যেই লেখককে চেনা যায়। প্রথম উপন্যাস 'চাইল্ডহুড' আত্মজীবনীমূলক। এ বই ধারাবাহিক বেরিয়েছিল সাহিত্যপত্র 'সমকালীনে'। তাঁর নাম ছাপা হয়নি; লেখক হিসাবে ছাপা হয়েছিল দু'টি অক্ষর—এল এন। পত্রিকা থেকে তিনি এক পয়সাও পারিশ্রমিক পাননি। রাশিয়ার এক সম্পন্ন পরিবারের ইতিহাস শুরু হয়েছে এই কাহিনীতে এবং 'বয়হুড' ও 'ইয়ুথে' তা প্রসারিত ও সমাপ্ত হয়েছে। নিজের, বাবার এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের কথা নিয়েই এই কাহিনী। কোনো কথাই গোপন করেননি। বাবা এক মহিলাকে ভালোবাসতেন। মহিলাও আকৃষ্ট ছিলেন তাঁর প্রতি, কিন্তু বিয়ে করতে রাজী হননি। কেননা, টলস্টয়ের বাবা তাহলে এক ধনবতী মহিলাকে বিয়ে করে সুখী হতে পারতেন না। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর বাবা আবার তাঁকে বিয়ে করতে চাইলেন। কিন্তু মহিলা সম্মত হলেন না এই আশঙ্কায় যে, তাহলে তাঁদের মধ্যে যে কাব্যময় মধুর সম্পর্ক আছে তা আর থাকবে না। অবশ্য তিনি মাতৃহারা সন্তানদের দায়িত্ব নিয়েছিলেন এবং টলস্টয় তাঁর কাছেই মানুষ হয়েছেন। টলস্টয় তানিয়া চরিত্রের মধ্যে এই মহীয়সী মহিলাকে অমর করে রেখেছেন।

চেকভের ছোটগল্প ও নাটক বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তাঁর প্রথম বই একটি উপন্যাস। এই একটি উপন্যাসই তিনি লিখেছেন। এটি আবার গোয়েন্দা কাহিনী। পরবর্তী রচনার ধারার সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই। 'দি শুটিং পার্টি' হালকা গোয়েন্দা কাহিনী হিসাবে প্রশংসা পেতে পারে। এ বইয়ের জন্য লেখক যে যত্ন ও পরিশ্রম করেছেন, পরবর্তী কোনো বইয়ের জন্য তা করেননি।

'ডিকামেরনের' লেখক বোকাচিওর জন্ম হয় ১৩১৩ খ্রীষ্টাব্দে। জন্মস্থান বোধ হয় প্যারিস। এক ইটালীয়ান বণিকের অবৈধ পুত্র। কিছু লেখাপড়া শেখার পর নেপলসের রাজার সভায় সভাসদ হয়ে এলেন। ভার্জিলের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি একদিন এমন অভিভূত হয়ে পড়লেন যে, কবর ছুঁয়ে শপথ করলেন আমৃত্যু সাহিত্যের সাধনা করবেন, বিশেষ করে কাব্যের সাধনা। আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল এক অভিজাত পরিবারের তরুণী বধূ ফিয়েমেত্তার সঙ্গে পরিচয়। প্রথম পরিচয়েই ফিয়েমেত্তার প্রেমে পড়লেন। নেপলসে এসে তাঁর জীবনের গতি নতুন পথে প্রবাহিত হলো। ভার্জিলের কবর ছুঁয়ে যে শপথ করলেন,

তা পূরণ করবার প্রেরণা পেলেন ফিয়েমেত্তার কাছ থেকে। ফিয়েমেত্তার সঙ্গে গোপনে দেখা করবার ব্যবস্থা হলো। প্রথম দিনেই পরস্ত্রীর কাছে সরাসরি প্রেম নিবেদন করতে বাধল। তাই নিজের মনোভাব ব্যক্ত করবার জন্য কয়েকটি প্রেমের গল্প শোনালেন বোকাচিও। ফিয়েমেত্তা বললেন, গল্পগুলি বেশ। লিখে ফেল না।

বোকাচিও উৎসাহিত হয়ে লিখে ফেললেন। এটি তাঁর প্রথম বই, 'লেবারস্ অব লাভ'। ফিয়েমেত্তার মনের উপরে এ বইয়ের প্রভাব কতটা হয়েছিল তা জানা যায়নি। কারণ ফিয়েমেত্তা এরপরে বেশীদিন জীবিত ছিলেন না।

আঁদ্রে জিদও তাঁর প্রথম বই দিয়ে ভালোবাসার পাত্রীকে জয় করবেন ভেবেছিলেন। স্কুলে তাঁর সহপাঠী ছিলেন পিয়ের লুই। তাঁর কাছ থেকেই প্রথম লেখার প্রেরণা পেয়েছিলেন। দূর সম্পর্কের বোন মাদলিনের প্রেমে পড়লেন। জিদ নিজের মনের কথা লিখে বেনামে প্রকাশ করলেন ১৮৯১ সালে। বইটির নাম 'দি নোটবুকস অব আঁদ্রে ওয়াল্টার'। মাদলিন ও তার অভিভাবকরা এ বইয়ের দর্পণে তাঁর মনের পরিচয় পাবে, এই ছিল তাঁর আশা। জিদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। চার বছর পরে মাদলিনকে বিয়ে করে ঘরে এনেছিলেন। তার পূর্বে অবশ্য অন্য একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল। এই বইয়ের জন্য প্রশংসা পেয়েছিলেন মেটারলিংক এবং অন্যান্য অনেক লেখকের কাছ থেকে। প্রথম বই তাঁকে সাহিত্য জগতে প্রবেশের অধিকার করে দিয়েছিল। তাঁর পরবর্তী রচনার বৈশিষ্ট্য এ বইয়ের মধ্যে উপলব্ধি করা যায়।

ডি এইচ লরেন্স সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন কবি হিসাবে। এক মহিলার উদ্যোগে ১৯০৯ সালে তাঁর কয়েকটি কবিতা ছাপা হয় 'ইংলিশ রিভিয়ু' কাগজে। এর দু'বছর পরে তাঁর প্রথম বইয়ের পাণ্ডুলিপি এক প্রকাশক গ্রহণ করে। লরেন্সের ভাগ্য ভালো ; তাঁকে প্রথম উপন্যাস 'হোয়াইট পীককের' পাণ্ডুলিপি নিয়ে ঘুরতে হয়নি। ফ্রান্সিস বেট ইয়ং এই বই সম্বন্ধে বলেছেন যে, পঞ্চাশ বছরের মধ্যে কোনো লেখকের প্রথম উপন্যাস 'হোয়াইট পীককের' মতো আশ্চর্য সাফল্য লাভ করেনি।

বাইশ বছরের তরুণ সমারসেট মম উপন্যাস লেখার কথা কখনো কল্পনাও করেননি। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল নাট্যকার হবার। কিন্তু কোনো থিয়েটারেই তাঁর নাটকের পাণ্ডুলিপি গৃহীত হলো না। বারবার ব্যর্থ হয়ে তাঁর মনে হলো যে, কয়েকটি উপন্যাস লিখে জনপ্রিয়তা লাভ করলে তাঁর নাটক সমাদর লাভ করবে। প্রকাশক ফিশার আনউইন ছোট উপন্যাসের একটি সিরিজ প্রকাশ করছিল। এই সিরিজের লেখকদের আসল নাম ছাপা হত না, থাকত ছদ্মনাম। তাই সিরিজটির নাম ছিল 'ছদ্মনামা'। মম দুটি বড় গল্প লিখে এই সিরিজে ছাপাবার জন্য পাঠালেন। ফেরত এলো। প্রকাশক জানাল, উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পাঠালে বিচার করে দেখা হবে। চিঠি পাবার দশ মিনিটের মধ্যেই মম উপন্যাস লিখতে বসলেন। ডাক্তারী

পড়বার সময় হাতে-কলমে কাজ শেখবার জন্য তিনি ল্যাম্বেথ বস্তীতে ছিলেন তিন সপ্তাহ। ঐ সময়ের মধ্যে তাঁকে তেষট্টিটি প্রসবের তত্ত্বাবধান করতে হয়েছিল। এই অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি লিখলেন প্রথম বই 'লিজা অব ল্যাম্বেথ'। এই উপন্যাসে কল্পনার ভাগ কম; প্রায় সবটাই প্রকৃত তথ্যের উপর ভিত্তি করে লেখা। প্রকাশক পাণ্ডুলিপি গ্রহণ করল। বই প্রথম ছাপিয়ে বের হলো ১৮৯৭ সালে। লেখকের নাম বইয়ে ছাপা হয়নি।

প্রথম বই বের হবার পর পরিচিত মহলে মমের বেশ নাম হলো। এর ফলে পরীক্ষার ফল না বেরুতেই তিনি চাকরি পেলেন। কিন্তু চাকরি নিলেন না। সংকল্প স্থির হয়ে গেছে। চাকরি করবেন না, লিখবেন। প্রথমে টাকার অভাবে খুব কষ্ট পেতে হয়েছে। 'লিজা অব ল্যাম্বেথ' থেকে পেয়েছিলেন মাত্র পাঁচশ টাকা।

টমাস হার্ডির উপন্যাস লেখার কল্পনা কোনোদিনই ছিল না। ছেলেবেলায় মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াতেন আর কবিতা লিখতেন। কাগজের অফিসে পাঠান, কিন্তু ছাপা হয় না, ফেরত আসে। পড়া শেষ করে লণ্ডনের এক স্থপতির দপ্তরে কাজে যোগ দিলেন। এখানে আলাপ হলো এম্মা গিফোর্ডের সঙ্গে। কিছুদিন পরে হার্ডি তাঁকে বিয়ে করলেন। অত্যন্ত ব্যক্তিত্বশালিনী মহিলা—হার্ডির বিপরীত। হার্ডি ছিলেন নিরীহ গোবেচারা প্রকৃতির। জন্মের পরে ডাক্তার তাঁকে মৃত মনে করেছিল। সত্যি বেঁচে আছেন কিনা দেখবার জন্য ধাই এক চড় মেরেছিল। চড় খেয়ে তাঁর জীবন ফিরে আসে। এবং সে জীবন টিকে ছিল নব্বই বছর। স্ত্রী যখন নির্দেশ দিলেন কবিতা ছেড়ে গদ্য লিখতে, তখন হার্ডি প্রতিবাদ করতে পারলেন না। একটু অনিচ্ছার সঙ্গেই উপন্যাস লিখতে শুরু করলেন। প্রথম বই 'ডেসপারেট রেমিডিস' বের হলো ১৮৭১ সালে। এই উপন্যাসটি অনেকটা আত্মজীবনীমূলক।

গলসওয়ার্দি'ও লিখতে আরম্ভ করেছিলেন প্রণয়িনীর উৎসাহে। তখনো তাঁদের বিয়ে হয়নি। অ্যাডা ও তার মাকে প্যারিস স্টেশনে গাড়িতে তুলে দিতে এসেছেন। গাড়ি ছাড়তে কিছু দেরি আছে। দু'জনে রেলওয়ে বুক স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। হঠাৎ সুসজ্জিত বইয়ের দিকে চোখ রেখে অ্যাডা বলল, তুমি লেখ না কেন? লেখক হবার মতো সব গুণই তো রয়েছে তোমার মধ্যে।

গলসওয়ার্দি উৎসাহিত হয়ে লণ্ডনে ফিরে এসেই গল্প লিখতে শুরু করলেন। প্রথম গল্প 'ডিক ডেনভার্স আইডিয়া' শেষ করে অ্যাডাকে পড়ে শোনালেন। অ্যাডার খুব ভালো লাগল। কিছুদিন পরে দশটি গল্পের সংগ্রহ 'ফ্রম দি ফোর উইন্ডস' নামে প্রকাশিত হলো (১৮৯৭)। প্রথম বইয়ে গলসওয়ার্দি জন সিনজন এই ছদ্মনাম ব্যবহার করেছিলেন। বই ছাপার সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করতে হয়েছিল লেখককে। ভালো সমালোচনা হওয়া সত্ত্বেও পঁচিশ বছর পরেও এ বইয়ের কুড়ি কপি অবিক্রীত ছিল।

প্রথম বই দিয়েই প্রতিষ্ঠা লাভ করা এবং সেই বই বিশ্বসাহিত্যে স্থান লাভ করবার মতো দৃষ্টান্ত বিরল। 'মাদাম বোভারি' তার অন্যতম উদাহরণ। গুস্তাভ ফ্লোবেয়ারের এটি প্রথম রচনা না হলেও 'মাদাম বোভারি' তাঁর প্রথম মুদ্রিত বই। দীর্ঘ ছ'বছর ধরে একটু একটু করে লিখেছেন। মাসে গড়ে তেরো পাতার বেশী লেখা হত না। ১৮৫৭ সালে 'প্যারিস রিভিয়্যু'তে ধারাবাহিকভাবে 'মাদাম বোভারি' প্রকাশিত হতে থাকে। সরকার এ বইয়ে অশ্লীলতার সন্ধান পেয়ে লেখকের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য মুক্তি পেয়েছিলেন। 'মাদাম বোভারি' উপন্যাসের ইতিহাসে একটি নতুন বাঁক সৃষ্টি করেছে। এমন স্টাইল, জীবনঘনিষ্ঠ কাহিনী এবং নারীহৃদয়ের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ পূর্বে দেখা যায়নি। এই উপন্যাস পরবর্তী বহু লেখকের রচনারীতির উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। ফ্লোবেয়ার নিজে মনে করতেন তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা 'টেম্পটেসান অব সেণ্ট অ্যান্থনি'। কিন্তু প্রথম বই 'মাদাম বোভারি'ই তাঁকে অবিস্মরণীয় করে রেখেছে।

প্রথম বই দিয়ে খ্যাতিলাভ করবার আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় থিওডোর ড্রেইজারের সাহিত্য-সাধনার ইতিহাস থেকে। ড্রেইজার সাংবাদিক হিসাবে জীবন আরম্ভ করেন। একদিন অকস্মাৎ আর্থার হেনরি প্রস্তাব করল উপন্যাস লেখার। ড্রেইজার সঙ্গে সঙ্গে একটুকরো কাগজের উপরে লিখলেন, 'সিস্টার কেরি'। তাঁর প্রথম বইয়ের নাম এমনি করে অকস্মাৎ স্থির হয়ে গেল। লেখা চলতে লাগল থেমে থেমে। আত্মবিশ্বাস নেই; নগদ পয়সার প্রয়োজনে প্রায়ই উপন্যাস বন্ধ রেখে কাগজের জন্য প্রবন্ধ লিখতে হয়। তবু কাহিনী একদিন শেষ হলো। হার্পার কোম্পানী পাণ্ডুলিপি ফেরত দিল। ফ্র্যাঙ্ক নরিসের সুপারিশে ডাবলডে উপন্যাসটি ছাপতে সম্মত হলো। প্রুফ দেখে প্রকাশকের স্ত্রী বলল, এ বই কিছুতেই প্রকাশ করা চলতে পারে না, কারণ বইটি অশ্লীল। প্রকাশকও তা স্বীকার করল। কিন্তু চুক্তিপত্র হয়ে গেছে। চুক্তিভঙ্গের দায়ে না পড়তে হয় এজন্য অল্প কিছু বই ছাপাল এবং তা বিক্রি করবার জন্য কোনো চেষ্টাই করল না। সুতরাং প্রথম সংস্করণের প্রচার হলো না। সেন্সরের রোষদৃষ্টি পড়েছিল এ বইয়ের উপরে। তার ফলে পাঠক-মহলে আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল।

'সিস্টার কেরি' এক গ্রাম্য তরুণীর অভিশপ্ত নাগরিক জীবনের কাহিনী। *ড্রেইজারের বাল্যজীবন কেটেছে কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে। রেললাইনের পাশে কয়লা* কুড়িয়ে, বাড়ী বাড়ী ধোবার কাপড় বিলি করে কিছু উপার্জন করতে হত তাঁকে। খালি পায়ে ক্লাশে গিয়েছিলেন বলে স্কুল থেকে তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি এই দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে জীবনের পথে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর দুই বোন সমৃদ্ধ জীবনের প্রলোভনে বাড়ী ছেড়ে এসেছিল শহরে। নগর তাদের জীবনের সবটুকু রস নিংড়ে ছিবড়ের মতো দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। বোনদের জীবনের এই ট্র্যাজেডি 'সিস্টার কেরি'তে রূপায়িত হয়েছে। অনেক

সমালোচকের মতে এই প্রথম রচনা তাঁর শ্রেষ্ঠ বই।

ডিকেন্সও সাংবাদিক হিসাবে সাহিত্য-জীবন শুরু করেছিলেন। সমকালীন জীবন সম্পর্কিত কতকগুলি রেখাচিত্র বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর ডিকেন্স সাহিত্য জগতে পরিচিতি লাভ করেন। এই রেখাচিত্রগুলি সংকলন করে দুই খণ্ডে 'স্কেচেস অব বজ' নাম দিয়ে প্রকাশিত হয় ১৮৩৬-৩৭ সালে। ডিকেন্সের বয়স তখন চব্বিশ বছর। প্রথম বইয়ের এমন অভ্যর্থনা বড় কম হয়। যদিও রচনার মান খুব উন্নত ছিল না, তথাপি সমালোচনা খুব ভালো হলো। সাংবাদিক মহলে জনপ্রিয় ছিলেন বলেই হয়তো এটা সম্ভব হয়েছে। বই থেকে বেশ আয় হলো। প্রথম বইয়ের এরূপ সমাদর না হলে হয়তো 'পিকউইক পেপার' লিখতে উৎসাহ পেতেন না। পারিবারিক জীবনেও শান্তি পেলেন। পাত্রী ঠিক ছিল। কিন্তু বিয়ে করতে ভরসা পাচ্ছিলেন না আর্থিক অনিশ্চয়তার জন্য। 'স্কেচেস অব বজ' থেকে নিশ্চয়তার আভাস পেয়ে অল্পদিনের মধ্যেই বিয়ে করলেন।

কবি শেলির প্রথম বই 'দি নেসেসিটি অব অ্যাথিজম' তাঁর সাহিত্য-জীবনকে না হোক, ব্যক্তিগত জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। গডউইনের 'পলিটিক্যাল জাস্টিস' এবং ফরাসী সংশয়বাদীদের মতামত পাঠ করে নাস্তিক্যবাদের প্রতি তাঁর মন ঝুঁকেছিল। 'দি নেসেসিটি অব অ্যাথিজম' নামক পুস্তিকায় নাস্তিক্যবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। খ্রীষ্টানদের নিকট নাস্তিক্যবাদ নিয়ে মাথা ঘামানো পাপ। তাই এ বই লেখার জন্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁর কৈফিয়ত তলব করলেন এবং তাঁকে ও বন্ধু হগকে বিতাড়িত করা হলো কলেজ থেকে। শেলির পিতা ক্রুদ্ধ হলেন; তাঁর ধারণা হলো হগই ছেলেকে বিপথে নিয়েছে। পুত্রকে আদেশ করলেন, হগের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করতে। শেলি সম্মত হলেন না বন্ধুকে ছাড়তে। সুতরাং পিতার আদেশে তাঁকে বাড়ী ত্যাগ করতে হলো। নিঃস্ব অবস্থায় শেলির নতুন জীবন শুরু হলো। দারিদ্র্য এবং পিতার কঠোরতর অভিজ্ঞতাই তাঁর মনে স্বাধীনতার আদর্শ উদ্দীপ্ত করেছে। প্রথম বই প্রকাশ করে যে আঘাত পেয়েছেন তার দ্বারাই তাঁর জীবনের পথ নির্ধারিত হয়েছে।

শার্লট, এমিলি এবং অ্যান ব্রন্টি ঔপন্যাসিক হিসাবে ইংরেজী সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। কিন্তু তাঁদের প্রথম আকাঙ্ক্ষা ছিল কবি হিসাবে খ্যাতিলাভ করবার। তিনজনেই গোপনে গোপনে কবিতা লিখতেন। এমিলির গোপনতা ছিল সবচেয়ে বেশী। তাঁর লেখা বোনরাও কখনো দেখতে পায়নি। শার্লট হঠাৎ একদিন এমিলির কবিতার খাতা আবিষ্কার করে পড়ে ফেললেন। চমৎকার লেখা। তিন বোনের যে পৃথক পৃথক কবিতার বই শীগ্‌গীর বেরুবে এমন আশা নেই। সুতরাং স্থির হল তিনজনের লেখা থেকে নির্বাচন করে একটি কবিতার বই ছাপা হবে। অখ্যাত নতুন লেখকের বইয়ের প্রকাশক পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত নিজেদের খরচায় বই ছাপার ব্যবস্থা হলো। বই বের হলো ১৮৪৬ সালের মে মাসে। লেখিকাদের সম্বন্ধে

পাঠক ও সমালোচকদের বিশেষ ভালো ধারণা থাকে না বলে তাঁরা পুরুষের ছদ্মনাম গ্রহণ করলেন। তিন বোনের নাম বইয়ে ছাপা হলো যথাক্রমে কুরার, এলিস ও অ্যাকটন বেল। পুরুষের নাম নিয়েও 'পোয়েমস' বিক্রি হলো না। একবছরে মাত্র দু'কপি বই বিক্রি হয়েছিল। সমালোচনা ছাপা হয়েছিল তিনটি কাগজে। সমালোচকরা কবি হিসাবে এমিলির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। অবিক্রীত বইগুলি কিছু গেল পুরনো কাগজের দোকানে আর কিছু বিতরণ করা হলো লেখকদের মধ্যে।

কবিতার বই ব্যর্থ হওয়ায় তিন বোনই উপন্যাস লিখে ভাগ্য পরীক্ষার সিদ্ধান্ত করলেন। এ পরীক্ষায় তাঁরা সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

প্রথম বই নোবেল পুরস্কার পেয়েছে এমন দৃষ্টান্তও আছে; সুতরাং প্রথম রচনা যে কাঁচা হবে এমন কথা বলা যায় না। সেলমা লাগেরলফের প্রথম উপন্যাস 'গোস্তা বার্লিংস্ সাগা' বিশ্বসাহিত্যের একটি প্রথম শ্রেণীর বই। এ বইয়ের জন্য তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে ১৯০৯ সালে। মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথম নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

টমাস মান লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন প্রথম উপন্যাস 'বুডেন ব্রুকস্' (১৯১১) লিখে। এক সম্পন্ন জর্মান বণিক পরিবারের ভাঙনের ইতিহাস কেন্দ্র করে কাহিনী রচিত। মান-পরিবারের ক্রমাবনতির ইতিহাসকে ভিত্তি করেই লেখা হয়েছে। 'বুডেন ব্রুকস্' অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল প্রকাশের পরেই। হিটলার মানের বই বাজেয়াপ্ত করবার পূর্ব পর্যন্ত একমাত্র জার্মানীতে 'বুডেন ব্রুকস্' বিক্রি হয়েছে পনেরো লক্ষ কপিরও বেশী।

এরিখ মারিয়া রেমার্কের প্রথম বই 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রণ্ট' সাহিত্য জগতে আলোড়ন এনেছিল। এ বইয়ের রচনা-কৌশলে মৌলিকত্ব ছিল না, কিন্তু লেখক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে যুদ্ধের ভয়াবহতা এমন মর্মস্পর্শীরূপে তুলে ধরেছেন যে, য়ুরোপের যুদ্ধপীড়িত জনসাধারণের চিত্তে তা সঙ্গে সঙ্গে সাড়া জাগাল। 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রণ্ট'-এর মতো বই সাফল্যলাভ করবার উপযুক্ত পরিবেশ তখন ছিল। সময়ের সহায়তা না পেলে এতটা খ্যাতিলাভ করা সম্ভব হত না। একমাত্র জার্মানীতেই এ বই বিক্রি হয়েছে দশ লক্ষ কপি।

মধুসূদনের প্রথম বাংলা বই লেখার কাহিনী বিচিত্র। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় হবে। ইংরেজ দর্শকরা যাতে অভিনয়ের মর্মগ্রহণ করতে পারে সেজন্য নাটকটি অনুবাদের ভার দেওয়া হলো মধুসূদনের উপর। মধুসূদনের অনুবাদ উচ্চাঙ্গের হয়েছিল। 'রত্নাবলী'র রিহার্সালের সময় মধুসূদন মাঝে মাঝে উপস্থিত থাকতেন। একদিন তিনি মন্তব্য করলেন, নাটকটি খুব ভালো নয়। বন্ধুরা বললেন, বাংলায় এর চেয়ে ভালো নাটক কোথায়? থাকলে সেই নাটকেরই অভিনয় করতাম।

মধুসূদন তৎক্ষণাৎ বললেন, আমি ভালো নাটক লিখে দেব। বন্ধুরা তখন এ-কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেননি। মধুসূদন কিন্তু পরিহাস করেননি। তিনি সকল সংস্কৃত ও বাংলা নাটক পড়ে ফেললেন। অল্পদিনের মধ্যেই শেষ হলো তাঁর 'শর্মিষ্ঠা' নাটক। ১৮৫৯ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হলো। ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায় মধুসূদনের সাফল্যে উল্লসিত হলেন। 'শর্মিষ্ঠা' আধুনিক বাংলা নাটকের অগ্রদূত। কিন্তু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতরা রায় দিলেন, এ নাটক কিছুই হয়নি। কারণ মধুসূদন সংস্কৃত নাটকের রীতি অন্ধভাবে অনুসরণ করেননি। বাংলা নাট্য-সাহিত্যে যে নতুন ধারার তিনি সৃষ্টি করলেন, প্রাচীনপন্থীরা তা প্রথমে মেনে নিতে পারেননি।

এমনি এক ঝোঁকের মাথায় মধুসূদন তাঁর প্রথম বই রচনা করেছিলেন।......

দীনবন্ধু মিত্র তাঁর প্রথম বই 'নীলদর্পণের' জন্য চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। 'নীলদর্পণ' অপেক্ষা অধিকতর সাহিত্যগুণ-সম্পন্ন গ্রন্থ দীনবন্ধু লিখেছেন। কিন্তু 'নীলদর্পণের' মতো নাটকের জন্য দেশ তখন অপেক্ষা করছিল। তাই বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই এ-নাটক জনচিত্তে আসন লাভ করল। বইয়ে লেখকের নাম ছিল না। নামপত্রে ছিল—'নীলকর-বিষধর-দংশন কাতর-প্রজানিকর ক্ষেমঙ্করেণ কেনচিৎ পথিকেনাভি প্রণীতং।' দীনবন্ধুই যে লেখক, সে কথা প্রচার হতে অবশ্য বেশী দেরি হয়নি। 'নীলদর্পণ' দেশে এবং বিদেশে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, আর কোনো বাংলা বইয়ের বেলায় তা হয়নি।

বঙ্কিমচন্দ্র এখন ঔপন্যাসিক হিসাবেই পরিচিত। কিন্তু তাঁর সাহিত্য-জীবন শুরু হয়েছিল কবি হিসাবে। পনেরো বৎসর বয়সে তিনি রচনা করেন 'ললিতা'। পুরাকালিক গল্প। তথা মানস। এ-বই ছাপা হয় ১৮৫৬ সালে। ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব সুস্পষ্ট। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সেদিন দাবি করেছিলেন যে, তিনি নতুন কাব্যরীতির প্রবর্তন করেছেন। ভূমিকায় তিনি বলেছেন: 'সুকাব্যালোচক মাত্রেরই তাঁর কবিতাদ্বয় পাঠে প্রতীতি জন্মিবেক যে ইহা বঙ্গীয় কাব্য রচনা রীতি পরিবর্তনের এক পরীক্ষা বলা যায়। তাহাতে গ্রন্থকার কতদূর উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহা পাঠক মহাশয়েরা বিচার করিবেন।' 'কতিপয় সুরসজ্ঞ বন্ধুর' অনুরোধে এ বই তিনি প্রকাশ করেন।

এই শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন না। তিনি বঙ্কিমকে উপদেশ দিয়েছিলেন পদ্য ত্যাগ করে গদ্য লেখার। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' বাংলা সাহিত্যে যুগান্তর সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু পাণ্ডুলিপি দুই দাদা শ্যামাচরণ ও সঞ্জীব পড়ে বাতিল করে দেন। তাঁদের মনে হয়েছিল এ-বই ছাপার অযোগ্য। বঙ্কিম লেখা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিছুদিন পরে সঞ্জীবচন্দ্র কি মনে করে নিজের উদ্যোগে 'দুর্গেশনন্দিনী' ছাপালেন। 'দুর্গেশনন্দিনী' যে সমাদর লাভ করল তা ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের স্বপ্নের অতীত। এ থেকেই পেয়েছেন ভবিষ্যৎ রচনার প্রেরণা।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম বই 'কবি-কাহিনী' প্রকাশিত হয় ১৮৭৮ সালে। কবির বয়স তখন মাত্র সতেরো। এই গাথা-কাব্যটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'ভারতী' পত্রিকায়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, হঠাৎ ছাপা বই হাতে পেয়ে তিনি বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন। আগে বই ছাপানোর কথা তিনি কিছুই জানতেন না। বন্ধু প্রবোধচন্দ্র ঘোষ বই ছাপিয়ে তাঁকে চমকিত করে দিয়েছিলেন। প্রবোধচন্দ্র 'কবি-কাহিনী'র প্রকাশকও। রবীন্দ্রনাথ ১৮৭৮ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর বিলাত যাত্রা করেন। 'কবি-কাহিনী' প্রকাশিত হয় ৫ নভেম্বর। পরবর্তী জীবনে রবীন্দ্রনাথ প্রথম বই সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্য করেছেন। কিন্তু তখনকার দিনের বিখ্যাত সমালোচক কালীপ্রসন্ন ঘোষ 'বান্ধব' পত্রিকায় এ বইয়ের লেখককে স্বাগত জানিয়েছিলেন। প্রকাশককে অবশ্য ভুগতে হয়েছে। কারণ, 'কবি-কাহিনী' বিক্রি হয়নি এবং নতুন সংস্করণ ছাপবার কথাও কবির মনে হয়নি।

শরৎচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত রচনা 'মন্দির' নামে একটি গল্প। ব্রহ্মদেশে যাবার আগে এই গল্পটি তিনি দূর-সম্পর্কীয় মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে কুন্তলীন পুরস্কার প্রতিযোগিতার জন্য পাঠান। প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে পঁচিশ টাকা পুরস্কার পান। এটি কুন্তলীন পুরস্কার গ্রন্থে প্রকাশিত হয় ১৩১০ সালে। এরপরে ১৩১৪ সালে 'ভারতী'তে কয়েক কিস্তিতে তাঁর 'বড়দিদি' প্রকাশিত হয়। শরৎচন্দ্র এর কিছুই জানতেন না। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছ থেকে 'বড়দিদি'র পাণ্ডুলিপি এনে লেখকের অনুমতি না নিয়েই ছাপিয়ে দিলেন।

প্রথম দু' কিস্তিতে লেখকের নাম ছিল না। তার ফলে অনেকে মনে করেছিলেন এ লেখা রবীন্দ্রনাথের। তখন নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শনের' সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ। কর্মাধ্যক্ষ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার এসে রবীন্দ্রনাথকে অভিযোগ করলেন, আপনার নিজের কাগজ থাকতে 'ভারতী'তে উপন্যাস দিয়েছেন—এটা কি কথা! রবীন্দ্রনাথ অভিযোগ শুনে তো অবাক। নামহীন রচনাটি পড়ে তিনি বুঝিয়ে বললেন, লেখা তাঁর নয়; তবে অজ্ঞাতপরিচয় লেখক যে শক্তিশালী—তাতে সন্দেহ নেই।

শরৎচন্দ্রের প্রথম বই 'বড়দিদি' প্রকাশ করেন 'যমুনা'-সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল। এই উপন্যাস যে অভ্যর্থনা পেল তা শরৎচন্দ্রকে নিয়মিত লেখার প্রেরণা দিল।

কয়েকজন লেখকের প্রথম বই সম্বন্ধে বলা হলো। প্রত্যেক লেখকের প্রথম বইয়ের একটি কৌতূহলোদ্দীপক ইতিহাস আছে। সকলের ইতিহাস হয়তো জানা যায় না। প্রথম বই লেখকের মনের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে, পরবর্তী বহুগুণে উন্নতমান বই তা পারে না। সমারসেট মম পরিণত বয়সে বলেছেন, 'এখন একটা বই বের হলে কত ভালো সমালোচনা, কত অর্থ, বন্ধুদের কত অযাচিত প্রশংসা পাওয়া যায়। কিন্তু প্রথম বই হাতে পাবার রোমাঞ্চ আর অনুভব করি না।'

☐ আসল ও নকল ☐

বাস্তববাদী নাটক-উপন্যাসের যুগ শুরু হবার পর থেকে উপন্যাসের কাহিনী ও পাত্র-পাত্রীদের নিছক কল্পনাপ্রসূত বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। রোমান্টিক নভেল কিংবা 'ডন কুইক্সোটের' মতো উদ্ভট কাহিনীকে বাস্তবঘনিষ্ঠ নয় বলে উপেক্ষা করা যেতে পারে। প্লেটো কাব্য-নাটক-উপন্যাস প্রভৃতি কল্পনামূলক রচনাকে 'অলীক' বলে অভিহিত করেছেন। প্লেটোর এই বিচারে একটা বড় ভুল ছিল। শিল্পকর্মের সত্য আর ইতিহাস ও বিজ্ঞানের সত্য এক নয়। শিল্প যদি একমাত্র ঘটনানির্ভর ও বস্তুনির্ভর সত্য অবলম্বন করতে চায় তাহলে তার মৌলিক ধর্ম হারিয়ে যাবে। সত্যকে শিল্পমণ্ডিত করবার জন্য বাস্তবের অনেক কিছু বাদ দিতে হয় এবং কিছু যোগও করতে হয়। শিল্পী ও সাহিত্যিক আজকের সত্যকে চিরকালের সত্যে পরিণত করেন। এই প্রসঙ্গে গ্যেটে বলেছেন, 'The artist's work is real in so far as it is always true ; ideal, in that it is never actual.'

নাটক ও উপন্যাসে চরিত্র এবং পরিবেশ সৃষ্টিতে বাস্তবতা এসেছে। এই বাস্তবতার অর্থ এ নয় যে, প্রকৃত নর-নারী ও পরিবেশ কাহিনীর মধ্যে আনা চাই। হয়তো দশজন লোক দেখে তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করে তা দিয়ে একটি চরিত্র সৃষ্টি করা হয়। বিভিন্ন নর-নারী সম্বন্ধে সঞ্চিত টুকরো অভিজ্ঞতা লেখকের মনে মিলিত হয়ে একটি নতুন চরিত্র জন্মলাভ করে। কেমন করে যে করে তার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার সাহায্যে একটি সম্পূর্ণ জীবন্ত চরিত্র সৃষ্টি করবার দুর্লভ ক্ষমতা আছে লেখকের। পরিবেশ সৃষ্টি সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য।

রোমান্টিক যুগ শেষ হবার পর পাঠকরা নাটক ও উপন্যাসের অনেক চরিত্রকে চিনে ফেলল। এসব চরিত্র প্রধানত কোনো প্রকৃত ব্যক্তির জীবনের উপরে ভিত্তি করে রচিত। তাই নাম ভিন্ন থাকলেও এদের চিনতে কষ্ট হয় না। কিন্তু উপন্যাস ও নাটকে বাস্তব জীবন থেকে যত চরিত্র নেওয়া হয় তাদের প্রত্যেককেই চেনা যায় না। যে সব চরিত্র রাজনৈতিক, সামাজিক বা অন্য কোনো কারণে বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে, শুধু তাদেরই চেনা সম্ভব। লেখক সহযোগিতা করলে অন্যদেরও চেনা যায়। কিন্তু সাধারণ চরিত্রগুলি শিল্প হিসাবে যতই সার্থক হোক তাদের বাস্তব জীবনের পরিচয় লাভের জন্য পাঠকের আগ্রহ থাকে না। বাস্তব জীবনে যারা কোনো কারণে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, নাটকে-উপন্যাসে তাদের দেখতে পেলে আমরা লেখকের সৃষ্ট চরিত্রের সঙ্গে প্রকৃত মানুষটির যোগাযোগ স্থাপনের জন্য ব্যগ্র হই।

মোপাসাঁ 'চর্বির তাল' গল্পটি লিখে রাতারাতি লেখক হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। জোলা এবং আরও কয়েকজন লেখক স্থির করেছিলেন বাস্তব জীবনের উপর ভিত্তি করে তাঁরা প্রত্যেকে গল্প লিখে একটি সংকলন প্রকাশ করবেন। এই সংকলনের শ্রেষ্ঠ গল্প হয়েছিল মোপাসাঁর 'চর্বির তাল'। যে বারবনিতার করুণ কাহিনী কেন্দ্র করে এমন বাস্তব কাহিনী রচিত হয়েছে, মোপাসাঁ তাঁকে কখনো চোখেও দেখেননি। প্রাশিয়ান যুদ্ধের সময়কার এই কাহিনী তিনি শুনেছিলেন তাঁর এক আত্মীয়ের মুখ থেকে। সেই বারবনিতা হারিয়ে গেছে; তাকে খুঁজে বার করবার কৌতূহল কারো হয়নি; কেন না, তার বাস্তব জীবন সম্বন্ধে আমাদের কোনো আগ্রহ নেই। মোপাসাঁর গল্পে সে অমর হয়েছে; গল্পের মধ্যে তাকে পেয়েই আমরা সন্তুষ্ট, গল্পের বাইরে তার রূপ কি—তা দেখতে চাই না।

জোলার 'জার্মিনাল' একটি প্রথম শ্রেণীর বাস্তবনিষ্ঠ উপন্যাস। জোলা কয়লা-খনিতে গিয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। তাঁর পাত্র-পাত্রীরা সেখানকার জীবন থেকে নেওয়া। কিন্তু সেই জীবন্ত চরিত্রগুলির মূল অনুসন্ধানের জন্য আমরা মোটেই আগ্রহান্বিত নই। কারণ সাধারণ শ্রমিক জীবনে এমন কোনো বৈশিষ্ট্য নেই যা আমাদের মনে কৌতূহল সৃষ্টি করতে পারে। লেখকের শিল্পকলা তাদের সামান্য জীবনকে অসামান্য করেছে। সুতরাং শিল্পের আবরণ থেকে বিচ্যুত করলে তাদের বাস্তব জীবনে আকর্ষণীয় কিছুই থাকে না।

সাহিত্যে বাস্তবতার ধারা প্রবর্তিত হবার পর প্রত্যক্ষ জীবন থেকে রচনার উপাদান সংগ্রহ করা স্বাভাবিক হয়ে পড়ল। সংসারে এমন অনেক নর-নারীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যাদের নাম বদল করে উপন্যাসে সহজেই স্থান দেওয়া যেতে পারে। একেবারে তৈরী চরিত্র। অনেক বিখ্যাত লেখক তাঁদের নাটক ও উপন্যাসের কোনো কোনো চরিত্র এইরূপ জীবন থেকে নিয়েছেন। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য অথবা ব্যঙ্গের উদ্দেশ্যে লেখকরা একটি বাস্তব জীবনকে গ্রহণ করতে লুব্ধ হন। লেখকের শিল্পসম্মত পরিবর্তন সত্ত্বেও একে চেনা যায়। অবশ্য এরূপ চরিত্রের সংখ্যা কম। অধিকাংশ চরিত্রই লেখকের ক্রমচয়িত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মিশ্রণ।

ফীলডিং ও রিচার্ডসন তাঁদের বিভিন্ন উপন্যাসে সমকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের চরিত্র এঁকেছেন। টমাস লাভ পীকক 'নাইটমেয়ার অ্যাবি'-তে শেলিকে বিদ্রূপ করেছেন স্কাইথ্রপ চরিত্রের অন্তরালে। পীকক ছিলেন শেলির বন্ধু; তাঁর ভয় ছিল—শেলি বই পড়ে রাগ করেছেন। শেলি কিন্তু একে পরিহাস হিসাবেই গ্রহণ করেছেন সহজ ভাবে।

ভিক্টোরিয়ান যুগে বায়রন ছিলেন বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। সাহিত্যের সঙ্গে যাদের যোগ ছিল না তারাও বায়রনের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে উৎসুক ছিল। তাঁর নামে এমন অপবাদ প্রচার হয়েছিল যে দেশত্যাগ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। এত অপবাদ সত্ত্বেও বায়রনের প্রতি লোকের আকর্ষণ হ্রাস পায়নি। বায়রন যখন

দেশত্যাগ করেন, তখন তাঁকে দেখবার জন্য ঝি'র ছদ্মবেশ পরে বড় ঘরের মেয়েরা জাহাজ ঘাটে এসেছিল। সুতরাং বায়রন সহজেই উপন্যাস লেখকদের আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন। বায়রনকে নায়ক করে কতকগুলি উপন্যাস রচিত হয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য লেডি ক্যারোলাইন ল্যাম্বের 'Glenarvon' ও ডিসরায়েলির 'Venetia'। প্রথম উপন্যাসটিতে লেখিকার নাম ছিল না। লেডি ক্যারোলাইন কিছুদিন বায়রনের প্রণয়িনী ছিলেন। বায়রন তাঁকে ত্যাগ করায় ক্ষুব্ধ হয়ে উপন্যাসে তাঁর ক্যারিকেচার করে প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে। পরিবেশটি যথার্থরূপে ফুটিয়ে তোলবার জন্য লেখিকা অন্যান্য জীবিত চরিত্রও কাহিনীর মধ্যে এনেছেন।

ডিকেন্স তাঁর অনেক চরিত্র জীবিত লোক থেকে নিয়েছেন। তাঁর 'Oliver Twist'-এর ম্যাজিস্ট্রেট ফ্যাঙ্ প্রকৃতপক্ষে মিঃ লেইঙ্-এর চিত্র। মিঃ লেইঙ্-এর রূঢ় ব্যবহারে সে অঞ্চলের জনসাধারণ খুব অসন্তুষ্ট ছিল। ডিকেন্সের উপন্যাসে সেই অসন্তোষ প্রকাশ পাবার পরে তাঁর চাকরি যায়। ডিকেন্সের 'Bleak House'-এর স্কিমপোল চরিত্রটি লী হান্ট-এর ব্যঙ্গচিত্র। ডিকেন্স এখানে হান্টকে বিকৃত ভাবে উপস্থিত করেছেন। তাঁর চরিত্রের গুণগুলি বাদ দিয়ে দোষ-ত্রুটির উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। ডিকেন্স একদা হান্টের দ্বারা উপকৃত হয়েও এরূপ ব্যবহার করায় হান্ট খুব দুঃখিত হয়েছিলেন। হান্টের মৃত্যুর পরে ডিকেন্স প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

থ্যাকারে তাঁর উপন্যাস 'The Newcomes'-এ বদমেজাজী মিসেস ম্যাকেঞ্জির চরিত্র এঁকেছেন নিজের শাশুড়ির অনুকরণে। শাশুড়ির ঝগড়াটে স্বভাবের সঙ্গে তাঁর বেশ ভালো পরিচয়ই ছিল।

ক্যাপ্টেন আলেকজাণ্ডার সেলকার্কের ভ্রমণ বৃত্তান্ত ডিফোকে 'রবিনসন ক্রুসো' লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছে। স্কটের 'Ivanhoe' উপন্যাসের রেবেকা চরিত্রটি বিখ্যাত। রেবেকা গ্রাৎস্ নামক ফিলাডেলফিয়ার এক ইহুদী তরুণীর করুণ-মধুর কাহিনী ওয়াশিংটন আরভিং স্কটকে বলেছিলেন। এই বিবরণের উপর ভিত্তি করে স্কট তাঁর রেবেকা চরিত্র এঁকেছেন।

মেরিডিথের 'Diana of the Crossways'-এর নায়িকা লেডি নর্টন ছাড়া কেউ নয়। পীল যে কর্ণ ল' বাতিল করে দেবেন এই খবর লেডি নর্টনই ফাঁস করে দিয়েছিলেন বলে গুজব রটেছিল। এবং তারই প্রতিধ্বনি মেরিডিথের উপন্যাসে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় সংস্করণে মেরিডিথ তাঁর উপন্যাসকে শুধু গল্প হিসাবে পড়বার জন্য পাঠকদের অনুরোধ করেছেন। কাহিনীর মধ্যে কোনো বিশেষ ব্যক্তি-পরিচয় খুঁজে বার করবার চেষ্টা যেন করা না হয়—এই ছিল তাঁর অনুরোধ।

গোয়েন্দা কাহিনীর বিখ্যাত লেখক আর্থার কোনান ডয়েল ডাক্তারী পড়েছিলেন। চিকিৎসা-বিদ্যার একজন শিক্ষক ছিলেন ডাক্তার জোসেফ বেল্। ডাঃ বেলের কাছে বহু রোগী আসত। তাঁর ছিল অদ্ভুত পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা। রোগীদের দেখেই

তিনি বলে দিতে পারতেন তাদের কি রোগ, স্বভাব কিরকম, পেশা কি, ইত্যাদি। এ'র আদর্শে কোনান ডয়েল শার্লক হোম্‌স্‌কে সৃষ্টি করেছেন।

এইচ. জি. ওয়েলস্‌ তাঁর উপন্যাস 'Men like Gods'-এ লর্ড বালফুর, স্যার উইনস্টন চার্চিল প্রভৃতির চরিত্র এমনভাবে এঁকেছেন যে তাঁদের স্পষ্টই চিহ্নিত করা যায়। অথচ মার্গারেট আইলেস্‌ নামে এক লেখিকা তাঁকে কেন্দ্র করে একটি উপন্যাস রচনার পরিকল্পনা করেছেন বলে ওয়েলস্‌ ১৯২০ সালে আদালতে অভিযোগ করেছিলেন।

বার্নার্ড শ'র 'Back to Methuselah' নাটকের ব্রাদার্স বারনাবাস্‌ অধ্যায়টি লয়েড জর্জ ও অ্যাস্‌কুইথের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আমেরিকায় যখন এ নাটকের অভিনয় হয় তখন অভিনেতাদের লয়েড জর্জ ও অ্যাস্‌কুইথের মেক-আপ দেওয়া হত। ব্রিটেনে এরূপ মেক-আপ দেওয়া নিষিদ্ধ হয়েছিল।

১৯০৬ সালে একটি নারী হত্যার মামলা আমেরিকায় বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। গ্রেস ব্রাউন নামে মধ্যবিত্ত ঘরের এক তরুণী নিউইয়র্কে চাকরি করত। নিয়োগকর্তার আত্মীয় যুবক চেস্টার গিলেট ব্রাউনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ব্রাউনকে বিয়ে করবার আশ্বাসও দেয়। ব্রাউন গর্ভবতী হবার পর গিলেটের খেয়াল হলো সে ধনী অভিজাত পরিবারের লোক হয়ে ব্রাউনের মতো একটি সাধারণ মেয়েকে বিয়ে করতে পারে না। দায়িত্ব এড়াবার জন্য সে ব্রাউনকে বেড়াবার ছল করে দূরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করল। পুলিশ হত্যার রহস্য কিনারা করে গিলেটকে উপস্থিত করল বিচারালয়ে। তার প্রাণদণ্ড হলো। এই ঘটনা অবলম্বন করে থিয়োডোর ড্রেজার লিখেছেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'An American Tragedy'। ব্রাউন, গিলেট ও কাহিনীটিকে আমরা ভিন্ন নামে যথাযথ রূপে পাই।

রবার্ট লুই স্টিভেনসন-এর 'The Strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde' নিছক কল্পনাপ্রসূত নয়। ডাঃ জেকিল ও মিঃ হাইড-এর চরিত্র সৃষ্টি করা হয়েছে উইলিয়াম ব্রডির অনুসরণে। ব্রডি দিনের বেলা ব্যবসা করত। মিউনিসিপ্যালিটির সম্মানিত কর্মকর্তা ছিল; লোকে তাকে শ্রদ্ধা করত। কিন্তু রাত্রিবেলা তার অন্য রূপ। ভিন্ন মূর্তিতে সে জুয়া খেলত, চোরের দলের সর্দারী করত, পতিতালয়ে পড়ে থাকত। রাত্রি ও দিনের দুটো পার্ট এমন সুন্দর করে সে অভিনয় করত যে দীর্ঘকাল তার চাতুরি ধরা সম্ভব হয়নি। স্টিভেনসন ছেলেবেলা থেকেই ব্রডির গল্প শুনেছেন। একদিন যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে বিছানায় শুয়ে ছিলেন তখন ব্রডির কাহিনী নতুন করে স্বপ্নে পাওয়া গেল। ব্রডি ডাঃ জেকিল ও মিঃ হাইডের মধ্যে অমর হয়ে আছে।

হেনরি জেমস-এর 'The Asphern Papers'-এর নায়িকা জুলিয়ানা বরদেরো এক রহস্যময়ী রমণীর প্রতিচ্ছবি। শেলির শালী জেন্‌ ক্লেয়ারমণ্টের ছবি। ক্লেয়ারমণ্ট বায়রনকে আত্মদান করবার জন্য তার পেছনে পেছনে হন্যে হয়ে ছুটেছে।

য়ুরোপের বিভিন্ন জায়গায় বায়রনের অনুসরণ করেছে অক্লান্তভাবে। বায়রনের অবৈধ সন্তান অ্যালেগ্রার সে জননী। মাত্র চব্বিশ বছরের মধ্যে ক্লেয়ারমন্ট তার মেয়ে, বায়রন ও শেলিকে হারিয়ে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। তারপর থেকে আশি বছরেরও অধিক বয়স পর্যন্ত সে ইতালীর এক নিভৃত কোণে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেছে শুধু কয়েক বছরের বেদনা-মধুর স্মৃতি বুকে নিয়ে। ক্লেয়ারমন্টের জীবন হেনরি জেমসকে 'The Asphern Papers' লিখতে প্রেরণা দিয়েছিল।

ফ্লোবেয়ারের 'মাদাম বোভারি' অনেকাংশে আত্মজীবনীমূলক। ফ্লোবেয়ার তাঁর নিজের জীবনের প্রেমের কাহিনী বিবৃত করেছেন বলে নিজেই স্বীকার করেছেন। তথাপি এম্মা বোভারির প্রতিরূপ বাস্তব জীবনে পৃথকভাবে পাওয়া যায়। ফ্রান্সের রাই অঞ্চলের এক ডাক্তারের ব্যভিচারিণী তরুণী পত্নী মাদাম দেলফিন দেলামেয়ার মাদাম বোভারির আসল রূপ।

দুমার বিখ্যাত উপন্যাস 'Camille'-এর নায়িকার চরিত্র আঁকা হয়েছে প্যারিসের সুপরিচিতা বারবনিতা মার্দালিন দ্য প্লেসিস-এর জীবনী থেকে। ভিক্টর হুগোর 'Les Miserables'-এর নায়ক জাঁ ভালজিন একটি বাস্তব চরিত্রের উপর নির্ভরশীল। এই প্রকৃত লোকটির নাম পীয়ের ফ্রাঁসোয়া গেইলার্ড—একজন তৃতীয় শ্রেণীর কবি ও দার্শনিক। ১৮২৯ সালে চুরির দায়ে যখন তার জেল হয় তখন জনসাধারণের সহানুভূতি পড়েছিল তার উপর। সেই সহানুভূতি দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে হুগো 'লে মিজারেবল্স' লিখেছিলেন। ১৮৩৪ সালে গেইলার্ড যখন মাত্র পাঁচশ' ফ্রাঁর জন্য মা ও অন্য একজন বৃদ্ধ ব্যক্তিকে হত্যা করে, তখন এই সহানুভূতি সে হারিয়েছিল।

আধুনিক জার্মান সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাপন্ন ঔপন্যাসিক লায়ন ফোয়খটভানগার কয়েকটি উপন্যাস লিখেছেন সুপরিচিত শিল্পী ও সাহিত্যিকদের জীবনী নিয়ে। ''Tis Folly to be Wise' রুশোর জীবনী-উপন্যাস। 'This is the Hour'-এ পাই শিল্পী গোয়ার জীবন-কাহিনী। বেঞ্জামিন ফ্র্যাংকলিনের জীবনী-উপন্যাস পাই তাঁর 'Proud Destiny' গ্রন্থে।

সমারসেট মম-এর 'The Moon and Sixpence'-এর নায়ক চার্লস স্টিকল্যান্ড শিল্পী গঁগা ছাড়া কেউ নয়। মম-এর 'Cakes and Ale'-এ টমাস হার্ডি ও ওয়ালপোলের ব্যঙ্গচিত্র আঁকা হয়েছে বলে সমালোচকদের ধারণা।

জীবনী-উপন্যাস আজকাল এত বেশী লেখা হয় যে তাদের উল্লেখ করা সম্ভব নয়। লেখক ও পাঠকদের নিকট এই ধরনের উপন্যাস ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

সমারসেট মম 'কেক্স্ অ্যান্ড এইল'-এর ভূমিকায় (১৯৪০) বলেছেন, 'All the characters we create are but copies of ourselves.' ঔপন্যাসিকের চিন্তা-ভাবনা ও জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর কাহিনীর মধ্যে অলক্ষ্যে এসে যায়। বর্তমানকালের ব্যক্তিকেন্দ্রিক রচনায় এটা স্বাভাবিক। উপন্যাসের মধ্যে লেখক

নিজেকে বিস্তার করবার যে সুযোগ পেয়েছেন সে সুযোগ পূর্বে ছিল না। নিজের অজ্ঞাতসারে লেখকের অভিজ্ঞতার নির্যাস যখন কাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে তখন তাকে পৃথক করে দেখা কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় লেখক নিজের জীবনের ঘটনা উপন্যাসে রূপান্তরিত করেছেন। কখনো সম্পূর্ণ উপন্যাসই লেখকের জীবনীর উপর নির্ভরশীল ; কোথাও একটি অধ্যায় বা উপকাহিনী লেখকের জীবন থেকে গৃহীত।

নিজেকে প্রকাশ করবার লোভ মানুষের মনে সহজাত। গল্পের মধ্য দিয়ে যে প্রকাশ, তা যেমন সুন্দর তেমনি আকর্ষণীয়। সুতরাং অনেক খ্যাতনামা লেখক জনচিত্ত স্পর্শ করবার লোভে নিজের আনন্দ-বেদনাকে উপন্যাসের বিষয়বস্তু করেছেন। নিজের কথা বলবার উদ্দেশ্য নিয়ে লেখক যখন লেখেন, তখন সহজেই তাঁকে চেনা যায়। এরকম উপন্যাসের অভাব নেই। সাহিত্যে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার প্রসার যত বাড়ছে, আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস লেখকদের নিকট ততই সমাদৃত হচ্ছে। অন্যের জীবনের কথা বলা অপেক্ষা নিজের প্রত্যক্ষ অনুভূতির কথা বলা অনেক সহজ।

সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত করা যায় এরূপ আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের সবগুলির নাম করতে গেলে এক বিরাট তালিকা হয়ে পড়বে। এই শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় গ্যেটের 'The Sorrows of Werther' -কে। নায়ক ভারটার গ্যেটে ছাড়া কেউ নয়। ভারটার-এর কাহিনীর মধ্য দিয়ে গ্যেটে তাঁর প্রথম প্রেমের ব্যর্থতার করুণ কাহিনী বলেছেন। ভারটার তরুণ ছাত্র ; সে কবি এবং অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ। পরিচয় হলো লোটির সঙ্গে ; প্রথম দেখাতেই প্রেম। প্রথম প্রেমের প্রগাঢ় অনুভূতি নিয়ে সে এগিয়ে এলো লোটির কাছে, কিন্তু লোটি প্রতিদানে কিছুই দিতে পারল না। কারণ সে ভারটারের বন্ধু আলবার্টের বাগ্‌দত্তা পত্নী। ব্যর্থতার বেদনা সইতে না পেরে ভারটার বন্ধু আলবার্টের পিস্তল দিয়ে আত্মহত্যা করল।

গ্যেটে আত্মহত্যা করেননি। এছাড়া অন্য সব বিষয়েই তাঁর জীবনের সঙ্গে কাহিনীর হুবহু মিল রয়েছে। গ্যেটে ও লোটির কাহিনী নিয়ে টমাস মান একটি উপন্যাস লিখেছেন।

যুবক বালজাক জীবনের শুরুতেই অবহেলা ও অনাদর পেয়ে যখন সংসারের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠছিলেন, তখন মাদাম দ্য বার্নির সহৃদয় ব্যবহারে তাঁর মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন এলো। জীবনে বালজাক কখনো সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার পাননি ; মাদাম দ্য বার্নির কাছ থেকে সহানুভূতি পেয়ে এই চল্লিশোত্তীর্ণা নয় সন্তানের জননীর প্রতি গভীররূপে আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। মাদাম দ্য বার্নির সাধ্য হলো না বালজাকের আকর্ষণ প্রতিরোধ করবার। সমাজের নিন্দা অগ্রাহ্য করে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দীর্ঘকাল অক্ষুণ্ণ ছিল। মাদাম দ্য বার্নির উপদেশ ও উৎসাহ না

পেলে বালজাকের জীবন কোন্‌ পথে যেত বলা যায় না। বালজাক তাঁর 'Le Lys dans la Vallee' ('লিলি অব দি ভ্যালি') উপন্যাসের মাদাম দ্য মরৎসোফের মধ্যে মাদাম দ্য বার্নি'কে চিত্রিত করেছেন।

টলস্টয়ের 'War and Peace'-এ আমরা তাঁর পরিবারের ছবি কিছু কিছু পাই। প্রধান চরিত্র পিয়ের বেজুহভ্‌-এর সঙ্গে টলস্টয়ের ঘনিষ্ঠতা সুস্পষ্ট।

মোপাসাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'Une Vie' বা 'একটি জীবন' তাঁদের পারিবারিক ইতিহাস। তিনি পিতা-মাতার অসুখী দাম্পত্য-জীবনের ছবি এঁকেছেন। অসুখী দম্পতির পুত্রের মধ্যে আমরা মোপাসাঁকে পাই।

ডিকেন্সের 'ডেভিড কপারফিল্ড' আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। ডি. এইচ. লরেন্স-এর 'Sons and Lovers'-ও লেখকের জীবনের কাহিনী। এমনি আরো অসংখ্য আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

যে বাস্তব নর-নারীর জীবনের উপরে ভিত্তি করে লেখক নাটকে বা উপন্যাসে চরিত্র সৃষ্টি করেন, তাদের সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানের বিশেষ মূল্য আছে। ঔপন্যাসিক বা নাট্যকার বাস্তব জীবনের কাঁচা মাল-মশলা থেকে কি করে শিল্পসৃষ্টি করেন, তুলনামূলক বিচারের সাহায্যে তা উপলব্ধি করা যায়।

□ সাহিত্যিক ধাপ্পা □

সংসারে ধাপ্পা ও জালিয়াতি কোথায় নেই? আজকালকার দুর্দিনের বাজারে অনেকে এদের অর্থোপার্জনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করেছে। তবে আমরা প্রায় সকলেই জালিয়াতি না করলেও নিছক আমোদের উদ্দেশ্যে কখনো কখনো ধাপ্পা দিয়ে থাকি। এজাতীয় ধাপ্পায় কারো ক্ষতি হয় না; কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ হাসতে পারা যায়।

জীবনের অন্যান্য বিভাগের মতো সাহিত্যের ক্ষেত্রেও চুরি, জালিয়াতি ও ধাপ্পার অভাব নেই। অবশ্য কপিরাইট আইন বলবৎ হবার পর প্রকাশ্য চুরি ও জালিয়াতি প্রায় বন্ধ হয়েছে। লেখকদের ধাপ্পা দেবার অভ্যাসটাও বর্তমান শতকে উল্লেখযোগ্যরূপে হ্রাস পেয়েছে। অর্থোপার্জনের জন্য যারা জালিয়াতি করে বা ধাপ্পা দেয় তাদের কথা ভুলে যেতে আমাদের দেরি হয় না। শাস্তি হলেও আদালতের নথিপত্রে তাদের পরিচয় হারিয়ে যায়। কিন্তু লেখকদের ধাপ্পা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান লাভ করে।

সাহিত্যিক ধাপ্পার দৃষ্টান্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, লেখকরা সাধারণত অর্থের লোভে ধাপ্পার আশ্রয় গ্রহণ করে না। লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করাই তাদের ধাপ্পা দেবার উদ্দেশ্য। অর্থ উপার্জনের জন্য এক শ্রেণীর লোক নকল প্রথম সংস্করণ তৈরী করে চড়া দামে বিক্রি করে। এরা প্রায় কেউ লেখক নয়; সুতরাং এদের কথা এখানে আলোচনা করব না।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নতুন লেখকদের প্রতিষ্ঠা লাভ করতে বেশ বেগ পেতে হত। তখন কোনো লেখকের প্রশংসা প্রচার করবার মতো বহুল-প্রচারিত সংবাদপত্র বা সাময়িকপত্র ছিল না। নতুন লেখকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করানো কঠিন ছিল। এই দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য অনেক লেখক ধাপ্পার সহায়তা গ্রহণ করত। এই ধাপ্পা কিরকম? যেমন ডিফো (১৬৫৯-১৭৩১) 'জার্নল অব দি প্লেগ' বের করলেন বেনামে। নামপত্রে লিখলেন: 'প্লেগের সময় লণ্ডনে অবস্থানকারী একজন নাগরিকের রচিত।' প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পাওয়া যাবে বলে পাঠক সমাজে এ-বই সমাদৃত হবে এই আশায় ডিফো ধাপ্পা দিয়েছেন। ১৬৬৫ সালের প্লেগ মহামারীর সময় ডিফোর বয়স মাত্র ছয় বছর। সুতরাং তিনি প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ তো আর লিখতে পারেন না।

স্কট (১৭৭১-১৮৩২) 'রব রয়' উপন্যাসের ভূমিকায় লিখেছেন যে, কাহিনীর খসড়াটা তিনি পেয়েছেন এক অপরিচিত পত্র-লেখকের কাছ থেকে। কিন্তু পরবর্তী এক সংস্করণে তিনি জানিয়েছেন, একথা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। ভলটেয়ারের (১৬৯৪-১৭৭৮) 'কাঁদিদ' বেরিয়েছিল বেনামে। ভূমিকায় লেখা হয়েছিল যে, জার্মান লেখক ডঃ রালফের বইয়ের ফরাসী অনুবাদ এই 'কাঁদিদ'। বলা বাহুল্য, জার্মান ভাষায় এ বইয়ের অস্তিত্ব ছিল না।

হোরেস ওয়ালপোল (১৭১৭-৯৮) তাঁর 'ক্যাসল অব ওত্রান্তো' ছাপিয়েছিলেন বেনামে। ভূমিকায় বলা হয়েছিল যে এটি প্রাচীন ইটালিয়ান গ্রন্থের অনুবাদ। বইটি এক বনেদী ক্যাথলিক পরিবারে অকস্মাৎ আবিষ্কৃত হয়েছে।

এইভাবে মূল লেখকের নাম গোপন করে পাঠকের মনে কৌতূহল সৃষ্টি করাই ছিল লেখকের ধাপ্পা দেবার উদ্দেশ্য।

পাশ্চাত্যের সাহিত্যে ধাপ্পার যত প্রাচুর্য, আমাদের দেশে তেমন নেই। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রথম ধাপ্পার প্রবর্তন করেন রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১)। বালক রবীন্দ্রনাথ ষোলো বছর বয়সে বৈষ্ণব কবিদের ভাষা ও ভাবের সফল অনুকরণ করে লিখলেন 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'। এগুলি যে বৈষ্ণব মহাজনদের রচিত আসল পদাবলী নয়, তা পণ্ডিতরাও ধরতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ চ্যাটারটনের কাহিনী শুনে এরূপ ধাপ্পা দেবার প্রেরণা পেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন যে, লোকে যদি জানে এগুলি বালকের রচিত, তাহলে তারা মুরুব্বীর চালে পিঠ চাপড়িয়ে ভবিষ্যৎ জীবনের সম্ভাবনার কথা শোনাবে। কিন্তু 'তাহাদের (লোকদের) যদি বল, এ সকল একটি প্রাচীন কবির লেখা, তাহারা অমনি লাফাইয়া উঠিবে, ভাবে গদগদ হইয়া বলিবে, এমন লেখা কখনো হয় নাই, হইবে না; এরূপ অবস্থায় একজন যশোলোলুপ কবি বালক কি করিবে?'

বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-৯৪) বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে বেনামীতে একটি ইংরেজী প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'ক্যালকাটা রিভিউ'তে। তৃতীয় পক্ষ সমালোচকের মতো তিনি নিজের উপন্যাস সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন। সে মন্তব্যে অসত্য উক্তি কিছু না থাকলেও পাঠকের ধোঁকা লাগবার পক্ষে যথেষ্ট।

ওদেশের সাহিত্যিক ধাপ্পার কথা বলতে গেলে প্রথম যে দৃষ্টান্তটি মনে পড়ে তা এই: এক যুবক কাগজে লেখা পাঠিয়ে, প্রকাশকদের পাণ্ডুলিপি দিয়ে কোনো সুবিধা করতে পারল না। কেউ তার লেখা ছাপতে রাজী নয়। অথচ লেখক হবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা তার। তখন সে নিরুপায় হয়ে ধাপ্পার আশ্রয় গ্রহণ করল। যুবক নিজের হাতে মিল্টনের (১৬০৮-৭৪) 'Samson Agonistes' নকল করে নতুন নাম দিল 'Like a Giant Refreshed.' তারপর একে একে নামকরা প্রকাশক ও সম্পাদকদের নিকট পাঠাতে শুরু করল তার নকল পাণ্ডুলিপি। কিছুদিন পর থেকে, সে জবাব পেতে আরম্ভ করল। অনেক প্রকাশকই লিখল, বইটি ভালো, তবে ভাষা পুরনো ধাঁচের। একজন প্রকাশক জানালো, বইটি চমকপ্রদ 'উপন্যাস'। আর একজন বইটি প্রকাশ করতে রাজী হলো; কিন্তু শ' পাঁচেক টাকা লেখককে দিতে হবে ছাপার খরচ হিসাবে। মিল্টনের বিখ্যাত বইটি কেউ চিনতে পারেনি। সকলে পাণ্ডুলিপি দেখেওনি। দেখলে 'সামসন অ্যাগোনিস্টিস'কে উপন্যাস বলতে পারত না।

যাই হোক, সম্পাদক ও প্রকাশকদের চিঠিগুলি পেয়ে লেখক-যশঃপ্রার্থী যুবক

উপকৃত হলো। সে তার পাণ্ডুলিপির ইতিহাসের সঙ্গে এই চিঠিগুলি যোগ করে একটি প্রবন্ধ লিখল। প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছিল 'সেণ্ট জেমস গেজেটে'। ছাপার অক্ষরে এই তার প্রথম লেখা, এবং বোধহয় শেষ লেখাও।

নিছক কৌতুকের উদ্দেশ্যে ধাপ্পা দেবার সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। কবি আলেকজাণ্ডার পোপ (১৬৮৮-১৭৪৪) তাঁর সদ্য-রচিত ব্যঙ্গকাব্য ('Rape of the Lock') সুইফটকে পড়ে শোনাচ্ছেন। ডাঃ পার্নেল ঘরের এককোণে বসে পোপের কাব্যপাঠ অলক্ষ্যে শুনছিলেন; তাঁর উপস্থিতির কথা কেউ জানত না। ডাঃ পার্নেলের স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর। তিনি বাড়ী এসে কাব্যের একটি সর্গ ল্যাটিনে অনুবাদ করে পুরনো কাগজে ছাই রঙের কালি দিয়ে লিখে রাখলেন। কিছুদিন পরে একটি বৈঠকে পোপ যখন আবার 'রেপ অব দি লক' পড়ছিলেন তখন পার্নেলও উপস্থিত ছিলেন। কাব্যপাঠ শুনে পার্নেল মন্তব্য করলেন, এটা তো ল্যাটিন থেকে অনুবাদ! পোপ লাফিয়ে উঠলেন। পোপ তখন ইংলণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। এরূপ অন্যায় মন্তব্যে তিনি ক্রুদ্ধ হলেন। প্রমাণ দাবি করলেন তিনি। পার্নেল প্রমাণ উপস্থিত করে বললেন, এক প্রাচীন খ্রীষ্টান মঠে একটি ল্যাটিন কাব্যের টুকরো টুকরো অংশ পাওয়া গেছে। তার একটি অংশ তিনি পেয়েছেন। পোপ তো তাঁর কাব্যাংশের সঙ্গে পুরনো পাণ্ডুলিপির হুবহু মিল দেখে হতবাক। কিছুতেই তিনি ভেবে পেলেন না এমন মিল কি করে হতে পারে! পার্নেল যতদিন পর্যন্ত দয়া করে রহস্যভেদ করেননি, ততদিন তাঁর মন এ ব্যাপারে ভারাক্রান্ত ছিল।

বার্ক (১৭২৯-৯৭) একবার বাজি ধরে লিখেছিলেন 'Vindication of Natural Society.' বাজির শর্ত ছিল এই—ভাষা ও রচনারীতি এমন হবে যে পাঠকরা মনে করবে বইটি পরলোকগত বোলিঙব্রোকের লেখা। বইয়ে লেখকের নাম ছিল না; নামপত্রে উল্লেখ ছিলঃ 'by a late Noble Writer.' বার্ক বাজি জিতেছিলেন। দীর্ঘকাল যাবৎ অভিজ্ঞ সমালোচকরাও বুঝতে পারেননি যে বইটি প্রকৃতপক্ষে বার্কের রচনা। প্রস্পের মেরিমে (১৮০৩-৭০) তাঁর প্রথম রচিত নাটকগুলি নিজের নামে প্রকাশ করেননি। নাটক-সংগ্রহের ভূমিকায় বলা হয়েছিল যে, জিব্রাল্টারের ক্লারা গাজল নামে এক মহিলা এই নাটকগুলির লেখিকা। স্প্যানিশ ভাষা থেকে নাটকগুলি ফরাসী ভাষায় অনুবাদের দায়িত্ব পর্যন্ত মেরিমে গ্রহণ করেননি। কাল্পনিক অনুবাদকের নাম বইয়ে ছাপা হয়েছিল। এই কল্পিত লেখিকার এক সুবিস্তৃত জীবনী নাট্যগ্রন্থাবলীর ভূমিকার সঙ্গে যোগ করা সত্ত্বেও ক্লারা গাজলকে কেউ খুঁজে পায়নি। যদিও একজন 'বিজ্ঞ' সমালোচক তথাকথিত অনুবাদ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন যে, অনুবাদ ভালো হলেও 'মূলের' তুলনায় নিকৃষ্ট। কোথায় মূল স্প্যানিশ লেখিকার রচনা? মেরিমে ধাপ্পা দিলেন; তার উপরে আবার সমালোচকের ধাপ্পা।

জোনাথান সুইফটের (১৬৬৭-১৭৪৫) ধাপ্পা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়

হয়ে থাকবে! তাঁর 'গালিভার্স ট্র্যাভেলস্' প্রথমে বেরিয়েছিল বেনামে। প্রকাশকের নিবেদনে বলা হয়েছিল যে, মিঃ লেমুয়েল গালিভার পুস্তকের সম্পাদকের বহুদিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মিঃ গালিভার জীবিত আছেন এবং থাকেন নিউইয়র্কে। পাঠকের বিশ্বাস উৎপাদন করবার জন্য গালিভারের একটি ছবি ও তারিখ সহ ব্যক্তিগত চিঠি ছাপা হয়েছিল। বই বের হবার পর অনেক পাঠক নিউইয়র্কে গিয়ে বৃথাই গালিভারের খোঁজে ঘুরে এসেছে।

বই শেষ করবার পর সুইফটের আশঙ্কা হয়েছিল যে, এমন আজগুবি ভ্রমণ-কাহিনী পাঠকরা হয়তো সম্পূর্ণ উদ্ভট বলে গোড়াতেই বাতিল করে দেবে। তাই তিনি সত্যকাহিনী হিসাবে একে চালাবার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করেছিলেন।

কবি শেলি (১৭৯২-১৮২২) প্রথম যৌবনে একবার ধাপ্পা দিয়েছিলেন। 'The Posthumous Fragments of Margaret Nicholson' নামে একটি পুস্তিকা তিনি প্রকাশ করেছিলেন। পুস্তিকার সম্পাদক হিসাবে ছাপা হয়েছিল মার্গারেটের এক কল্পিত ভাইপোর নাম। মার্গারেট ছিল এক বিকৃতমস্তিষ্ক ধোবানী। ইংলণ্ডের সম্রাট তৃতীয় জর্জকে হত্যার চেষ্টা করায় তাকে পাগলা গারদে দেওয়া হয়েছিল। এই পাগলীর মুখ দিয়ে এমন সব কথা বলানো হয়েছিল যে, রাজদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হবার আশঙ্কায় নিজের নাম গোপন রেখেছিলেন শেলি।

বিখ্যাত ফরাসী লেখক আলেকজান্দার দুমা (১৮২৪-৯৫) নাকি মোট প্রায় বারোশ' গল্প-উপন্যাস ও নাটক লিখেছিলেন। একজনের পক্ষে কি এত লেখা সম্ভব? বাজারে তাঁর লেখার খুব চাহিদা; দুমার নাম থাকলে যে কোনো লেখা হু হু করে বিক্রি হয়ে যায়। দুমা অর্থোপার্জনের এই লোভ ছাড়তে পারেননি। ভাড়াটে লেখকের লেখা নিজের নামে প্রকাশ করেছেন বলে অভিযোগ আছে তাঁর বিরুদ্ধে। অধিকাংশ লেখক নিজেদের লেখা অন্যের বলে চালিয়ে ধাপ্পা দিয়েছেন; এখানে তার উলটো। দুমা অন্যের লেখা নিজের বলে ভক্ত পাঠকদের ধাপ্পা দিয়েছেন। গল্প আছে, দুমা একদিন তাঁর ছেলেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আমার শেষ লেখাটা পড়েছ?' ধূর্ত ছেলে তৎক্ষণাৎ প্রতিপ্রশ্ন করল, 'তুমি নিজে পড়েছ তো?'

ইংরেজী সাহিত্যের তিনজন বিখ্যাত ধাপ্পাবাজ লেখক জেমস্ ম্যাকফারসন, টমাস চ্যাটারটন ও উইলিয়াম হেনরি আয়র্ল্যাণ্ড। এদের জালিয়াতও বলা যায়। কারণ ধাপ্পা দেবার জন্য এরা জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছিল।

জেমস্ ম্যাকফারসন (১৭৩৬-৯৬) ছিলেন স্কুলের শিক্ষক। প্রাচীন গেইলিক উপজাতির (স্কটল্যাণ্ডের পার্বত্য অঞ্চলের বাসিন্দা) কতকগুলি কবিতা সংগ্রহ করে ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করবার পর ম্যাকফারসনকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আরো গেইলিক কবিতা সংগ্রহের জন্য অর্থসাহায্য করা হয়। স্কটল্যাণ্ডের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে কিছুকাল ঘোরাঘুরির পর তিনি ঘোষণা করলেন যে, কিংবদন্তী-প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ও কবি ওসিয়ানের রচিত একটি কাব্যগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তিনি

আবিষ্কার করেছেন। ওসিয়ানের পিতা ফিঙ্গলের জীবনকাহিনী এই কাব্যের বিষয়বস্তু। ম্যাকফারসন গেইলিক ভাষা থেকে এই কাব্যের ইংরেজী 'অনুবাদ' প্রকাশ করেন। আসলে এটি মস্ত বড় ধাপ্পা। ম্যাকফারসনই কাব্যের রচয়িতা। মূল পাণ্ডুলিপি কেউ চেষ্টা করেও দেখতে পায়নি। ম্যাকফারসনের তথাকথিত 'অনুবাদ' প্রকাশিত হবার পরেই ডঃ জনসন সন্দেহ প্রকাশ করেন। ম্যাকফারসন আর প্রাচীন গেইলিক কবিতা আবিষ্কারে ধাপ্পা দেননি। এরপর থেকে তিনি ইতিহাস ও রাজনীতির চর্চা করেছেন।

ম্যাকফারসনের 'ওসিয়ান' গ্যেটে, শিলার, শাতোব্রিয়াঁ প্রমুখ বিখ্যাত য়ুরোপীয় লেখকদের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। গ্যেটের 'Sorrows of Werther' এ দেখতে পাই ভারটার তার দয়িতা লোটিকে 'ওসিয়ান' পড়ে শোনাচ্ছে।

ম্যাকফারসন শুধু ধাপ্পাবাজই ছিলেন না, কবিপ্রতিভারও অধিকারী ছিলেন। টমাস চ্যাটারটনের (১৭৫২-৭০) কবিপ্রতিভাও প্রখর ছিল। কিশোর চ্যাটারটন ঘোষণা করলেন যে, তিনি ব্রিস্টলের এক গির্জায় পুরনো কাগজপত্রের মধ্য থেকে টমাস রাউলি নামে পঞ্চদশ শতাব্দীর এক কবির কাব্য আবিষ্কার করেছেন। বলা বাহুল্য, এ সবই ধাপ্পা; কবিতাগুলি চ্যাটারটনেরই লেখা। কিন্তু কিশোর কবি পঞ্চদশ শতাব্দীর ভাব, ভাষা ও পরিবেশ এমন নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন যে, পাঠকের মনে কাব্যের যাথার্থ্য সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

চ্যাটারটন অনেক চেষ্টা করেও টমাস রাউলির কবিতা প্রকাশের জন্য কোনো প্রকাশক পেলেন না। তখন তিনি সাহায্যের আশায় পাণ্ডুলিপি পাঠালেন হোরেস ওয়ালপোলকে। পূর্বেই বলেছি, ওয়ালপোল নিজেই 'দি ক্যাসল্ অব ওত্রান্তো' সম্পর্কে ধাপ্পা দিয়েছিলেন। কিন্তু ওয়ালপোল প্রথমে চ্যাটারটনের দাবিকে যথার্থ বলে ভেবেছিলেন; তারপরে যখন বুঝলেন এটা ধাপ্পা—তখন উপদেশ দিয়ে চিঠি লিখলেন চ্যাটারটনকে। চ্যাটারটন বারবার অনুরোধ করেও ওয়ালপোলের কাছ থেকে পাণ্ডুলিপি ফেরত পাননি।

রাউলি ও তার কবিতার কথা ভাবতে ভাবতে চ্যাটারটনের মানসিক রোগ হলো। তিনি নিজেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী বলে মনে করতেন; জীবনযাত্রার ধরনও হয়ে গেল খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীদের মতো। কবিতার যথাযোগ্য মর্যাদালাভ না করতে পারার বেদনায় এবং দারিদ্র্যের জ্বালায় চ্যাটারটন ১৭৭০ সালে বিষপান করে আত্মহত্যা করলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র আঠারো। মৃত্যুর পরে ওয়ালপোল চ্যাটারটনের কবিপ্রতিভার স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তাঁর সব রচনা এখনো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। অশ্লীলতার জন্যই নাকি অপ্রকাশিত রচনাগুলি ছাপানো যায় না। চ্যাটারটনের করুণ কাহিনী আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে। ধাপ্পার কথা মনে থাকে না।

ম্যাকফারসন ও চ্যাটারটন নিঃসন্দেহে কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু উইলিয়াম হেনরি আয়র্ল্যান্ডের (১৭৭৭-১৮৩৫) সাহিত্যপ্রতিভার তুলনায়

আলিয়াতির প্রতিভা ছিল বেশী। আয়র্ল্যাণ্ডের সুবিধা ছিল এই যে, তাঁর বাবা বইয়ের ব্যবসা করতেন ; সুতরাং ছেলেবেলা থেকে পুরনো বই দেখবার সুযোগ পেয়েছেন তিনি। সাত বছর বয়সে তিনি একবার. স্ট্র্যাটফোর্ড-অন-অ্যাভন-এ বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেই থেকে শেক্সপীয়র সম্বন্ধে তিনি খুব আগ্রহান্বিত হয়ে পড়াশোনা করতে আরম্ভ করেন। চ্যাটারটনের বোনের সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় ধাপ্পা দেবার কথা তাঁর মনে হয়।

প্রথম প্রথম তিনি শেক্সপীয়রের স্বাক্ষর, একটা সনেট বা নাট্যাংশ নকল করে লোকের মনে কিছুটা বিশ্বাস উৎপাদন করলেন ; তিনি জানালেন শেক্সপীয়রের স্বহস্তে লিখিত এই কাগজগুলি এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে পুরনো কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গেছে। সাহস বেড়ে গেল। আয়র্ল্যাণ্ড এবার একটি সম্পূর্ণ নাটক লিখে শেক্সপীয়রের নামে চালিয়ে দিলেন। নাটকটির নাম 'Vortigern and Rowena' ; হলিনশেডের 'ক্রনিক্‌ল্‌'-এর উপর ভিত্তি করে রচিত। আয়র্ল্যাণ্ডের বয়স তখন মাত্র আঠারো। এই নাটক রচনা করতে তাঁর দু'মাস সময় লেগেছে। আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে শেক্সপীয়রের লেখার ছাঁদ, ভাষা ইত্যাদি অনুকরণ করেছেন। এলিজাবেথান যুগের বই থেকে সাদা পৃষ্ঠা সংগ্রহ করে এক বিশেষ ধরনের কালি দিয়ে নাটকটি এমনভাবে লেখা হয়েছিল যে বিশেষজ্ঞরাও কোনো ত্রুটি আবিষ্কার করতে পারেননি।

শেক্সপীয়রের নতুন নাটক আবিষ্কৃত হয়েছে জেনে ইংলণ্ডে হৈচৈ পড়ে গেল। প্রিন্স অব ওয়েলস্‌ নিজে তাদের বাড়ী এসে আয়র্ল্যাণ্ডকে অভিনন্দন জানিয়ে গেলেন। বিখ্যাত নাট্যকার শেরিডানের প্রযোজনায় এই নতুন নাটকটি ড্রুরি লেন থিয়েটারে ১৭৯৬ সালের ২রা এপ্রিল অভিনীত হলো। প্রসিদ্ধ অভিনেতা কেম্বল নিয়েছিলেন নায়কের পার্ট। আয়র্ল্যাণ্ড রয়েলটি হিসাবে পাঁচ হাজার টাকা পাবেন চুক্তি হয়েছিল।

অভিনয় জমেনি, কারণ নাটকটি কাঁচা। তবু দীর্ঘকাল লোকে ভেবেছে এটি বোধহয় শেক্সপীয়রের প্রথম জীবনের রচিত নাটক, তাই অপরিণত। তারপর আয়র্ল্যাণ্ডই এক স্বীকারোক্তি প্রকাশ করে সকল রহস্য ফাঁক করে দেন।

আজকাল সমালোচকের দৃষ্টি তীক্ষ্ন হয়েছে, তাদের সংখ্যা বেড়েছে। তাছাড়া প্রকাশক ও গ্রন্থাগারিকরা বই সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী। তাই এখন ধাপ্পা দেওয়া সহজ নয়। তথাপি সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর সাহিত্যিক ধাপ্পা হল লামা লপস্যাং রম্পার 'দি থার্ড আই'। একজন তিব্বতী লামার আত্মজীবনী হিসাবে এ বই প্রকাশিত হয়েছে। বইয়ের মধ্যে তিব্বতের পরিবেশ নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন লেখক। পরে জানা গেল লেখক লামা নয়, তিব্বতবাসীও নয়। কিন্তু প্রকাশকের বিশেষজ্ঞ সম্পাদকমণ্ডলীও ধাপ্পা ধরতে পারেননি।*

* লেখকের একটি পুরনো বই থেকে নেওয়া।

□ বাংলা চর্চায় মন্দভাগ্য □

ভাবতে আশ্চর্য লাগে, যে সব বিদেশীর দানে প্রথম পর্বের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁদের প্রায় সকলেই জীবনে দুঃখকষ্ট ও লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন।

ক্লাইভ অবশ্য বাংলা মুদ্রণ বা বাংলা বই রচনার জন্য কিছু করেননি। কিন্তু তিনি সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেছিলেন কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীদের স্থানীয় ভাষা শেখা বিশেষ দরকার। ১৭৫৭-র ২৩শে ডিসেম্বর কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডকে ক্লাইভ এক চিঠিতে জানাচ্ছেন: আমার সাম্প্রতিক অভিযানে সঙ্গী ছিলেন ওয়াট্‌স্, স্থানীয় ভাষা তাঁর খুব ভালো জানা আছে। এতে আমার বিশেষ সুবিধা হয়েছে। পরের বছর ক্লাইভ যখন গভর্নর হলেন তখন দেখছি কটক থেকে মিঃ ব্রিস্টোকে বদলি করা হচ্ছে, কেননা স্থানীয় ভাষা তাঁর জানা নেই।

স্থানীয় ভাষা সম্বন্ধে ক্লাইভের এই আগ্রহ থেকেই সূত্রপাত হয়েছিল বাংলা চর্চার। ক্লাইভ উপরের চিঠিটি লেখার মাত্র কুড়ি বছরের মধ্যেই হলহেডের ব্যাকরণ ছাপা হয়েছিল।

ক্লাইভ তো ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন করে দেশে ফিরলেন। কিন্তু যে সম্মান তাঁর প্রাপ্য তা পেলেন না। কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে পার্লামেণ্টে ঘুষ নেওয়া, ভারতীয়দের উপর অত্যাচার করা ইত্যাদি নানা অভিযোগ উঠল। এই সব অভিযোগের বিচারও আরম্ভ হলো। চলল দীর্ঘদিন ধরে। সমাজের সকলের কাছে অপমান। স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা, প্রচুর পরিমাণে আফিং খেয়ে যন্ত্রণাকে ভোঁতা করতে হয়। শেষ পর্যন্ত বিচারে সব অভিযোগ থেকে মুক্তি পেলেন। কিন্তু আদালত তাঁকে মুক্তি দিতে পারেনি হতাশা, অবসাদ এবং অসহ্য রোগযন্ত্রণা থেকে। মুক্তির ব্যবস্থা তিনি নিজেই করলেন নিজের গলা কেটে, ২২শে নভেম্বর ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে।

ক্লাইভের সহকর্মী হিসাবে বছর এগারো কাজ করেছেন উইলিয়াম বোলট্‌স। জাতিতে জার্মান, জন্ম আমস্টার্ডামে। মাত্র পনেরো বছর বয়সেই ভাগ্যের সন্ধানে তিনি এলেন লণ্ডনে। এখানে সুবিধা না হওয়ায় পৌঁছলেন লিসবনে। কিন্তু ঠিক তখনই প্রচণ্ড ভূমিকম্পে পর্তুগালের এক বৃহৎ অংশ বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে। শিগ্‌গির এখানে কোনো সুবিধার আশা নেই দেখে পাড়ি দিলেন কলকাতার পথে। ১৭৫৬-র জুন মাসে তথাকথিত অন্ধকূপ হত্যার ঠিক পরেই বোলট্‌স কলকাতা পৌঁছলেন। ইংরেজরা তখন সন্ত্রস্ত। নতুন কেউ আসতে চাইছে না, যারা এখানে আছে তারাও আসন্ন যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। সুতরাং বোলট্‌স সহজেই রাইটারের চাকরি পেয়ে গেলেন। কিছুকাল পরে তাঁকে দেখতে পাই কোম্পানীর কুঠিয়াল হিসাবে। আবার

তাঁর পদোন্নতি, বেনারস কাউন্সিলের সহ-প্রধান। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতায় কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ এলো, কোম্পানীর নাম ভাঙিয়ে বোলট্‌স নিজের ব্যবসা করেছেন, মালিকের স্বার্থ দেখছেন না।

চাপে পড়ে বোলট্‌সকে 'মার্চেন্টে'র চাকরি থেকে ইস্তফা দিতে হলো। নতুন চাকরি পেলেন মেয়র্স কোর্টের বিচারক হিসাবে। অল্পদিনের মধ্যেই আবার নানা অভিযোগ উঠতে লাগল। তিনি নাকি দেশীয় রাজা-জমিদারদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছেন কোম্পানীর বিরুদ্ধে। আরও অনেক অভিযোগ। গভর্নরের কাউন্সিলে সিদ্ধান্ত হলো বোলট্‌সকে ইংলণ্ডে ফিরে যেতে হবে। স্বেচ্ছায় যখন গেলেন না তখন অনেক চেষ্টার পর বন্দী করে জাহাজে তুলে দেওয়া হলো। জাহাজের কাপ্তেন সহজে তাঁকে নিতে রাজী হয়নি। গুজব রটে গিয়েছিল বড় সাংঘাতিক লোক এই বোলট্‌স। জাহাজে উঠে কী করে বসেন কে জানে? কোম্পানী পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডের জামিন স্বীকার করবার পরই কাপ্তেন সম্মত হয়েছে।

বোলট্‌স ভারতে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন। সঙ্গে নিয়ে যেতে দেওয়া হয়নি। লণ্ডনে তাঁর প্রথম কাজ হলো বাংলাদেশে কোম্পানীর কুশাসন সম্বন্ধে প্রচার করা। প্রচারের জন্য ছাপালেন ফোলিও সাইজের মোটা মোটা তিন খণ্ডের এক বই। কোম্পানী তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করেছে, তাই কোর্টে ছুটোছুটি করতে হয়। লণ্ডনে যা টাকা ছিল, বই ছাপানো আর মামলাতেই তা প্রায় শেষ হয়ে গেল। অবসর সময় আপন খেয়ালখুশিতে তিনি আর একটা কাজ করছিলেন। তবে এটা শখ হলেও নতুন কিছু নয়। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় থাকতে কথাটা মনে হয়েছিল। নিজের দেশ জার্মানিতে প্রায় সওয়া তিনশ বছর আগেই মুদ্রণশিল্প আরম্ভ হয়ে গেছে। অথচ কলকাতার মতো শহরে নেই মুদ্রণের কোনো সুযোগ। কাজকর্ম চালাতে, বক্তব্য প্রচার করতে মুদ্রণের সহায়তা অপরিহার্য। তখন কোম্পানীর সঙ্গে তাঁর বিরোধ চলছিল। এ বিষয়ে নিজের কথা সবাইকে জানাবার জন্যই ছাপাখানার অভাব বোধ করেছিলেন কিনা জানা যায় না। তিনি কাউন্সিল হাউসের দরজায় এঁটে দিলেন এক বিজ্ঞপ্তি, তাতে ঘোষণা করলেন, এখানে কেউ ছাপাখানা খুললে তিনি তাকে সবরকমে সাহায্য করবেন। কেউ এগিয়ে এলো না। ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকেই বোলট্‌সকে ভারত ত্যাগ করতে হয়।

লণ্ডনে তাঁর অনেক ঝামেলা। বিরাট বড় এক বই লেখা, তা ছাপানো, আদালতে হাজিরা দেওয়া। এ সবের মধ্যেও তাঁর মনে ছিল কলকাতায় ছাপাখানা নেই, বিশেষ করে বাংলা ছাপার সুযোগ। মুদ্রণের প্রথম শর্তই হলো মুভেবল টাইপ বা বিচল হরফ চাই। বাংলা হরফ নির্মাণের কাজ তিনি নিজেই শুরু করলেন। বাংলা শিখেছিলেন ভালোই। ব্যঞ্জনবর্ণের হরফ হয়ে গেল, ঢালাই করালেন লণ্ডনের এক বিখ্যাত কারিগরকে দিয়ে। কিন্তু এ কাজে দরকার প্রচুর অর্থ। যুক্তাক্ষর সহ প্রায় ছ'শ হরফের প্রয়োজন। এত হরফ তৈরী করবার মতো টাকা তাঁর

নেই। সুতরাং কোম্পানীকে চিঠি দিলেন। লিখলেন, উপযুক্ত শর্তে কোম্পানী আমার তৈরী হরফ নিক্। এতে বাংলাদেশে খুব সুবিধা হবে কাজকর্মের, তাছাড়া অন্যান্য প্রদেশও এর দ্বারা উপকৃত হবে। আশ্বাস পেলে বাকি হরফগুলি তিনি তৈরী করে দেবেন। চিঠির সঙ্গে দিয়ে দিলেন তাঁর তৈরী হরফের নমুনা। এ চিঠির তারিখ ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৭৭৩।

চিঠিতে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তাঁর এই প্রস্তাব হয়তো গৃহীত হবে না, কেননা কোম্পানীর সঙ্গে তাঁর বিরোধ; অন্য কেউ এ প্রস্তাব করলে নিশ্চয়ই গ্রহণ করা হত। সত্যি হল সে আশঙ্কা, কোম্পানী সাড়া দিল না।

এদিকে বোলট্সকে জীবিকার জন্য কিছু একটা করতে হবে। তাছাড়া অভিযানপ্রিয় দুঃসাহসী বোলট্স আবার শুনতে পেলেন এশিয়ার ভারতের আহ্বান। সেখানে আছে সোনার খনি। হয়তো মনে দুরাশা জেগেছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে। হয়তো মনে হয়েছিল কিছু অর্থ উপার্জন করে বাংলা হরফ তৈরীর কাজটা সম্পূর্ণ করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে অস্ট্রিয়ার সম্রাজ্ঞী মারিয়া টেরেসার সঙ্গে দেখা করলেন বোলট্স। প্রস্তাব দিলেন অস্ট্রিয়ান ইস্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানী খোলার। চার-পাঁচটি য়ুরোপীয় ভাষা জানেন, জানেন বাংলা, ফারসী আর ভারতে ব্যবসায়ের এতদিনের অভিজ্ঞতা। সব ঠিক হয়ে গেল। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি জাহাজ ও লোকজন নিয়ে আফ্রিকা ছুঁয়ে ভারতের পথে যাত্রা করলেন। প্রথম কুঠি পশ্চিম ভারতে। কিন্তু তাঁর মন পড়ে ছিল বাংলাদেশে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁকে সেখানে জাহাজ নোঙর করতে দেবে না। সুতরাং নিকোবর দ্বীপে কুঠি করলেন। ভুল নির্বাচন, তখন সে দ্বীপ বসবাসের উপযোগী ছিল না। বোলট্স যখন সেখানকার কুঠির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন, তখন হুগলীতে হলহেডের ব্যাকরণ ছাপা হয়ে গেছে। তিনি যে কাজ কিছুদূর করেছিলেন তা সম্পূর্ণ করেন উইলকিন্স। এ-সংবাদ বোলট্সের কাছে পেঁছয়নি নিশ্চয়। বোলট্সের দুর্ভাগ্য, অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও অস্ট্রিয়ান ইস্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানী বন্ধ হয়ে গেল।

বোলট্স দমলেন না। ফরাসী সরকারকে নতুন প্রস্তাব দিলেন, তাঁদের আগ্রহ নেই। কিন্তু প্রস্তাবটি গ্রহণ করলেন সুইডেনের রাজা তৃতীয় গুস্তাভাস। বোলট্সের প্রস্তাব দুটি ভাগে বিভক্ত: এক, প্রাচ্যে বাণিজ্য; দুই, বসতিহীন এক দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন। দুটির জন্যই বোলট্স নিপুণ ও বিশদ পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন; এখন পড়লে তাঁর দক্ষতায় বিস্মিত হতে হয়। তিনি যে পুস্তকপ্রেমী ছিলেন, পরিকল্পনা থেকে তারও পরিচয় পাওয়া যায়। অভিযানে কি কি বই সঙ্গে যাবে তার তালিকা আছে। তিনি বলেছেন, জাহাজে যে-কেবিনে তিনি থাকবেন, তার পাশেই থাকবে তাঁর লাইব্রেরির জায়গা। কারণ বইয়ের সঙ্গ ছাড়া তাঁর জীবন হবে প্রাণছাড়া দেহের মতো।

বোলট্‌সের কথা যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁরা বলেছেন অ্যাডভেঞ্চারার বোলট্‌সের কথা, তাঁর ব্যবসায়ে উদ্যম ও ব্যর্থতার কথা। বাংলা হরফ তৈরীর কথা নেই। কেবল হলহেড বাংলা ব্যাকরণের ভূমিকায় বলেছেন, বোলট্‌সের হরফ নির্মাণের চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। বাঙালী পণ্ডিতরাও তাঁর কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন। অথচ তাঁরা কেউ বোলট্‌সের হরফের নমুনা দেখেননি। আমাদের দেশে এই প্রবন্ধের সঙ্গে প্রথম বোলট্‌সের হরফের প্রতিলিপি ছাপা হলো। বিলেতেও প্রচার হয়নি। শুধু দেখেছিলেন হলহেড, উইলকিন্‌স এবং কোম্পানীর কয়েকজন কর্মী। কারণ বোলট্‌স তাঁর চিঠির সঙ্গে নমুনা পাঠিয়েছিলেন। উইলকিন্‌স ছিলেন কোম্পানীর কর্মচারী, হেস্টিংসের নির্দেশে কাজ করেছেন এবং প্রয়োজনীয় টাকা অগ্রিম পেয়েছেন। সর্বোপরি পঞ্চাননের মতো যোগ্য সহকারী পেয়েছিলেন। আর বোলট্‌স বাংলাদেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে একা নিজের পয়সা খরচ করে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ জেনেও হরফ তৈরী করেছেন। বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির বিচিত্র ছাঁদের অক্ষর থেকে ছাপার উপযোগী হরফ তৈরীর সাধনায় তিনি যে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন তা মুদ্রিত প্রতিলিপি থেকেই দেখা যাবে। পাঁচ বছর পরে নির্মিত উইলকিন্‌সের অক্ষরের তুলনায় মোটেই নিন্দনীয় নয়। বোলট্‌সের সামনে মুদ্রণযোগ্য কোনো হরফের আদর্শ ছিল না; উইলকিন্‌সের সামনে অন্তত বোলট্‌সের নমুনা ছিল।

কিসের আকর্ষণে স্বেচ্ছায় একাজ করতে গেলেন বোলট্‌স? ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই কথাটা নিয়ে তিনি ভাবছিলেন। হেস্টিংস-হলহেড-উইলকিন্‌স বাংলা মুদ্রণের কথা ভাববার পাঁচ বছর আগেই ঐ কাজে তিনি অনেক এগিয়েছিলেন। ১৭৭৩-এ কোম্পানীকে হরফ সম্বন্ধে যে-চিঠি দিয়েছিলেন তার বিষয় তিনি নির্দেশ করেছিলেন 'বাংলায় মুদ্রণ প্রচলন বিষয়ক প্রস্তাব।'

কিন্তু বাংলার প্রতি কেন তাঁর এই আকর্ষণ? বাংলাভাষাকে ভালোবেসেছিলেন নিশ্চয়ই। এমন সমৃদ্ধ ভাষায় মুদ্রণের সুযোগ নেই দেখে তিনি ব্যথিত হয়েছিলেন। হয়তো এটা এক নতুন ধরনের অ্যাডভেঞ্চার। যে ভাষায় মুদ্রণের সুযোগ নেই সেখানে কিছু করা যায় কি না দেখা যাক।

বাংলা মুদ্রণের সূচনাকর্তা, কিন্তু বাঙালীর দ্বারা উপেক্ষিত, স্বর্ণশিকারী দুঃসাহসী অভিযাত্রী বোলট্‌স চরম দুর্দশার মধ্যে প্যারিসে মারা যান ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে। (বোলট্‌স সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য 'দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন': আনন্দ পাবলিশার্স-প্রকাশিত বইটি দ্রষ্টব্য)।

হেস্টিংস গভর্নর-জেনারেলের পদে অধিষ্ঠিত হন ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে, যে বছর বোলট্‌স হরফ সম্বন্ধে চিঠি লিখেছিলেন কোম্পানীকে। হেস্টিংস শাসক ও শাসিতের মধ্যে ব্যবধানটা দূর করতে চেয়েছিলেন সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের দ্বারা। তাঁর উৎসাহে এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা, রেনেলের ম্যাপ, হিন্দু আইনের অনুবাদ

প্রভৃতি হয়েছে। তারপর তিনি দেখলেন ইংরেজ কর্মচারীরা ফরাসী জানে অথচ রাজধানী কলকাতা এবং এই প্রদেশের ভাষা বাংলার চর্চা কেউ করে না। চর্চা করবার প্রধান বাধা বইয়ের অভাব। বন্ধু হলহেডকে তিনি ইংরেজ সিভিলিয়ানদের জন্য বাংলা ব্যাকরণ লিখতে অনুরোধ করেন। ব্যাকরণের বাংলা দৃষ্টান্তগুলি বঙ্গাক্ষরে ছাপাতে হবে। প্রয়োজনীয় মুভেবল টাইপ নির্মাণের জন্য অনুরোধ জানালেন উইলকিন্‌সকে। হেস্টিংসের ব্যক্তিগত আগ্রহ ছাড়া এই ব্যাকরণ ছাপা হত না এবং বাংলা মুদ্রণ আরও কত বিলম্বিত হত কে জানে। গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের কার্যবিবরণী থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় হেস্টিংসের আগ্রহের। ব্যাকরণ ছাপার জন্য টাকা দিতে হবে. লণ্ডন থেকে এজন্য অনুমোদন আনা দরকার ; কিন্তু তাতে কাজ বন্ধ হয়ে থাকবে। নিজের দায়িত্বে তিনি টাকা দিলেন। বললেন, কোম্পানী না দিলে টাকাটা আমি নিজের পকেট থেকে দিয়ে দেব।

ইংলণ্ডে হেস্টিংসের কাজকর্মের বিরূপ সমালোচনার ফলে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে চাকরি ছেড়ে দেশে ফিরে যান। কিন্তু শান্তি পেলেন না। ভূতপূর্ব সহকর্মী স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস এবং আরও কয়েকজনের তাঁর বিরুদ্ধে কুড়িটি অভিযোগের বিচার পার্লামেণ্টে শুরু হয় ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে, শেষ হয় ১৭৯৫। এই দীর্ঘ আট বছর বার্ক, শেরিডান ও ফক্সের মতো বিখ্যাত বাগ্মী দিনের-পর-দিন হেস্টিংসকে অভিযুক্ত করে জনচিত্তে তিক্ততার সৃষ্টি করেছিলেন। অপমানে লজ্জায় তিনি সমাজে মুখ দেখাতে পারতেন না। মামলা লড়তে সঞ্চিত অর্থ শেষ হয়ে গেল। অভিযোগ থেকে মুক্তি পেলেও দীর্ঘকাল তাঁকে মানসিক যন্ত্রণা ও অর্থকৃচ্ছ্রতা ভোগ করতে হয়েছে।

হলহেড ও উইলকিন্‌সও দেশে ফিরে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন। ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হলহেড ছিলেন হেস্টিংসের বন্ধু। প্রাচ্যবিদ্যায় বিস্তৃত পড়াশুনা ছিল। তাঁর লেখা প্রথম বাংলা ব্যাকরণ ছাপা হয় ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারত ছেড়ে বরাবরের মতো চলে যান। বছর পাঁচেক কবিতা লিখে বই পড়ে বেশ কেটে গেল। হঠাৎ কী খেয়াল হল ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে লিসেস্টার কেন্দ্র থেকে পার্লামেণ্টের নির্বাচনে দাঁড়ালেন। প্রচারের কাজে যখন অনেক টাকা খরচ হয়ে গেছে তখন নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন। পরের বৎসর অবশ্য লাইমিংটন কেন্দ্র থেকে পার্লামেণ্টের সভ্য নির্বাচিত হন।

এদিকে রিচার্ড ব্রাদার্সের প্রভাবে হলহেড মুগ্ধ হলেন। ব্রাদার্স নিজেকে প্রচার করতেন ঈশ্বরের ভ্রাতুষ্পুত্র হিসাবে। তিনি ঘোষণা করলেন তৎকালীন ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের পতন ঘটবে, ইংলণ্ড শাসন করবে ইহুদীরা। ফরাসী বিপ্লবের আতঙ্ক তখনো যায়নি। সরকার ব্রাদার্সকে রাজদ্রোহের অভিযোগে কারারুদ্ধ করল। এই গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে হলহেড তিন ঘণ্টা বক্তৃতা দিলেন পার্লামেণ্টে। বক্তৃতার জন্য জনসাধারণের নিকট তিনি ধিকৃত হন। ইংলণ্ডের সংবাদপত্র তাঁকে ব্যঙ্গ-

বিদ্রূপ করতে লাগল। জনরোষ তাঁকে এমনই বিচলিত করল যে তিনি পার্লামেন্টের সভ্যপদ ত্যাগ করে স্বেচ্ছানির্বাসন বরণ করেন। কিন্তু এতেও তাঁর শান্তি হলো না। তিনি জীবনের সঞ্চয় ত্রিশ হাজার পাউন্ড লগ্নি করেছিলেন ফ্রান্সে। আকস্মিক ভাবে ফ্রান্সের কোম্পানী ফেল পড়ায় হুলহেড একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেলেন। শুধু বেঁচে থাকার জন্য তিনি একে একে বাড়ী, বইপত্র, অন্যান্য যা-কিছু ছিল সব বিক্রি করে দিলেন। তাঁর দুরবস্থা দেখে কয়েকজন শুভানুধ্যায়ী ইণ্ডিয়া হাউসে সামান্য বেতনে একটি চাকরির ব্যবস্থা করে দিলেন। তাতে কষ্টে দিন চলে যেত। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বধির হয়ে গিয়েছিলেন।

অর্থের অভাবে বোলট্‌স যে কাজ সম্পূর্ণ করতে পারেননি, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় সে কাজ সুসম্পন্ন করতে পেরেছিলেন চার্লস উইলকিন্‌স। তিনিই প্রথম মুদ্রণের জন্য একপ্রস্থ বাংলা হরফ তৈরী করেছিলেন। তিনি বাংলা মুদ্রণের জনক। ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য তাঁকে দেশে ফিরে যেতে হয়। সচ্ছল অবস্থা, বাকী জীবনটা পড়াশুনা নিয়েই থাকবেন। কিছুদিনের মধ্যেই একটি সংস্কৃত ব্যাকরণ সম্পূর্ণ হলো। তারপর অকস্মাৎ ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে তাঁর বাড়ী, বইপত্র, ভারত থেকে সংগৃহীত পুঁথির সংগ্রহ এবং অন্যান্য জিনিস পুড়ে ছাই হয়ে গেল। টাকাকড়িও গেছে। আশ্রয়হীন সম্বলহীন হয়ে তিনি আবার কোম্পানীর দ্বারস্থ হলেন। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি গড়ে তোলবার দায়িত্ব পেয়ে বেঁচে গেলেন তিনি।

বঙ্গাক্ষর ব্যবহার করে প্রথম অভিধান সংকলন করেন এ. আপজন। তিনি সংকলনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে ভূমিকায় বলেছেন যে, এর সাহায্যে বাঙালীরা ইংরেজী শিখতে পারবে এবং ইংরেজরা বাংলা। আপজন ছিলেন 'ক্যালকাটা ক্রনিকল' কাগজের ও ক্রনিকল প্রেসের এক-ষষ্ঠাংশের মালিক। অভিধানটির নাম 'ইঙ্গরাজী ও বাঙ্গালী বোকেবিলরী' (১৭৯৩); পৃষ্ঠা-সংখ্যা প্রায় ৪৬০। যথেষ্ট সংখ্যক গ্রাহক সংগ্রহ করতে না পারায় বই ছাপা শেষ না হতেই তাঁর টাকা শেষ হয়ে গেল। টাকা সংগ্রহের জন্য তাঁকে সম্পত্তি বিক্রি করে দিতে হয়, অন্তত এই উদ্দেশ্যে কাগজে তিনি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। বই বেরুবার পর সঙ্গতির অভাবে উপযুক্তভাবে প্রচার করতে পারেননি, বইটি তাই এখন দুষ্প্রাপ্য।

আদিযুগের আর একজন উল্লেখযোগ্য অভিধানকার হলেন হেনরি পিটস ফরস্টার। তিনি এক জাঠরমণীকে বিয়ে করেছিলেন, যাঁর বাংলা ভাষায় চমৎকার অধিকার ছিল। ফরস্টার স্ত্রীর কাছ থেকে বাংলা শিখে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে 'কর্নওয়ালিস কোড' অনুবাদ করেন। এরপর শুরু করলেন দুই খণ্ডে অভিধান সংকলনের কাজ। মোট প্রায় নয়শ পৃষ্ঠার বই। এতবড় অভিধান এই প্রথম। প্রথম খণ্ড ১৭৯৯ এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হলো। ফরস্টার সংস্কৃত চর্চা করতেন এবং ভারতীয় ভাবনায় এতই মগ্ন হয়ে পড়েছিলেন যে পুঁথির পুষ্পিকার মতো

অভিধানের শেষে প্রকাশের কালনির্দেশক এই শ্লোকটি দিয়েছিলেন ঃ

'শাকে ভূমিভূজাদ্রোক বর্ষে শব্দার্থ সংশহঃ ।
শ্রীমৎ ফারস্টারেনৈব পরোপকৃতয়ে কতঃ ॥'

অর্থাৎ ১৭২১ শকে বা ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থ সম্পূর্ণ হলো ।

বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি সম্বন্ধে ইংরেজদের মধ্যে তিনিই প্রথম অবহিত হয়েছিলেন। তিনি বলতেন, বাংলায় যে-কোনো ভাব প্রকাশ করা যায়। রাজকার্যে এবং আদালতে ফারসীর পরিবর্তে বাংলা ব্যবহার করা উচিত।

ক্রমে ফরস্টার টাঁকশালের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন। একবার সেখানে তৈরী মুদ্রা ট্রেজারিতে পাঠাতে দেরি হবার অভিযোগে তাঁর চাকরি যায় এবং ১০০ টাকা জরিমানা ও ছয় মাসের কারাবাস হয়। হয়তো তিনি প্রত্যক্ষভাবে দায়ী ছিলেন না, অধীনস্থ কর্মীদের জন্য এই শাস্তি ও অপমান ভোগ করতে হয়। তাঁর মৃত্যু হয় এ দেশে, ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে।

এরপরে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস স্থাপিত হবার পর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা হলো। কেরী এবং তাঁর পুত্র ফেলিক্সের জীবনও ছিল দুর্ভাগ্যপীড়িত। কিন্তু সে অন্য ইতিহাস।

এইসব বিদেশী পথিকৃতের দুর্ভাগ্য হয়তো বাংলা সাহিত্যের নবজন্মের বেদনা।

□ 'আরব্য রজনী' ও তার অনুবাদক □

বাদশাহ শাহরিয়ার প্রিয়তমা পত্নীর বিশ্বাসঘাতকতার প্রমাণ পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। পত্নীর প্রাণদণ্ডের হুকুম দিয়েই তিনি শান্ত হলেন না; সমগ্র নারীজাতির বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিহিংসা জ্বলে উঠেছে। আর কোনো মেয়েকেই তাঁর পক্ষে বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। তাই স্থির করলেন, প্রতিদিন একটি তরুণীকে রানী হিসাবে বরণ করবেন; রাত্রি পার হলে প্রত্যূষে তাকে হত্যা করা হবে। আবার আসবে নতুন রানী। অসতী স্ত্রীর স্বামী হবার অপমান থেকে রক্ষা পাবার এই একটিমাত্র পথ।

বাদশাহের প্রতিহিংসার অনলে একে একে অনেক তরুণীর প্রাণ গেল। মন্ত্রী-কন্যা শেহেরজাদের পালা এলো। অপূর্ব সুন্দরী। কিন্তু যৌবন ও সৌন্দর্যের পরমায়ু শুধু এক রাত্রির। শেহেরজাদ শুধু রূপবতী নয়, বুদ্ধিও তার তীক্ষ্ণ। বাঁচবার জন্য চেষ্টা করতে হবে এই সংকল্প করল মনে মনে। বাসরঘরে বাদশা যখন আরাম করে বসে গড়গড়ার নল মুখে দিয়েছেন, তখন শেহেরজাদ তাঁর পায়ের কাছে বসে বলল, জাঁহাপনা অন্তত এক রাত্রির জন্য হলেও আপনার যে কৃপা পেয়েছি—তা ছিল আমার কল্পনারও অতীত। আজ এই সৌভাগ্যের ক্ষণে আমার একটি গল্প মনে পড়ছে।

গল্প?—বাদশাহ চমকিত হলেন। গল্প শোনা তাঁর জীবনের একমাত্র নেশা। গল্প শুনতে পেলে আর কিছু চান না তিনি। সাগ্রহে বললেন—বেশ, তোমার গল্প বলো।

শেহেরজাদ গল্প শুরু করল। চমৎকার কণ্ঠস্বর, চমৎকার বলবার ভঙ্গি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যায়; বাদশা নিবিষ্ট মনে শুনছেন। গল্প আর শেষ হয় না। সহস্রদল পদ্মের মতো সেই গল্প। গল্পের মধ্যে গল্প, তার মধ্যে গল্প—শেষ নেই। গল্প যখন চরম নাটকীয় মুহূর্তে পেঁছেছে, তখন দেউড়িতে রাত পোহানোর ঘণ্টা বাজল। এবার রাজকার্য শুরু হবে; আর অপেক্ষা করা চলে না। অথচ গল্পের শেষ শুনতে না পেলে স্বস্তি নেই। সুতরাং একদিনের জন্য শেহেরজাদের প্রাণদণ্ড মকুব রইলো। রাতের পর রাত এমনি করে গল্প চলল। গল্পের মোহ পেয়ে বসেছে বাদশাকে। হাজার রাত পার হয়ে গেল। শেহেরজাদের প্রাণ গেল না।

যে গল্প শুনিয়ে শেহেরজাদ বাদশার নিষ্ঠুরতাকে কোমল করতে সক্ষম হয়েছিল, আজ তা পৃথিবীর অগণিত গল্পরসিকের নিকট আনন্দের উৎস। এই আনন্দ থেকে বালক-বালিকারাও বঞ্চিত হয় না। শেহেরজাদ গল্প-রচনা করেনি। কে করেছে

কেউ জানে না। পাঁচ-ছ'শ বছর লোকের মুখে মুখে প্রচলিত থাকবার পর পঞ্চদশ কি ষোড়শ শতকে গল্পগুলি সংকলন করা হয় কাইরো নগরীতে অথবা তারই কাছাকাছি কোনো অঞ্চলে। যদিও আজ এগুলি আরব দেশের গল্প বলেই প্রসিদ্ধিলাভ করেছে, তথাপি অনেকে মনে করেন—আসলে এগুলি ইরান দেশেরই সম্পদ।

এই গল্পগুলিকে আমরা বলি 'আরব্য উপন্যাস'। আসলে উপন্যাস নয়। কিন্তু শেহেরজাদ বিচ্ছিন্ন গল্পগুলিকে অনেকটা উপন্যাসের মতো একসূত্রে বেঁধেছে। ইংরেজী অনুবাদের সবচেয়ে পরিচিত নাম 'দি বুক অব দি থাউজ্যান্ড নাইটস অ্যান্ড এ নাইট'। আরবী ভাষায় এই গল্পসংগ্রহের নাম 'আল্‌ফ লায়লা বা লায়লা'। আরবী ভাষার বন্দীদশা থেকে এই গল্পগুলিকে বিশ্বসাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করেছে রিচার্ড বার্টনের ইংরেজী অনুবাদ।

আরব্য উপন্যাসের কাহিনীর সঙ্গে য়ুরোপের প্রথম পরিচিতি ঘটে আঁতোয়ান গাল্যাঁর ফরাসী অনুবাদের মাধ্যমে। আলাদিন ও আলিবাবার গল্পদুটি তিনিই প্রথম প্রচার করেন। অথচ আলিবাবার গল্পটি কোনো আরবী পুঁথিতেই পাওয়া যায়নি। আলাদিনের মূল গল্পটির রূপও সম্পূর্ণ ভিন্ন। মূল আরবী থেকে প্রথম অনুবাদের চেষ্টা করেছেন হেনরী টোরেন্স। কলকাতা থেকে তাঁর অনুবাদ বের হয় ১৮৩৮ সালে। এর প্রায় চুয়াল্লিশ বছর পরে জন পেইন ইংরেজী ভাষায় রূপান্তরিত করেছিলেন আরব্য উপন্যাসের গল্পগুলি। টোরেন্স তাঁর অনুবাদ সম্পূর্ণ করতে পারেননি। সুতরাং পেইনই প্রথম অনুবাদকের গৌরব পেতে পারেন। ১২ই সেপ্টেম্বর ১৮৮৫, রিচার্ড বার্টনের অনুবাদের প্রথম খণ্ড বের হয়। বার্টনের অনুবাদ এখন পর্যন্ত অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে আছে।

আরব দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে বার্টনের নিবিড় যোগ ছিল বলেই তাঁর অনুবাদ ক্লাসিকের মর্যাদা লাভ করেছে। স্যার রিচার্ড ফ্রান্সিস বার্টন (১৮২১-৯০) ছিলেন একাধারে দুঃসাহসী ভ্রমণকারী সৈনিক, আবিষ্কারক, প্রত্নতত্ত্ববিদ, কূটনীতিবিদ, নৃবিজ্ঞানী, বহু ভাষাবিদ এবং সুলেখক। প্রাণ বিপন্ন করে তিনি নীল নদের উৎস সন্ধানে গিয়েছিলেন ; ধরা পড়লে মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও দেখতে গিয়েছিলেন মক্কার তীর্থক্ষেত্র। তাঁর কর্মজীবনের শুরু হয় ভারতবর্ষে, সেনাবিভাগের অফিসার হিসাবে। ১৮৪২ সালের জুন মাসে একুশ বছরের যুবক চাকরি নিয়ে ভারত যাত্রা করেন। চাকরি-জীবন তাঁর প্রধানত কেটেছে সিন্ধু প্রদেশে। এই অঞ্চল সম্পর্কে তিনি কয়েকটি বই লিখেছিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'সিন্ধু অ্যান্ড দি রেসেস দ্যাট ইনহ্যাবিট দি ভ্যালি অব দি ইন্দাস'।

কিছুকাল পরে বার্টন ভারত ত্যাগ করে এলেন আফ্রিকা। আরব, মিশর, মরক্কো ইত্যাদি বহু অঞ্চল ঘুরে বেড়ালেন কাজ নিয়ে অথবা এমনিতেই। আরবদের সঙ্গে

তাঁর খুব ভাব। তাদের পোশাক পরেন, তাদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে দিন কাটে, আরবী ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করেন। এই অঞ্চলের অভিজ্ঞতা অর্জন করবার ফলে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট তাঁকে রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিযুক্ত করলেন বিভিন্ন রাষ্ট্রে।

১৮৬৯ সালে বার্টন দামাস্কাস এলেন ব্রিটিশ কন্সাল হয়ে। এখানকার শান্ত নিরুদ্বিগ্ন পরিবেশে তিনি সহস্র রজনীর গল্পগুলি অনুবাদ করতে আরম্ভ করলেন। এই গল্পগুলির সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয় ভারতে। সেনাবিভাগে কাজ করবার সময় লোকের মুখে মুখে অনেক গল্প শুনেছেন। এদের মাধুর্য তখনই তাঁকে আকৃষ্ট করেছে। তারপর দীর্ঘ পঁচিশ বছর যাবৎ এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ভ্রমণের সময় আরও গল্প শুনেছেন এবং গল্প সম্পর্কে বিস্তৃত নোট করেছেন। সুতরাং বার্টনের অনুবাদের পশ্চাতে রয়েছে দীর্ঘকালের অনুসন্ধান।

আরব জাতির ইতিহাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড় পরিচয় ছিল বলে বার্টন আরব্য উপন্যাসের স্বাভাবিক পরিমণ্ডলে বিচরণ করবার সুযোগ দিতে পেরেছেন ইংরেজ পাঠকদের। পাদটীকায় টিপ্পনী সংযোগ করে বিশেষ বিশেষ প্রসঙ্গ সম্পর্কে পাঠকদের কৌতূহল চরিতার্থ করবার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে অনুবাদক নিজের মন্তব্য যোগ করেছেন পাত্র-পাত্রী এবং ঘটনা সম্বন্ধে। তার ফলে কোথাও কোথাও কথকতার আমেজ সৃষ্টি হয়েছে। একান্তরূপে পার্থিব জীবন কেন্দ্র করেই গল্পগুলি রচিত। দর্শনের কথা নেই — আছে প্রেম, প্রতিহিংসা, লোভ, দ্বন্দ্ব, ভয় ও অনুশোচনার কথা। তাই সহজেই আরব্য উপন্যাস পাঠকদের আকৃষ্ট করেছিল। অবশ্য বিশেষ করে বার্টনের অনুবাদ সম্বন্ধেই এ কথা সত্য। কারণ তিনিই যথাযথ অনুবাদ করেছেন। অন্য অনুবাদকরা আকাঙ্ক্ষার উদ্দামতাকে রুচির তরবারি দিয়ে ছাঁটাই করে কাহিনী বিকৃত করেছেন। তাই গল্পের মধ্যে অনুভব করা যায় না জীবনের উত্তাপ। মনে হয়, গল্পগুলি বুঝি প্রধানত ছেলেদের জন্যই লেখা।

'আরব্য রজনী' বার্টন সমাপ্ত করলেন ১৮৮৫ সালে। প্রায় ষোল বছর এই অনুবাদের মধ্যে ডুবে ছিলেন বার্টন। আফ্রিকার মরুভূমিতে এবং দক্ষিণ আমেরিকার নিঃসঙ্গতায় সহস্র রজনীর গল্পগুলি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছে। এ কাজে তিনি আনন্দ পেয়েছেন, তৃপ্তি পেয়েছেন। নানা দুঃখকষ্ট, অসুস্থতা, সরকারী অবিচার প্রভৃতি সবকিছু থেকে এ কাজ তাঁকে বাঁচিয়েছে রক্ষাকবচের মতো।

বই ছাপাবার সময় প্রশ্ন উঠল, অশ্লীলতার অভিযোগে বই বাজেয়াপ্ত করা হবে না তো? এই আশঙ্কা এড়াবার জন্য বার্টন গোপনে সীমিত সংখ্যক কপি ছাপবার সিদ্ধান্ত করেন। প্রথম দশ খণ্ড দু'বছরে বের হলো। ছ'টি পরিপূরক খণ্ড সম্পূর্ণ হলো আরও ছ'বছর পরে। বার্টনের স্ত্রী ইসাবেল বই প্রকাশের বিরুদ্ধে ছিলেন। তাঁর ভয় হয়েছিল মুসলমানরা ক্রুদ্ধ হলে বার্টনের চাকরির ক্ষতি হবে। কিন্তু বার্টন বুঝিয়ে বললেন যে, ব্রিটিশ সরকারের যত মুসলমান প্রজা, এত আর কোনো গভর্নমেণ্টের নেই। সুতরাং তাদের সম্বন্ধে সবকিছু ইংরেজদের জানা

উচিত। ইসাবেল শেষে সম্মত হলেন এবং গ্রাহক হতে পারে এমন চৌত্রিশ হাজার লোকের ঠিকানায় সার্কুলার পাঠালেন নিজের হাতে।

প্রথম খণ্ডের নামপত্রে ছাপা হল: 'গ্রাহকদের জন্য কামশাস্ত্র সোসাইটি কর্তৃক মুদ্রিত'। বার্টন ও এফ, এফ, আরবুথনট কামশাস্ত্র সোসাইটি (বানারস) স্থাপন করেন। উদ্দেশ্য ছিল প্রাচ্য দেশের যৌনশাস্ত্র ইংরেজীতে অনুবাদ করা। সোসাইটির সভ্য ছিলেন দুই বন্ধু। 'অ্যারেবিয়ান নাইটস' ছাড়া সোসাইটির নামাঙ্কিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল 'কামসূত্র', 'অনঙ্গরঙ্গ', 'দি পারফিউমড্ গার্ডেন', 'বেহারিস্তান' ও 'গুলিস্তান'। বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র' (বার্টনের অনুবাদ) অল্পদিন যাবৎ ব্রিটেনে সর্বসাধারণের জন্য ছাপা হয়েছে। এতদিন প্রকাশ্যে বিক্রি নিষিদ্ধ ছিল। 'অ্যারেবিয়ান নাইটসের' দশম খণ্ডের সুদীর্ঘ সমাপ্তি প্রবন্ধে এবং পরিশিষ্ট খণ্ডে বার্টন যৌনজীবনের নানা সমস্যা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সে সময় এ বিষয়ে তিনিই পথপ্রদর্শক ছিলেন। বার্টন যৌন শিক্ষা ও স্বাধীনতার সপক্ষে যুক্তি দিয়েছেন। তাঁর মতে যৌনশিক্ষা সুখী জীবনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। প্রাচ্যে এ সম্বন্ধে অনেক বই আছে। পাশ্চাত্যে নেই বলে তিনি অনুবাদের ব্যবস্থা করেছিলেন।

'অ্যারেবিয়ান নাইটস' বার্টনকে খ্যাতি ও অর্থ দুই-ই দিয়েছে। ভিক্টোরিয়ান যুগের রুচিতে বাধত, তাই অনেকে এ বই লুকিয়ে পড়ত। লুকিয়ে পড়া সত্ত্বেও অল্পদিনেই এ বই থেকে বার্টন লাভ করলেন প্রায় দেড় লক্ষ টাকা।

মোট ষোল খণ্ডের বইয়ের পনেরো খণ্ড উৎসর্গ করেছেন বন্ধু ও হিতৈষীদের নামে। পরিশিষ্টের পঞ্চম খণ্ডটির উৎসর্গপত্র অসাধারণ। এই খণ্ডটি উৎসর্গ করা হয়েছে অক্সফোর্ডের বোডলিয়ান লাইব্রেরির তত্ত্বাবধায়ক রেভারেণ্ড প্রাইস ও অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের নামে। বোডলিয়ান লাইব্রেরিতে 'অ্যারেবিয়ান নাইটসের' একটি পুঁথি ছিল। লাইব্রেরিতে এমন কেউ ছিল না যে পুঁথি পড়তে পারে। নকল করবার লোকও পাওয়া গেল না। বার্টন অনুরোধ করলেন—পুঁথি ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে (লণ্ডন) পাঠিয়ে দেওয়া হোক, সেখানে বসে তিনি পড়বেন। কিন্তু ম্যাক্সমুলার এবং অন্য তত্ত্বাবধায়করা কিছুতেই রাজী হননি। এই প্রত্যাখ্যানকে স্মরণীয় করে রাখা হয়েছে উৎসর্গপত্রে। অবশ্য ইসাবেলের পরামর্শে পুঁথির ফটো আনিয়ে বার্টন তাঁর কাজ করতে পেরেছিলেন। ফটোকপির ব্যবহার বোধহয় এই প্রথম।

১৮৯০ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর ত্রিয়েস্তে বার্টনের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি যৌনতত্ত্ব-বিষয়ক একটি আরবী পুঁথি ইংরেজীতে অনুবাদ করেছিলেন। আর একদিন কাজ করতে পারলেই অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়ে যেত। স্বামীর মৃত্যুর কিছুদিন পরে ইসাবেল স্বপ্ন দেখলেন বার্টন যেন সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন, আমার পাণ্ডুলিপি যা আছে পুড়িয়ে ফেলবে। ইসাবেল ক্যাথলিক ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। যৌনবিদ্যা

নিয়ে আলোচনা তাঁর পছন্দ হত না। তাই স্বপ্নাদেশ তাঁর মনের মতো হলো। তিনি স্বামীর সব পাণ্ডুলিপি এবং ব্যক্তিগত দিনলিপি পুড়িয়ে ফেললেন। এর জন্য ইসাবেলের কঠোর সমালোচনা করেছেন ইংলণ্ডের লেখক, সমালোচক ও সাংবাদিকরা।

ইসাবেল স্বামীর 'অ্যারেবিয়ান নাইটসের' বিশ্ববিখ্যাত অনুবাদও পড়েননি। বার্টন শপথ করিয়ে নিয়েছিলেন তাঁকে দিয়ে। কারণ তখনকার দিনের নৈতিক মান অনুযায়ী অনেক অশ্লীল অংশ ছিল অনুবাদে। ইসাবেল শপথ রক্ষা করেছিলেন। যদিও বই বিক্রি, ছাপানো, হিসাবপত্র রাখা ইত্যাদি সবই তাঁকে করতে হয়েছে। স্ত্রী যাতে গল্পগুলি পড়তে পারেন তার জন্য 'লেডি বার্টনস এডিশান অব হার হাসব্যাণ্ডস অ্যারেবিয়ান নাইটস্' নামে আর একটি সংস্করণের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করা হয়েছিল ১৮৮৬ সালে। এই সংস্করণ থেকে 'আপত্তিকর' অংশগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই সংস্করণের পাঁচশ কপিও বিক্রি হয়নি।

□ ওয়ার্ডসওয়ার্থের গোপন প্রেম □

ওয়ার্ডসওয়ার্থের জন্মের পরে দুটি শতাব্দী পার হয়ে গেল। ইংলণ্ডের এক শান্ত পরিবেশে তাঁর জন্ম—৭ই এপ্রিল, ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে। কবি হিসাবে তাঁর আবির্ভাবেরও পৌনে দুশ বছরের বেশী পার হয়ে গেছে। এখন আর-একবার কাব্য-সাহিত্যে তাঁর দানের কথা ভাবা যেতে পারে।

কিন্তু নতুন করে তাঁর কবিকৃতি সম্বন্ধে কিছু ভাববার সুযোগ কোথায়? এই দীর্ঘকাল যাবৎ তাঁর রচনা সকল সম্ভাব্য দিক থেকেই বারবার বিচার ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে; তাঁর কাব্যজগতের এমন কোনো অংশ নেই, কোনো দিক নেই, যেখানে সমালোচকের দৃষ্টি পড়েনি। প্রকৃতপক্ষে এখন ওয়ার্ডসওয়ার্থের সমালোচকদের আধিপত্য। পাঠকদের স্থান পশ্চাতে। বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় ওয়ার্ডসওয়ার্থের স্থান যত বড়, কাব্যপাঠকের স্বেচ্ছাতালিকায় তত নয়।

দীর্ঘ জীবনের প্রথম পর্বে বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁকে। এই অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি পেয়েছেন নতুন ভাবনা। প্রাণময় অনুভূতি এবং নিজেকে প্রসারিত করে দেবার কামনা। সমকালীন রচনায় পাঠক তাই বৈশিষ্ট্যে এবং প্রাণস্পর্শে সমুজ্জ্বল কবিসত্তার সান্নিধ্যে এসে মুগ্ধ হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন তাঁর জীবনে এলো প্রতিষ্ঠা, অর্থ এবং নিশ্চিন্ত আরাম—তখন অভিজ্ঞতায় বিস্ময় রইলো না, অনুভূতি হলো বিবর্ণ। পরিণত বয়সে লিখেছেন অনেক, কিন্তু প্রাণের উত্তাপে ঘাটতি ছিল। জীবনের অন্দরমহল থেকে কবিতা তখন বৈঠকখানায় এসে বসেছে।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের পিতা বাস করতেন মফঃস্বলে, ব্যবসায়ে ছিলেন অ্যাটর্নি। পল্লীর প্রাকৃতিক পরিবেশে ওয়ার্ডসওয়ার্থের দিন কেটেছে আনন্দে, আর মনের কোণে সঞ্চিত হয়েছে ভবিষ্যতে কাব্যরচনার উপাদান। সে যুগের সবগুলো ক্লাসিকও পড়ে ফেলেছিলেন কিশোর কবি। প্রথম আঘাত পেলেন অল্পবয়সে মা-বাবাকে হারিয়ে। তিন ভাই আর এক বোন ডরোথি অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে পড়াশুনা করতে লাগল। আইনের নিয়মে নিযুক্ত অভিভাবক। সুতরাং টাকা-পয়সার ব্যাপারে বেশ কড়াকড়ি ছিল।

১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ওয়ার্ডসওয়ার্থ বি-এ পাশ করে এলেন লণ্ডনে। স্থির হলো ফরাসী ভাষা শিখতে যাবেন ফ্রান্স। বছর তিনেক আগেও এক বন্ধুর সঙ্গে ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, উত্তর ইতালী বেড়িয়ে এসেছিলেন। সেই স্বল্পকালের ভ্রমণের মধুর স্মৃতি আবার সেই পথে পা বাড়াবার

জন্য তাগিদ দিচ্ছিল। ঐ বছরের শেষের দিকে প্যারিসে এসে পেঁছিলেন। প্যারিস তখন বিক্ষুব্ধ, বিপ্লব চলছে। কিছুদিন সেখানে থেকে চলে এলেন ওরলিয়া অঞ্চলে। এখানে ছিলেন বছরখানেক।

এখানে ওয়ার্ডসওয়ার্থের ভাবজীবনে বিপ্লব ঘটে দু'জনের সংস্পর্শে এসে। একজন মাইকেল বোপ্যয়, সেনাবাহিনীর অফিসার এবং ফরাসী বিপ্লবের উৎসাহী সমর্থক। কিন্তু তার চেয়ে বড় পরিচয়—তিনি ছিলেন রুশোর ভক্ত। এঁর কাছ থেকে ওয়ার্ডসওয়ার্থ রুশোর দর্শন সম্বন্ধে যে শিক্ষা পেলেন তা চিরদিনের জন্য তাঁর আপনার হয়ে গেল। ওয়ার্ডসওয়ার্থের চিন্তা-ভাবনায় রুশোর প্রভাব সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়ে।

দ্বিতীয়জন তরুণী আনেৎ ভ্যালো। সস্তায় থাকবার জায়গা খুঁজছিলেন ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ। সেই সূত্রে পরিচয় হলো আনেৎ-এর সঙ্গে। চার বোন। বাবা মারা গেছেন। মা আবার বিয়ে করে চলে গেছেন নতুন স্বামীর বাড়ী। আনেৎ হলো ওয়ার্ডসওয়ার্থের ফরাসী শেখাবার শিক্ষিকা। প্রথম দেখেই ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রেমে পড়লেন। বিদেশে স্নেহময়ী তরুণীর সাহচর্যে সহজেই মন মুগ্ধ হলো। তাছাড়া দু'জনের মধ্যে একটা যোগসূত্র ছিল—দু'জনেই অনাথ। আনেৎ সন্তান-সম্ভবা। একটি কন্যা-সন্তান জন্ম দেবার কিছু আগেই ওয়ার্ডসওয়ার্থ ইংলণ্ডে ফিরে এলেন। ডরোথি তাঁদের বিয়ের জন্য দরবার করল অভিভাবকের কাছে। কিন্তু সম্মতি পাওয়া গেল না। এদিকে ফ্রান্সের অবস্থা এমন ভয়াবহ হয়ে উঠল যে, সেখানে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। নানা কারণে ওয়ার্ডসওয়ার্থ শেষ পর্যন্ত আনেৎকে বিয়ে করবার ইচ্ছা ত্যাগ করলেন। কিন্তু এই অভিজ্ঞতার ছাপ পাওয়া যায় তাঁর অনেক কবিতায়। প্রণয়ীর পরিত্যক্ত সন্তানবতী এক রমণী বারবার এসেছে তাঁর কবিতায়।

জীবনের এই অধ্যায়টিকে তিনি যে লজ্জাজনক বলে মনে করতেন তাতে সন্দেহ নেই। এই ঘটনাটি তিনি একান্ত যত্নের সঙ্গে গোপন রেখেছেন। কবির মৃত্যুর পরেও দীর্ঘকাল যাবৎ আনেৎ ও তার কন্যা ক্যারোলাইনের কথা কেউ জানতে পারেনি। অষ্টাদশ শতকের রোমান্স প্রথম সবাই জানতে পারে বিশ শতকে। আর সঙ্গে সঙ্গে ওয়ার্ডসওয়ার্থের এক অভাবিতপূর্ব নতুন পরিচয় পাওয়া গেল।

ভালোবাসার রোমান্স ও বেদনা, ফরাসী বিপ্লবের উদ্দীপনা, রুশো ও গডুইনের প্রেরণা, স্বদেশে ও বিদেশে ভ্রমণ ইত্যাদি ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিসত্তার উন্মেষ ত্বরান্বিত করে এনেছিল। এই সময় কিছু সম্পত্তির অধিকারী হওয়ায় ওয়ার্ডসওয়ার্থ দ্বিধাহীন চিত্তে কাব্যসাধনাকে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করতে পারলেন। অলক্ষ্যে তাঁর ব্রতের সঙ্গিনী হলেন ডরোথি। শুধু লেখাই তাঁর একমাত্র কাজ ; সংসারের সব ঝঞ্ঝাট ডরোথির।

বন্ধুত্ব হলো কোলরিজের সঙ্গে। প্রকৃতিতে মিল নেই, মনের মিল। মিলনের সূত্র কবিতা আর ডরোথি। কোলরিজের প্রতিভা উদ্দাম, কল্পনার ঘোড়ায় চড়ে

তাঁর মন উধাও হয়ে যায়। প্রচুর পড়তেন, সবরকমের বই। পড়ায় তেমন মন ছিল না ওয়ার্ডসওয়ার্থের। ওয়ার্ডসওয়ার্থ রাশভারী, দৃঢ়চেতা এবং নিয়মনিষ্ঠ। একে অন্যকে প্রভাবান্বিত করেছিলেন অন্তত কিছুদিনের জন্য। 'লিরিক্যাল ব্যালাড্‌স্' (১৭৯৮) এর প্রমাণ। দুই বন্ধুর কবিতা ছাপা হলো এই সংকলনে। ঠিক ছিল, ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর কবিতায় তুচ্ছ বিষয়কে মোহময় করে তুলবেন। পরিচিত বস্তু কবির স্পর্শে হয়ে উঠবে অপরূপ। কোলরিজের উদ্দেশ্য ছিল উল্টো। অপ্রাকৃত বিষয়বস্তু তাঁর কবিতায় বাস্তবের রূপ পাবে, মনে হবে যেন সত্য ঘটনা। 'উই আর সেভেন', 'টিনটার্ন অ্যাবি', 'টেবল্‌স্ টারন্‌ড্' প্রভৃতি বিখ্যাত কবিতায় ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ তাঁর আদর্শকে আশ্চর্য সফলতার সঙ্গে রূপায়িত করেছেন। কোলরিজ কথা রেখেছেন 'দি রাইম অব দি এনশেণ্ট মেরিনার'-এ। প্রথমে স্থির ছিল এই দীর্ঘ কবিতাটি দু'বন্ধু মিলে লিখবেন। কিন্তু দু'জনে যুক্তভাবে লিখতে পারেননি। সমগ্র কবিতায় শুধু দুটি সাধারণ লাইন ওয়ার্ডসওয়ার্থের লেখা। বাকী সব কোলরিজের।

'লিরিক্যাল ব্যালাড্‌সের' কবিতা থেকেই ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিপ্রকৃতির প্রায় পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। একজন সমালোচক 'টিনটার্ন অ্যাবি'কে বলেছেন, 'The consecrated formulary of Wordsworthian faith'. তাঁর কবিতার যে সব বৈশিষ্ট্য, তাদের প্রায় সবগুলিই ধরা পড়েছে 'লিরিক্যাল ব্যালাড্‌সের' কবিতায়।

প্রাচীনপন্থী পত্রপত্রিকায় 'লিরিক্যাল ব্যালাড্‌সের' তীব্র বিরূপ সমালোচনা হলো। কিন্তু যে সংকলন নতুন যুগের সূচনা করবে সাহিত্যের ইতিহাসে, রক্ষণশীলদের আক্রমণ তার প্রচার ও প্রভাব ক্ষুণ্ণ করতে পারল না। দু'বছরের মধ্যেই প্রকাশিত হলো পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ। রোমাণ্টিক আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত করল 'লিরিক্যাল ব্যালাড্‌স্'।

দ্বিতীয় সংস্করণে মাইকেল এবং লুসি কবিতাবলী যোগ করা হয়েছে। কিন্তু বিশেষরূপে মূল্যবান ওয়ার্ডসওয়ার্থ-লিখিত ভূমিকাটি। এই ভূমিকায় যে শুধু ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতার মর্মবাণী পাওয়া যাবে তা নয়, এটি কাব্য-আন্দোলনেরও একটি মূল্যবান দলিল। আধুনিক কবিতাও এই দলিলের নিকট ঋণী।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের মূল বক্তব্যের উপর রুশোর ভাবধারার প্রভাব সহজেই উপলব্ধি করা যায়। তিনি বলেছেন, কবি তাঁর বিষয়বস্তু আহরণ করবেন পরিচিত জীবন থেকে। আর সেই জীবনের ছবি আঁকা হবে প্রতিদিনের ব্যবহৃত ভাষায়। সাধারণকে অসাধারণ করে তোলাতেই কবির কৃতিত্ব। ওয়ার্ডসওয়ার্থের বিশ্বাস ছিল, প্রত্যেক কবিতারই একটি উদ্দেশ্য থাকা উচিত। উদ্দেশ্যের চাপে পড়েও তাঁর অনেক কবিতা যে রসোত্তীর্ণ হতে পেরেছে—তার কারণ অনুভূতির উপর গভীর আস্থা: 'All good poetry is the spontaneous overflow of

powerful feelings.' কিন্তু এই ভাবাবেগকে বহুদিন মনের কোণে লালন করতে হবে। কবিতা তাই 'emotion recollected in tranquillity.'

ক্লাসিক্যাল এবং নিও-ক্লাসিক্যাল রীতি যখন কাব্য থেকে আবেগকে বিতাড়িত করে তার প্রাণ ওষ্ঠাগত করে তুলেছিল, তখন ওয়ার্ডসওয়ার্থ নিয়ে এলেন মুক্তির বাণী ঃ

'He found us when the age had bound
Our souls in its benumbing round ;
He spoke, and loosed our hearts in tears.'

১৮৫০ সালে ওয়ার্ডসওয়ার্থের মৃত্যুর পরে ম্যাথু আর্নল্ড যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন, তা থেকে উদ্ধৃত করা হলো উপরের লাইন ক'টি। একটি ছোট কবিতায় ওয়ার্ডসওয়ার্থের দান সম্বন্ধে আর্নল্ড যা বলেছেন, কয়েক খণ্ডের সমালোচনার বই লিখেও তা বলা যায় না।

আর্নল্ডই ওয়ার্ডসওয়ার্থকে ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত করবার কৃতিত্ব বহুলাংশে দাবি করতে পারেন। টেনিসন এবং অন্য কবিদের জনপ্রিয়তা তাঁকে কোণঠাসা করে রেখেছিল। আর্নল্ড দেখলেন, ওয়ার্ডসওয়ার্থের দুই-তৃতীয়াংশ সাধারণ এবং তৃতীয় শ্রেণীর কবিতা তাঁর প্রথম শ্রেণীর এক-তৃতীয়াংশ কবিতাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আর্নল্ড পাঠকদের সামনে তুলে ধরবার জন্য শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি নির্বাচন করে একটি সংকলন প্রকাশ করলেন। যোগ করলেন একটি ভূমিকা। ঘোষণা করলেন, কবি হিসাবে ওয়ার্ডসওয়ার্থের স্থান শেক্সপীয়র ও মিল্টনের পরেই। আর্নল্ডের একক প্রচেষ্টায় তাঁর কবিখ্যাতি ধীরে ধীরে সুপ্রতিষ্ঠিত হলো। আর্নল্ড যে কবিতাগুলি শ্রেষ্ঠ বলে নির্বাচন করেছিলেন, আজ পর্যন্ত মোটামুটি সেই মান স্বীকৃতি পেয়ে আসছে।

রচনাকাল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রথম শ্রেণীর প্রায় সব কবিতা রচিত হয়েছে ১৮০৮ সালের মধ্যে। এরপরও তিনি বিয়াল্লিশ বছর জীবিত ছিলেন এবং কবিতা লিখেছেন প্রচুর পরিমাণে। এদের মধ্যে অনেক লাইন বা কয়েকটি স্তবক হয়তো প্রথম শ্রেণীর কাব্যগুণে সমৃদ্ধ, কিন্তু সমগ্রভাবে বিচার করলে এদের মান যে উঁচু—তা বলা চলে না।

কবির প্রতিভা ম্লান হবার কারণ কী? তিনি যে আদর্শ, হৃদয়াবেগ এবং নবীন মন নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যে সব গুণ তাঁর রচনাকে করেছিল প্রাণবন্ত, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নানা ঘাত-প্রতিঘাতে তারা মলিন হয়ে গেল। কবিতাকে উদ্দীপ্ত করবার মতো সজীব প্রাণাবেগ আর ছিল না। ধীরে ধীরে গতানুগতিকতা কবির জীবন আচ্ছন্ন করতে লাগল। ১৮০৫ সালে ভাই জনের মৃত্যুর পর থেকে ওয়ার্ডসওয়ার্থের জীবনে পরিবর্তনের সূত্রপাত হলো। মনের উদারতা, আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি বিরূপতা, স্বাধীনতাপ্রীতি ইত্যাদি ক্রমশ অর্থহীন হয়ে উঠল।

ওয়ার্ডসওয়ার্থকে একদিন দেখা গেল নিয়মিত গির্জায় উপাসনাকারীদের একজন।' নেপোলিয়ন তাঁকে হতাশ করলেন, আর সেই সঙ্গে দূর হলো তাঁর স্বাধীনতার প্রতি পূজার মনোভাব। অবশ্য তিনি ভেনিসের, সুইজারল্যাণ্ডের এবং হাইতির নিগ্রো নেতার স্বাধীনতা হারানোর জন্য বিলাপ করেছেন, কিন্তু তাঁর স্বদেশবাসীরা যে ভারতকে পরাধীন করেছে—তার জন্য কোনো বেদনা প্রকাশ করেননি। জীবনের শেষ ত্রিশ বছর ওয়ার্ডসওয়ার্থ ছিলেন ঘোর রক্ষণশীল। পার্লামেণ্টের গণতান্ত্রিক সংস্কার, সর্বসাধারণের ভোটাধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ইত্যাদি তিনি পছন্দ করতেন না। বন্ধু কোলরিজকেও তিনি দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন কঠোর ব্যবহারে। যে রোমাণ্টিক যুগের প্রবর্তক হিসাবে 'লিরিক্যাল ব্যালাড্‌স্'কে চিহ্নিত করা হয়—সেই ধারার পরবর্তী ধারক বায়রন, শেলি, কীটস প্রমুখ কবির প্রতি তাঁর কোনো সহানুভূতি ছিল না। বায়রন ও স্কটের জনপ্রিয়তা ওয়ার্ডসওয়ার্থের বই বিক্রির এমনই অন্তরায় হয়েছিল যে, সরকারের কাছে আবেদন করে তাঁকে চাকরি নিতে হয়েছে। অবশ্য চাকরি শুধু নামে, আসলে পেনশনের মতোই। সাদের মৃত্যুর পরে ১৮৪৩ সালে তাঁকে পোয়েট লরিয়েট নিযুক্ত করা হয়।

জীবনের শেষ পর্বে ওয়ার্ডসওয়ার্থের জীবনে এমন কোনো বৈশিষ্ট্য ছিল না, যা তাঁর রচনাকে ঐশ্বর্যান্বিত করতে পারে। কবির স্থির, গতানুগতিক জীবন তাঁর রচনাকে কাব্যরসে সঞ্জীবিত করতে বহুলাংশে ব্যর্থ হয়েছে। কবির দ্বিশত-জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণ করা যেতে পারে যে, তাঁর জীবনের সঙ্গে রয়েছে রচনার অচ্ছেদ্য যোগ। জীবনের মান দিয়েই তাঁর কবিতার মান নির্দিষ্ট হবে।

□ দুর্নীতির বিরুদ্ধে লেখক □

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজী যখন যারবেদা জেলে ছিলেন, তখন অনেক বই পড়েছেন। একটি বই তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। এটি হল আপটন সিনক্লেয়ারের 'ওয়েট প্যারেড' ('Wet Parade')। সিনক্লেয়ার এই উপন্যাসে আমেরিকায় মদ্যপানের সামাজিক দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই ধরনের আলোচনা গান্ধীজীর নিকট বিশেষ প্রিয় ছিল, সুতরাং কাহিনীর আবেদন স্বাভাবিকরূপেই তাঁর অন্তর স্পর্শ করে। তিনি বলেছেন, 'সিনক্লেয়ার সমাজের বিশেষ কল্যাণ করছেন। তিনি একটির পর একটি সামাজিক পাপের উপর আলোকপাত করে চলেছেন।'

'ওয়েট প্যারেড' তাঁর এত ভালো লেগেছিল যে, তিনি বইটি বল্লভভাই প্যাটেল ও পুত্র দেবদাসকে পড়তে বলেছিলেন। রাজাজীকেও বলেছিলেন, কিন্তু 'ওয়েট প্যারেড' তাঁর ভালো লাগেনি। তাঁর মতে এ বই প্রচার, শিল্পকর্ম নয়। এই সমালোচনার উত্তরে গান্ধীজী লিখেছিলেন, 'মনে হয় রাজাজীর আমেরিকান লেখকদের সম্বন্ধে বিরূপতা আছে। আমি হার্ডি বা জোলার লেখা পড়িনি। কিন্তু আপটন সিনক্লেয়ার অবজ্ঞা করবার মতো লেখক নন। শুধু প্রচার আছে বলেই কোনো উপন্যাসকে উপেক্ষা করা যায় না। ...'আঙকল টম্‌স্‌ কেবিন'-এ প্রচারের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট ; কিন্তু এর শিল্পের দিকটি অননুকরণীয়।'

সামাজিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে সিনক্লেয়ারের তীব্রতর আক্রমণ পাওয়া যায় তাঁর অন্য কয়েকটি উপন্যাসে। 'দি জাঙ্গল' (১৯০৬) মাংস-প্যাকিং শিল্পের বিরুদ্ধে আঘাত করেছে ; 'কিং কোল' (১৯১৭)-এ উদ্ঘাটিত হয়েছে তৈলশিল্পের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। সিনক্লেয়ারের অন্য বইগুলিও এমনি এক-একটি দুর্নীতিকে কেন্দ্র করে রচিত।

লেখক এতটা সমাজ-সচেতন হলে আর্টের মর্যাদা রক্ষা পায় কিনা সেটাই গান্ধীজী ও রাজাজীর মধ্যে বিতর্কের বিষয়। 'আর্ট ফর আর্টস সেক'-এর প্রশ্ন। শিল্পসত্তাকে অক্ষুণ্ণ রেখেও লেখকরা সামাজিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে দাঁড়াতে পারেন, তার দৃষ্টান্ত আছে। লোকের সামনে সত্য ও ন্যায়ের আদর্শ যেমন জোরালো করে তুলে ধরবার ক্ষমতা লেখকদের আছে, অন্যের তেমন নেই। আর এর জন্য যে মহৎ শিল্পকর্মকে বলি দিতে হবে—এমন কথাই বা আসবে কেন? জোরালো ভাষায় পুস্তিকা লিখলেও তা যে কত কার্যকর হতে পারে—তার প্রমাণ এমিল জোলার পুস্তিকা 'I Accuse' (1898)। ফরাসী গোলন্দাজ বাহিনীর এক অফিসারকে

অন্যায়ভাবে শাস্তি দেবার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন জোলা। সেই অফিসারের নাম—আলফ্রেড ড্রেফুস—ইতিহাসে অমর হয়ে গেছে। সামরিক বিভাগের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনায় জোলার শাস্তি হয়েছিল। কিন্তু তাতে তিনি দমেননি। জোলার একার প্রতিবাদে সমগ্র ফ্রান্স কেঁপে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত সত্য উদ্ঘাটিত হলো এবং মুক্তি পেলেন ড্রেফুস।

ড্রেফুসের কাহিনী নিয়ে অনেক বই লেখা হয়েছে। সেই কাহিনী জোলার নামের সঙ্গে জড়িত হওয়ায় প্রচার অনেক বেশী হয়েছে এবং জনসাধারণের আগ্রহ বেড়েছে। এখানে সেই সুপরিচিত কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করবার প্রয়োজন নেই। আর-একজন খ্যাতনামা লেখক শুধু কলমের সাহায্যে কেমন করে একটি অন্যায়ের প্রতিকার করতে সমর্থ হয়েছিলেন তার কথা এখানে বলব।

বলছি জোনাথান সুইফ্‌টের কথা। তাঁর লেখা 'গালিভার্স-ট্র্যাভেলস' বিশ্ব-সাহিত্যের একটি ক্লাসিক। সামাজিক জীবনে ও ধর্মজীবনে যত অন্যায় ও অসঙ্গতি তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, তাদের প্রতি তীক্ষ্ম বিদ্রুপবাণ হেনেছেন 'গালিভার্স ট্র্যাভেলস'-এ। প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থে মানবজাতিকেই স্যাটায়ার করা হয়েছে। কিন্তু এক-একটি বিশেষ দুর্নীতির ঘটনাকে আক্রমণ করেও সুইফ্‌ট তীক্ষ্ম ভাষায় পামফ্‌লেট লিখেছেন। তেমন একটি ঘটনার কথা বলা হলো।

১৭২১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আয়র্ল্যাণ্ডে ছোট মুদ্রার খুব অভাব দেখা দেয়। দৈনন্দিন লেনদেন একটা সমস্যার ব্যাপার হয়ে ওঠে। জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ; ব্যবসা-বাণিজ্যেও বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা দেখা দিল। সুতরাং আইরিশ সরকার ইংলণ্ডে আবেদন জানালেন প্রতিকারের জন্য। আয়র্ল্যাণ্ড থেকে কত বিষয়ে কত আবেদন পাঠানো হয়েছে, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট তাতে কর্ণপাতও করেননি। কিন্তু আশ্চর্য, এবার খুব তাড়াতাড়ি প্রতিকারের ব্যবস্থা হলো। উইলিয়াম উড নামে এক ব্যক্তি আয়র্ল্যাণ্ডে ব্যবহারের জন্য তামার মুদ্রা নির্মাণের একচেটিয়া অধিকার পেল।

উডের পক্ষে সনদ দেওয়া হলো ১৭২২ সালের ১২ই জুলাই। এই সনদে উডকে পরবর্তী চৌদ্দ বছর ৩৬০ টন বিভিন্ন মানের তামার মুদ্রা তৈরী করবার অধিকার দেওয়া হলো। এইসব মুদ্রার মোট মূল্য হবে ১,০৮,০০০ পাউণ্ড। এই সনদে আরও বলা হলো যে, এক পাউণ্ড ওজনের তামা থেকে উড তিরিশটি এক পেনি মুদ্রা তৈরী করতে পারবে। ইংলণ্ডে কিন্তু সমান ওজনের তামা দিয়ে তৈরী করা হয় তেইশটি পেনি। শুধু এই পার্থক্যের জন্যই উডের চৌদ্দ বছরে চল্লিশ হাজার পাউণ্ড লাভ হবার কথা। এই যে সব চুক্তি হলো, সে সম্বন্ধে আইরিশ পার্লামেণ্টকে কোনো কথাই আগে জিজ্ঞাসা করা হয়নি। তাছাড়া উডকে প্রচুর পরিমাণে টাকা পাইয়ে দেবার ষড়যন্ত্রটা বুঝতে কষ্ট হয় না। আর, আয়র্ল্যাণ্ডের এত তামার মুদ্রার দরকারও নেই। আইরিশ সরকার তাদের উপরে এরকম সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়াটা পছন্দ করেননি। জনসাধারণ তো অসন্তুষ্ট হয়েছেই। তাদের আশঙ্কা হলো, উডের

হাতে মুদ্রা তৈরীর ক্ষমতা হস্তান্তরিত করবার ফলে মুদ্রার মূল্য হ্রাস হবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। দেশের সরকারেরই তো মুদ্রা নির্মাণের একচেটিয়া অধিকার! কোনো গূঢ় কারণ ছাড়া সে অধিকার সরকার নিশ্চয়ই ছেড়ে দেননি।

সেই কারণটি প্রকাশ হয়ে পড়তে দেরি হলো না। প্রথম জর্জের প্রণয়িনী ডাচেস অব কেন্ডলকে ১০,০০০ পাউন্ড ঘুষ দিয়ে উড কনট্র্যাক্ট পেয়েছে। জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠল। দু-একটি পুস্তিকাও লেখা হলো এই নিয়ে। সুইফ্‌ট প্রথমে এ ব্যাপারে বড় একটা মন দেননি। 'গালিভার্স' নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু চারদিকের আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় আকৃষ্ট হলেন সুইফ্‌ট। উডের সনদের বিরুদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলবার জন্য সুইফ্‌ট ছড়া, একপাতার হ্যান্ডবিল, পুস্তিকা প্রভৃতি ছাপিয়ে আয়র্ল্যান্ডের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে লাগলেন। তাঁর ছড়া পথে-রেস্তোরাঁয়, ধনীর প্রাসাদে সর্বত্র গাওয়া হত। কিন্তু সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিল ছদ্মনামে লেখা 'Drapier's Letters'। ড্রেপিয়ারের প্রথম চিঠি বের হয় ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে। পুস্তিকার নাম ছিল—'A Letter to the shop-keepers, tradesmen, Farmers and common-people of Ireland...by M. B. Drapier.'

একজন সমালোচক বলেছেন যে, ড্রেপিয়ারের চিঠিতে যেরূপ বক্তৃতার ভঙ্গি ও ভাষা পাওয়া যায়, ডিমোসথিনিসের পর অন্য কারো লেখায় তা পাওয়া যায় না। একটু নমুনা দেওয়া যাক। লেখক প্রশ্ন করেছেন: 'আয়র্ল্যান্ডের অধিবাসীরা কি ইংরেজদের মতো স্বাধীন হয়ে জন্মগ্রহণ করেনি? তারা কি একই রাজার প্রজা নয়? তাহলে কি আমি ইংলণ্ডে স্বাধীন, আর ছয় ঘণ্টার সমুদ্রপথ পার হয়ে আয়র্ল্যান্ডে এলেই পরাধীন?'

এইসব প্রশ্ন করে সুইফ্‌ট আয়র্ল্যান্ডের জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তুললেন। দ্বিতীয় পত্রে আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলা হলো: 'যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আয়র্ল্যান্ডের কোনো প্রতিনিধি নেই, সেই পার্লামেন্ট আয়র্ল্যান্ডের জন্য আইন বিধিবন্ধ করে কোন্ অধিকারে? আয়র্ল্যান্ডের সব বড় পদগুলি ইংরেজরা অধিকার করে আছে, আইরিশদের দায়িত্বপূর্ণ পদ দেওয়া হয় না।' ড্রেপিয়ার তারপর দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করে বলছেন, 'কিন্তু এই অবিচারের প্রতিকার তো তোমাদের হাতেই রয়েছে।...ঈশ্বরের, প্রকৃতির, দেশের এবং বিদেশের নিয়ম অনুসারে তোমরা ইংলণ্ডের ভাইদের মতোই স্বাধীন ও মুক্ত।...শাসিতের সম্মতি ছাড়া শাসনের নামই দাসত্ব।'

গভর্নমেন্ট এই চিঠিকে রাজদ্রোহজনক সিদ্ধান্ত করে মুদ্রাকরকে গ্রেপ্তার করে জেলে রাখলেন। লেখকের সন্ধান পাবার জন্য তিনশ' পাউন্ড পুরস্কার ঘোষণা করা হলো।

ড্রেপিয়ার সক্রিয় প্রতিরোধে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে একটি চিঠিতে লিখলেন, যদি একশ পাউণ্ডের মধ্যে এক ফার্দিং উডের মুদ্রা আমাকে দেবার চেষ্টা করা হয়, তাহলে দস্যুর মতো আমি মিঃ উড ও তার সহকারীদের মাথা গুলি করে উড়িয়ে দিতাম। সিংহের কাছে নতিস্বীকার করায় মর্যাদার হানি হয় না ; কিন্তু মানুষ হয়ে ইঁদুরের খাদ্য হবার কথা কে ভাবতে পারে ?

ড্রেপিয়ার বলছেন, আমি যে কাজে নেমেছি তা আমার চেয়ে অনেক বেশী শক্তিধর লেখক যে আরো ভালো করে করতে পারতেন, তা জানি। কিন্তু বাড়ীতে যখন ডাকাত পড়ে, অনেক সময় দেখা যায় পরিবারের সবচেয়ে দুর্বল ছেলেটি সকলের আগে দরজা রুখতে এগিয়ে এসেছেন।

পৃথিবীতে বিভেদ-সৃষ্টির যত উপায় আছে—অর্থ তার মধ্যে অন্যতম। অথচ উডের মুদ্রা কেন্দ্র করে আয়র্ল্যাণ্ডের লোক একতাবদ্ধ হলো। ড্রেপিয়ার তাঁর এক চিঠিতে লিখেছিলেন, যারা উডের মুদ্রা প্রচলনে সহায়তা করবে তাদের নাম-ঠিকানা প্রচার করে দেওয়া হোক, লোকে চিনুক সেই দেশদ্রোহীদের। আর অমনি ছোট-বড় ব্যবসায়ীরা বিবৃতি দিতে লাগল, তারা কেউ উডের মুদ্রা গ্রহণ করবে না কিংবা খদ্দেরদের দেবে না।

ড্রেপিয়ার এরপর পার্লামেণ্টের সভ্যদের উদ্দেশ করে একটি চিঠি লিখলেন। এই চিঠিতে তিনি অনুরোধ জানালেন, যেন ঘুষ-দিয়ে-কেনা সভ্যদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও উডের প্রতারণার ব্যাপারটি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হয়। তিনি পার্লামেণ্টকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, 'That few politicians, with all their schemes, are half so useful members of a commonwealth as an honest farmer, who, by skilfully draining, fencing, manuirng, and planting hath increased the intrinsic value of a piece of land ; and thereby done a perpetual service to his country ; which it is a great controversy, whether any of the former ever did, since the creation of the world, but no controversy at all, that ninety nine in a hundred, have done abundance of mischief.'

অর্থাৎ একজন সৎ চাষী কমনওয়েলথের যত প্রয়োজনীয় সভ্য, পকেট-ভর্তি পরিকল্পনা থাকা সত্ত্বেও খুব কম রাজনীতিবিদ ততটা প্রয়োজনীয়। চাষী তার যত্নের দ্বারা একখণ্ড জমির মূল্য বাড়িয়ে তোলে। এইভাবে চাষীরা ক্রমাগত দেশের সেবা করছে। সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত রাজনীতিবিদ তেমন করে দেশের সেবা করেছে কিনা তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকতে পারে। কিন্তু একশ জনের মধ্যে নিরানব্বই জন পলিটিশিয়ান দেশের প্রভূত ক্ষতি করেছে—তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

পার্লামেণ্টের মেম্বারদের উদ্দেশ্যে লেখা এই চিঠির প্রচার তিনি বন্ধ করে

দিয়েছিলেন, কারণ ইতিমধ্যে উডের সঙ্গে মুদ্রা তৈরীর চুক্তি বাতিলের ঘোষণা করলেন সরকার। এরপর আর কারো জানতে বাকী রইলো না ড্রেপিয়ারকে। সুইফটকে জাতীয় বীরের সম্মান দেওয়া হলো। তাঁর ছবি সকলের ঘরে ঘরে; সংবাদপত্রে, সভায়, গৃহকোণের আলোচনায় তাঁর কথা। সুইফট প্রকাণ্ড বড় ঝুঁকি নিয়ে আয়র্ল্যাণ্ডের পক্ষে লড়েছেন। মুদ্রাকর নিজে জেলে গিয়েও সুইফটের নাম প্রকাশ করেনি। সেই কৃতজ্ঞতায় বিপদ বরণ করে তিনি ছদ্মবেশে জেলে গিয়েছেন মুদ্রাকরের সঙ্গে দেখা করতে। সুইফটের তেমন আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না। তথাপি অন্যায়ের প্রতিবাদ করবার জন্য পুস্তিকা ছাপিয়ে তিনি অনেক টাকা খরচ করেছিলেন।

তাঁকে নিয়ে জনসাধারণের এই উন্মত্ততায় সুইফট ভোলেননি। তিনি জানতেন এটা সাময়িক উন্মাদনা। কারণ আয়র্ল্যাণ্ডের পক্ষ সমর্থন করে তিনি তো আরো লিখেছেন। কিন্তু তেমন সাড়া জাগেনি, কোনো স্থায়ী আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। তাই দুঃখ করে 'আয়র্ল্যাণ্ডে' নামক কবিতায় বলেছেন,

'Remove me from this land of slaves,
Where all are fools, and all are knaves;
Where every knave and fool is bought,
Yet kindly sells himself for nought;
Where whig and Tory fiercely fight
Who's in the wrong, who in the right;
And, when their country lies at stake,
They only fight for fighting sake,...'

অর্থাৎ, এই ক্রীতদাসের দেশ থেকে নিয়ে যাও আমাকে; এদেশের লোক হয় নির্বোধ, না হয় শয়তান—যাদের কিনে রাখা হয়েছে। দেশ যখন সংকটের সম্মুখীন তখন নিছক কলহ করবার জন্যই কে ঠিক আর কে ভুল—এই নিয়ে ঝগড়া চলছে হুইগ ও টোরিদের মধ্যে......

অষ্টাদশ শতকের ইংলণ্ডে পাম্‌ফ্‌লেট লেখা অনেক খ্যাতনামা লেখকেরও ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কোনো বড় লোক বা রাজনৈতিক দলের পক্ষে লেখার জন্য টাকা দেওয়া হত। সুইফটের মতো শক্তিশালী লেখকের সহায়তা পাবার জন্য অনেকেই আগ্রহান্বিত ছিল। কিন্তু সুইফট কখনো টাকা নিয়ে লিখতে সম্মত হননি। নানারকম রাজনৈতিক বিতর্কের মধ্যে তিনি নিজেকে জড়িয়েছেন স্বেচ্ছায়, লিখেছেন অনেক রাজনৈতিক পুস্তিকা; কিন্তু কারো কাছ থেকে একটি পয়সাও নেননি। সকল প্রকার ঘুষকে তিনি ঘৃণা করতেন। কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে যখন তাঁর দিন কাটছিল, তখন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হার্লি তাঁকে টাকা দিয়ে নিজের পক্ষে লেখাতে চেয়েছিলেন। ঘৃণার সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন সুইফট।

□ লেখক ও চিকিৎসক □

জ্ঞানলাভের জন্য আমরা বই পড়ি, তাই বইয়ের এত মূল্য। জ্ঞান অর্জন ব্যতীত আনন্দ পাবার জন্যও আমরা বই পড়ি, গল্প উপন্যাস কাব্য নাটক প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় বই পড়ে আনন্দ পাই। সাধারণ গ্রন্থাগারের জনপ্রিয়তা এই শ্রেণীর বই সরবরাহের উপরই নির্ভর করে। সম্প্রতি য়ুরোপ-আমেরিকায় বইয়ের একটি নতুন ব্যবহার সুপরিকল্পিতভাবে করবার চেষ্টা চলছে। এটি হলো বইয়ের সাহায্যে রোগের চিকিৎসা। বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করে দেখেছেন রোগের প্রকৃতি বিচার করে রোগীকে উপযুক্ত বই পড়তে দিলে বিশেষ উপকার হয়।

বইয়ের সাহায্যে চিকিৎসাকে বলা হয় 'বিবলিওথেরাপি' বা 'The use of carefully selected books for therapeutic purposes.' মনের সঙ্গে দেহের যে ঘনিষ্ঠ যোগ আছে—একথা সর্বজনবিদিত। কোনো কারণে মনের ভারসাম্য বিচলিত হলে দেহ অসুস্থ হয়ে পড়ে। এবং অসুস্থ দেহের প্রভাবেও মন খারাপ হয়। দেহ ও মনের সম্পর্ক একান্তরূপে নিবিড়। কোনো একটি অসুস্থ হলে অন্যটিও সুস্থ থাকতে পারে না। এইজন্যে রোগীর মন প্রফুল্ল রাখতে ডাক্তাররা সর্বদা উপদেশ দেন। মনের প্রফুল্লতা দেহের রোগ দ্রুত উপশমে সহায়তা করে।

যে সব রোগ মনের উপরেই একান্তরূপে নির্ভরশীল সে সব রোগে বইয়ের সহায়তা খুব কার্যকর হতে দেখা গেছে। এখানে রোগীর মনকে শুধু প্রফুল্ল করবার প্রশ্ন নেই; যে কারণে রোগী ভারসাম্য হারিয়েছে, যে কারণে রোগীর ভাবাবেগ ক্ষুব্ধ হয়েছে—সেই কারণ দূর করবার মতো উপযুক্ত পুস্তক নির্বাচন করে পড়তে দিতে হবে। অর্থাৎ কেউ যদি ভয় পেয়ে রোগগ্রস্ত হয়, তাকে দিতে হবে এমন বই—যা থেকে নির্ভীকতা আসবে; হতাশ রোগীকে আশা-সঞ্চারক বই দিতে হবে; অকারণ ঈর্ষা ও সংকীর্ণতায় যার মন পীড়িত, তাকে এমন বই দেওয়া চাই—যার বিষয়বস্তু উদার মনোবৃত্তি সৃষ্টির সহায়ক।

বইয়ের সাহায্যে রোগের চিকিৎসা যদিও বিশেষজ্ঞরা বর্তমানে আরম্ভ করেছেন, তথাপি রোগ আরোগ্যে বইয়ের উপযোগিতা সম্বন্ধে বহু পূর্ব থেকেই পণ্ডিতরা সচেতন ছিলেন। প্লিনি প্রায় দু'হাজার বছর আগে বলেছেন যে, পৃথিবীতে এমন কোনো বেদনা নেই যা সাহিত্যগ্রন্থ উপশম করতে পারে না। প্লিনি খেতে বসলে তাঁকে অন্য কেউ বই পড়ে শোনাতো। খাবার সময় বই থেকে কোনো অংশ পড়ে শোনালে তাঁর হজম ভালো হত। কোনো কারণে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হলেই বদহজমে ভুগতেন। ইতালিয়ান কবি পেত্রার্ক রোজ নিয়মিত বই পড়তেন। বই

না পড়লে সে দিনটা শরীর ভালো থাকত না। পেত্রার্কের বন্ধুরা দেখলেন, এমন অভ্যাস তো খুব খারাপ। বই পড়ার নেশা থেকে তাঁকে মুক্ত না করতে পারলে মঙ্গল নেই। এক বন্ধু একদিন তাঁর বইয়ের আলমারির চাবিটি নিয়ে গেল। বই পড়তে না পেরে প্রথম দিনটা পেত্রার্কের খুব অস্বস্তিতে কাটল। দ্বিতীয় দিন মাথার বেদনায় ভুগলেন সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত। তৃতীয় দিন সকাল থেকে তাঁর জ্বর আরম্ভ হলো। বন্ধু অপ্রস্তুত হয়ে ফিরিয়ে দিয়ে গেল আলমারির চাবি।

আমেরিকান সাহিত্যিক ও শারীরতত্ত্ববিদ ওলিভার ওয়েণ্ডেল হোমস লাইব্রেরিকে বলেছেন 'মানসিক রোগের ডাক্তারখানা'। ইংরেজ কথাসাহিত্যিক ও নাট্যকার বুলওয়ার-লিটন বুঝতে পেরেছিলেন যে, যথেচ্ছভাবে বই পড়লে রোগ উপশমের আশা নেই। রোগ অনুসারে পুস্তক নির্বাচন করতে হবে ; আবার রোগীর মানসিক প্রকৃতির সঙ্গে বইয়ের সুর যাতে মেলে সেদিকেও দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। লিটন দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উল্লেখ করেছেন যে, সর্দি হলে হালকা ধরনের বই পড়লে উপকার হবে ; গভীর বেদনায় মন যখন মুষড়ে পড়ে তখন ভালো জীবনী-গ্রন্থ পড়া উচিত। আর তাঁর মতে বাইবেল হলো সর্বরোগের ওষুধ।

এসব কথা উদ্ভট মনে হতে পারে। কিন্তু অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি এ সম্বন্ধে তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লিখে গেছেন। সুতরাং রোগ আরোগ্যে বই যে সহায়তা করতে পারে, সে কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বুলওয়ার-লিটন লিখেছেন ডঃ জনসনের বন্ধু শ্রীমতী পিয়োজ্জির (শ্রীমতী থ্রেইল নামে অধিক পরিচিত) আত্মচরিত পড়ে তাঁর ইনফ্লুয়েঞ্জা সেরে গিয়েছিল। এই আত্মচরিতে ডঃ জনসন ও সমসাময়িক অন্য ব্যক্তিদের সম্বন্ধে এত গল্প আছে যে বসওয়েলের জনসন-জীবনীর সঙ্গে এর তুলনা করা যায়। হ্যাজলিট নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন যে, ফীলডিং-এর 'টম-জোন্স' বদহজমের খুব ভালো ওষুধ। রবার্ট লুই-স্টিভেনসন ছিলেন চিররুগ্ন। ভুগতেন ক্ষয়রোগে। একবার তাঁর দাঁতের ব্যথা ও বুকের ব্যথা সাময়িকভাবে দূর হয়েছিল 'অ্যাডভেঞ্চারস অব শার্লক হোমস' পড়ে। ইংরেজ লেখক রিচার্ড ল্যা গ্যালিয়েন তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে জানিয়েছেন যে, টলস্টয়ের 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' হাঁপানির পক্ষে বিশেষ উপকারী। ভিক্টর হিউগোর রচনাবলীও এই রোগে ফলদায়ক, তিনি আরো বলেছেন যে, শেক্সপীয়র-পাঠ বাত-রোগ উপশম করে। আর্নল্ড বেনেট তাঁর দিনলিপিতে লিখেছেন যে, তিনি সস্তায় কয়েকটি নাটক কিনেছিলেন। সেগুলি পড়বার পর তিনি স্নায়ুশূলের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। ইংরেজ শিল্পী অব্রে বিয়ার্ডসলি কঠিন রোগের মধ্যেও স্তাঁদালের 'লাল-কালো' এবং নীটশের রচনাবলী পড়ে মন প্রফুল্ল রাখতে পেরেছিলেন।

পূর্বেই বলেছি, রোগ ও ব্যক্তিগত রুচি অনুসারে চিকিৎসার জন্য পুস্তক নির্বাচন করতে হয়। প্রত্যেক বইয়েরই একটি নিজস্ব মেজাজ আছে। সে মেজাজের সঙ্গে রোগীর মেজাজের খাপ খাওয়া চাই। ভুল বই হাতে পড়লে

উপকারের পরিবর্তে অপকারের সম্ভাবনা আছে। তার দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়। ল্যা গ্যালিয়েন বলেছেন যে, বাত-রোগে শেলি বা কীটস পড়তে দিলে রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাবে, এবং সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হবার আশঙ্কাও আছে। যক্ষ্মারোগীরা মেটারলিঙ্ক পড়তে চাইবে ; কিন্তু তাদের দেওয়া উচিত ফিলডিং, ডিকেন্স বা বালজাকের বই। এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ড তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছেন যে, কার্লাইলের 'ফরাসী-বিপ্লব' ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে আরোগ্য লাভের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বুলওয়ার-লিটন বাকলের 'সভ্যতার ইতিহাস' পড়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কোলরিজ অসুস্থ অবস্থায় বাইবেল পড়তে পারতেন না।

উপরে যে সব বইয়ের নাম উল্লেখ করা হলো, তারা ব্যক্তিবিশেষের নিকট অস্বস্তিকর হতে পারে, কিন্তু এ সব বই গুণবিচারে নিকৃষ্ট নয়। অন্য কোনো রোগী হয়তো এ বইগুলি পড়েই উপকৃত হবে। উপকার হওয়া বা না-হওয়া নির্ভর করে রোগীর মানসিক ঝোঁকের উপর। কবি ডন বলেছেন, 'To cast mine eye upon good authors kindles and refreshes the mind.' এই 'ভালো লেখকের' সংজ্ঞা এখানে আপেক্ষিক। সকলের নিকট সব লেখক ভালো নয়। আশ্চর্যের কথা এই যে, অধিকাংশ লোকই আলেকজান্দার দুমার রচনাবলীকে সকল শ্রেণীর রোগীর উপযোগী বলে মনে করেন। বিশেষ করে যে সব ক্ষেত্রে রোগ-নির্ণয় করা যায়নি, সেখানে দুমার বই ফলপ্রদ।

তরুণী কবি এলিজাবেথ ব্যারেট রোগে শয্যাশায়িণী ছিলেন। বিছানা ছেড়ে উঠে ঘোরাফেরা পর্যন্ত করতে পারতেন না। রবার্ট ব্রাউনিং-এর কবিতা পড়ে তাঁর মনে নতুন আশা জেগেছিল। ব্রাউনিং আশাবাদী কবি। দুঃখ বা হতাশার ছায়া তাঁর রচনায় তখন ছিল না!

তিনি লিখলেন ঃ

'God's in His heaven—
All's right with the world!'

চলচ্ছক্তিহীন এলিজাবেথ—ব্রাউনিং-এর কবিতা পড়ে এবং তাঁর সংস্পর্শে এসে এমন শক্তি লাভ করলেন যে, তিনি ব্রাউনিং-এর সঙ্গে বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়ে তাঁকে বিয়ে করলেন। এলিজাবেথের কবিচিত্তে ব্রাউনিং-এর রচনার আবেদন গভীর হয়েছিল বলেই এই অঘটন সম্ভব হয়েছে।

বইয়ের রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা সম্বন্ধে যে সব সাক্ষ্য উপরে দেওয়া হয়েছে, তা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নয়। অধিকাংশই প্রতিষ্ঠাবান লেখকদের মতামতের উদ্ধৃতি। কিন্তু গত কয়েক দশক যাবৎ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা চিকিৎসায় বইয়ের ব্যবহার আরম্ভ করেছেন। মানসিক রোগে, স্নায়ুর রোগে এবং যক্ষ্মায় বইয়ের সহায়তা কার্যকর হয়েছে। জেলখানার কয়েদীদের উপযুক্ত বই পড়িয়ে চরিত্র সংশোধনের চেষ্টায় আশাপ্রদ ফল পাওয়া গেছে। যারা অপরাধ করে তারাও একধরনের মানসিক ব্যাধিতে

আক্রান্ত। অবাধ্য, পড়াশোনায় অনিচ্ছুক 'দুষ্টু' ছেলেমেয়েদের বইয়ের সাহায্যে সংশোধন করা যাবে বলে মনোবিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন। এছাড়া আজকাল সাধারণ হাসপাতালগুলিতে খুব ভালো লাইব্রেরি থাকে। রোগ অনুসারে উপযুক্ত বই দিলে রোগীর যে উপকার হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। রোগ নিরাময়ের কথা বাদ দিলেও বই পড়বার কতকগুলি সুফল সুস্পষ্ট। বই পড়বার সময় রোগী রোগযন্ত্রণা ভুলে থাকে; নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দুশ্চিন্তা ও আতঙ্ক দূর হয়ে যায়; আর বই পড়বার জন্য যেটুকু শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম প্রয়োজন, সেটুকু রোগীর পক্ষে উপকারী। মৃত্যু ও রোগ সম্বন্ধে বই এবং গভীর বিষাদে মন পূর্ণ করবার মতো বই রোগীকে দেওয়া উচিত নয়।

রোগীর হাতে শুধু বই তুলে দিলে হয়তো ফল হবে না। খেলা, সঙ্গীত ও চিত্তবিনোদনের অন্যান্য ব্যবস্থার সঙ্গে পুস্তক-পাঠ যোগ করে দিলে অধিকতর উপকার লাভের সম্ভাবনা। বিচ্ছিন্নভাবে বই পড়তে দিলে পড়াটাই হয়তো বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। কারণ রোগীর পক্ষে একটানা দীর্ঘ সময় বই পড়া সম্ভব নয়।

নিউইয়র্ক হাসপাতালে মানসিক রোগের বিভাগে রোগীদের প্রথমে নির্বাচিত বই পড়তে দেওয়া হয়; তারপরে একটি বৈঠকের আয়োজন করে রোগীদের একে একে আমন্ত্রণ করা হয় পঠিত পুস্তকের সমালোচনা করবার জন্য। মানসিক রোগের চিকিৎসক উপস্থিত থাকেন বৈঠকে। সমালোচনার ধারা থেকে তিনি বুঝতে পারেন রোগীর মনের প্রবণতা কোন্ দিকে। এর ফলে রোগীর চিকিৎসার পন্থা নির্ধারণ করা সহজ হয়।

অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে যে, চিকিৎসায় বইয়ের ব্যবহারের ক্ষেত্র খুব সীমাবদ্ধ। শুধু সাক্ষর হলেই চলবে না; যে রোগী বইয়ের মধ্যে ডুবে যেতে না পারে তার ক্ষেত্রে উপকার হবার সম্ভাবনা কম।

কেউ কেউ মনে করেন যে, ভবিষ্যতে হয়তো এমন দিন আসবে যখন ডাক্তার প্রেসক্রিপশনে বিকৃতস্বাদ ওষুধের নাম না লিখে লিখবেন ভালো ভালো বইয়ের নাম। এখন ডাক্তারখানার আলমারিতে থাকে লাল-নীল-হলদে-বেগুনি ওষুধের শিশি। তখন থাকবে বই। বইগুলি সাজানো থাকবে রোগ অনুসারে। যে সব বই ইনফ্লুয়েঞ্জায় উপকারী সেগুলি একসঙ্গে রাখা হবে। লাইব্রেরিতে বইয়ের শ্রেণীবিভাগ করা হয় বিষয় অনুসারে। এখানে করা হবে রোগ অনুসারে।

পুস্তকপ্রেমীদের পক্ষে আশার কথা সন্দেহ নেই।

□ রবীন্দ্রনাথের একটি প্রিয় বই □

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন, 'এই অবোধবন্ধু কাগজেই বিলাতি পৌলবর্জিনী গল্পের সরস বাংলা অনুবাদ পড়িয়া কত চোখের জল ফেলিয়াছি তাহার ঠিকানা নাই। আহা! সে কোন সাগরের তীর! সে কোন সমুদ্রসমীরকম্পিত নারিকেলের বন! ছাগল-চরা সে কোন পাহাড়ের উপত্যকা! কলিকাতা শহরের দক্ষিণের বারান্দায় দুপুরের রৌদ্রে সে কী মধুর মরীচিকা বিস্তীর্ণ হইত! আর সেই মাথায়-রঙিন-রুমাল-পরা বর্জিনীর সঙ্গে সেই নির্জন দ্বীপের শ্যামল বনপথে একটি বাঙালী বালকের কী প্রেমই জমিয়াছিল?'

বালক রবীন্দ্রনাথকে যে বইটি এমন করে মুগ্ধ করেছিল তার পরিচয় অনেক বাঙালী পাঠকের নিকট অজ্ঞাত। বইটি ফরাসী ভাষায় লেখা; নাম 'পল ও ভার্জিনিয়া' ('Paul et Virginie')। লেখকের নাম বার্ণাদা দ্য সাঁ-পীয়ের। বাংলায় তিন-চারটি অনুবাদ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ 'অবোধবন্ধু' পত্রিকায় পড়েছিলেন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের মূল ফরাসী থেকে অনুবাদ।

সাঁ-পীয়েরের জন্ম ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে, মৃত্যু ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে। বৃত্তিতে ইঞ্জিনিয়ার, স্বভাবে চূড়ান্ত খেয়ালী। রুশোর সঙ্গে ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে সাক্ষাৎ হবার আগে থেকেই তাঁর ভক্ত। 'প্রকৃতি মানুষের সবচেয়ে বড় বন্ধু ও শিক্ষক' —রুশোর এই মতবাদে সাঁ-পীয়েরের ছিল অবিচল আস্থা। প্রকৃতির কাছ থেকে দূরে সরে গেলে, তাকে অগ্রাহ্য করলে শাস্তি পেতে হয়। তিনি এনসাইক্লোপীডিস্টদের বাস্তববাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর রচনায় রোমাণ্টিক ভাবালুতার প্রাধান্য।

কর্মোপলক্ষে ঘুরেছেন জার্মানী, রাশিয়া, মালটা। বেশ কয়েক বছর কাটিয়েছেন মরিসাস দ্বীপে। তখন এর নাম ছিল আইল দ্য ফ্রান্স, ফরাসী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। সাঁ-পীয়েরের কয়েকটি বইয়ের পটভূমিকা এই দ্বীপ। 'পল ও ভার্জিনিয়া'র কাহিনীর পটভূমিও প্রকৃতির লীলাভূমি মরিসাস। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে 'পল ও ভার্জিনিয়া' প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই জনপ্রিয়তা লাভ করে।

পাণ্ডুলিপি সমাপ্ত করে সাঁ-পীয়ের বন্ধুদের শুনিয়েছিলেন মতামতের জন্য। এক শিল্পী-বন্ধুর বাড়ীতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সাহিত্য সভা। সে সময়কার সব বড় বড় লেখকই উপস্থিত ছিলেন সভায়। 'পল ও ভার্জিনিয়া' পড়া শেষ হলো। কিন্তু কেউ কোনো মন্তব্য করলেন না। বরং তাঁদের আচরণে এটাই মনে হলো, লেখা কিছুই হয়নি। সাঁ-পীয়ের ভাবলেন, সত্যি তাঁর লেখা উতরায়নি। এটা রেখে লাভ কি? তখন সবাই চলে গেছে, তিনি পাণ্ডুলিপি পোড়াতে গেলেন। তাঁর

শিল্পী-বন্ধু দেখতে পেয়ে বাধা দিলেন। বললেন, ওদের কথা জানি না। আমার খুব ভালো লেগেছে। তুমি ছাপতে দাও, নিশ্চয় পাঠকদের ভালো লাগবে।

এই বন্ধুর উৎসাহে 'পল ও ভার্জিনিয়া' রক্ষা পেল।

কাহিনীর সারাংশ হল এই ঃ ফ্রান্সের এক অভিজাত পরিবারের কন্যা মাদাম দ্য ল্য তুর ভালোবেসে আত্মীয়স্বজনদের অমতে বিয়ে করলেন অখ্যাত পরিবারের সম্পদহীন এক যুবককে। গঞ্জনার হাত থেকে মুক্তি পেতে এবং অর্থোপার্জনের আশায় তাঁরা দেশত্যাগ করে চলে এলেন মরিসাসে। পোর্ট লুইয়ের পেছনে যে পর্বত দাঁড়িয়ে আছে তারই উপত্যকায় কুটির নির্মাণ করে বসবাস শুরু করলেন ওঁরা। এই প্রেমস্নিগ্ধ নিভৃত জীবনযাপনের সুখ বেশীদিন রইলো না। স্বামীর মৃত্যু হলো ; এক নিগ্রো ক্রীতদাসী ছাড়া মাদাম তুরের আর কোনো অবলম্বনই রইলো না। স্বামীর সন্তান এসেছে তার গর্ভে। একদিকে আনন্দ, অন্যদিকে আশঙ্কা। সন্তানকে মানুষ করবেন কি করে ?

ঈশ্বরের অনুগ্রহে সেই নির্জন পরিবেশে এক বান্ধবী পেলেন। তাঁর নাম মার্গারেট ; বিধবা, প্রায় তাঁর সমবয়সী। মার্গারেটের একটি ছোট ছেলেই জীবনের একমাত্র অবলম্বন, নাম পল। মার্গারেটও তাঁর মতো ভালোবাসার জন্য ফ্রান্স ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। দুই দুঃখী বিধবা পাশাপাশি দুটি কুটির বেঁধে বসবাস করতে লাগলেন। দুটি কুটির, কিন্তু তাঁদের জীবনযাত্রা এক পরিবারের মতোই। বাড়ীর সামনেকার পতিত জমি চাষ করে তার ফসল দিয়ে জীবন একরকম কেটে যায়।

কিছুদিন পরে মাদাম তুরের একটি মেয়ে হলো। নাম রাখলেন ভার্জিনিয়া। দেবকুমারীর মতো রূপ, সেই অপরূপ সৌন্দর্যসুধা পান করে গভীর বেদনার মধ্যেও তিনি কিছুটা সান্ত্বনা পেলেন।

ভার্জিনিয়া একটু বড় হবার পর থেকেই পলের সঙ্গিনী হলো। পল অল্প বয়স থেকেই চাষ-আবাদের কাজ শুরু করেছে। নিজের অজান্তে দুই পরিবারের দায়িত্বভার নিয়েছে সে। ভার্জিনিয়া তার সঙ্গে মাঠে যায়, পলের কাজ দেখে বসে বসে। কখনো একটু সাহায্য করে। অবসরের সময় দু'জনে বেড়াতে বের হয় কলাবাগানে, কমলালেবুর গাছের নীচে, পাহাড়ের বনে-জঙ্গলে, সমুদ্রের তীরে। ফুল ও ফল সংগ্রহ করে। পর্বতের সানুদেশে বসে বসে বীচিবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের রূপ দেখে চুপচাপ। তাদের ঘড়ি নেই, দিনে সময়ের ধারণা করে গাছের ছায়া দেখে ; রাত্রিতে চাঁদ ও তারার আকাশে অবস্থান দেখে। ঋতু ও মাসের পরিবর্তন বুঝতে পারে গাছের ফুল ও ফল দেখে। ওরা লিখতে-পড়তে শেখেনি। তারা প্রকৃতির সন্তান, জীবনের পাঠ নেয় প্রকৃতির কাছ থেকে। কিছু দূরেই বন্দর ; সেখানে আছে অনেক ফরাসী বাসিন্দা। সেখানে গেলেই আধুনিক জীবনের স্বাদ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেখানে যাবার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই ওদের।

ভার্জিনিয়া কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনের সীমানায় এসে পৌঁছেছে। পল স্বাস্থ্যোজ্জ্বল প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর যুবক। কোন এক অদৃশ্য আকর্ষণ তাদের কাছে টেনে আনে। দূরে থাকতে পারে না। প্রকৃতিকে তারা দু'জনেই এত ভালোবাসে; সেই প্রকৃতির সৌন্দর্যও আজকাল প্রায়ই ভুলে যায় একে অন্যের মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে। তারা জানে না এই আকর্ষণের নাম কী, এখানে নর-নারীর প্রেম দেখবার সুযোগ হয়নি তাদের।

মার্গারেট একদিন বললেন, ওদের বিয়ে দিলে হয়। দু'জনেই বড় হয়েছে।

মাদাম তুর বললেন, খুব ভালো হবে। আমি জানি পৃথিবীর আর কোনো লোকই পলের মতো ভার্জিনিয়াকে সুখী করতে পারবে না। কিন্তু—

—কিন্তু কি?

—আরও কিছুদিন পরে। ওদের বয়স এখনও খুব বেশী হয়নি। তাছাড়া আমরা বড় গরীব। বিয়ের পর নতুন করে সংসার পাততে হলে কিছু আয় দরকার। পল ভারতে যাক, সেখান থেকে কিছু দাস কিনে আনুক। তাদের বিক্রি করে বেশ কিছু টাকা পাবে। তারপর বিয়ে।

প্রস্তাব যখন পলের কাছে তোলা হলো তখন তার সম্মতি পাওয়া গেল না। সে বলল, এক অনিশ্চিত লাভের আশায় আমি বাড়ী ছেড়ে যাব না। ব্যবসা করতে হয় তো এখানেই করা যাবে।

আসলে অর্থের প্রতি পলের লিপ্সা নেই। তাব চেয়ে বড় কথা ভার্জিনিয়াকে ছেড়ে সে দূরে যাবে না।

এর বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই মাদাম তুর মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে বড় চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। তাঁর যদি মৃত্যু হয় তবে ভার্জিনিয়ার কি হবে? একটি পয়সা নেই যে অন্তত গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য নিশ্চিন্ত হতে পারেন। তাঁর এক বিধবা ধনী পিসিমা আছেন ফ্রান্সে। নিজের অবস্থা জানিয়ে তাঁকে চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু কোনো উত্তর নেই। অবশ্য উত্তর না আসারই কথা। যেভাবে সবার উপদেশ অগ্রাহ্য করেছেন তাতে রাগ হতেই পারে। তবু ভেবেছিলেন নিঃসন্তান পিসিমা হয়তো ভার্জিনিয়ার কথা জেনে তাকে দেখতে চাইবেন, তার লেখাপড়ার ব্যবস্থা করবেন। সম্পত্তির অন্তত একটা অংশ উইল করে দেবেন। এগারো বছর পর উত্তর এলো। লিখেছেন, যেমন কর্ম করেছো এখন তেমনি ফল পাচ্ছো। ঐ দ্বীপে তো অর্থ উপার্জনের নানা সুযোগ আছে শুনেছি। উদ্যম থাকলে তুমিও ধনী হতে পারবে। আশা করবার, ভরসা করবার আর কিছুই রইলো না।

তারপর, যখন ভার্জিনিয়ার সঙ্গে পলের বিয়ের কথা হচ্ছিল, তখন অকস্মাৎ পিসিমার আর একটি চিঠি এলো। কঠিন অসুখ করেছিল তাঁর, বাঁচার আশা ছিল না। মৃত্যুর ছায়া তাঁর কঠোর হৃদয়কে কোমল করেছে। লিখেছেন, মেয়েকে নিয়ে চলে এস ফ্রান্সে, সব ব্যবস্থা হবে। যদি স্বাস্থ্য বা অন্য কোনো কারণে তুমি দূরে

সমুদ্র-পথে পাড়ি দিতে সাহস না করো, তাহলে ভার্জিনিয়াকে পাঠাও। তাকে ভালো করে লেখাপড়া শেখাব, রাজ পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেব, আর আমার সব সম্পত্তি তো পাবেই।

মার্গারেট ভীতিবিহ্বল কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি আমাদের ছেড়ে চলে যাবে?

মাদাম তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, না, তোমাকে ছেড়ে কখনো কোথাও যাব না। এতদিন তোমার সঙ্গে কাটালাম, তোমার সামনেই মরতে চাই।

দু'জনের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। যাওয়া হবে না জেনে সবথেকে সুখী হলো ভার্জিনিয়া।

পরদিন দ্বীপের গভর্নর এলেন দেখা করতে। তিনিও পিসিমার কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছেন। মাদাম তুরকে গভর্নর একান্তে ডেকে বললেন, আপনার এমন সুন্দরী মেয়ে, তাকে জীবনে প্রতিষ্ঠার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। একটি জাহাজ দু-একদিনের মধ্যেই ফ্রান্স রওনা হবে। সেই জাহাজে ভার্জিনিয়া চলে যাক। পথে তাকে দেখাশোনার ব্যবস্থা আমি করব।

তারপর তাঁর ইঙ্গিতে একজন পিওন টাকাভর্তি একটি ছোট ব্যাগ রেখে দিয়ে গেল টেবিলে। গভর্নর সেটা দেখিয়ে বললেন, আপনার পিসিমা পাঠিয়েছেন যাবার খরচের জন্য।

গভর্নর চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ভার্জিনিয়া মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, মা, আমি যাব না।

গভর্নর বিকেলে পাদরীকে কথা বলতে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি ভার্জিনিয়াকে বললেন, এটা ঈশ্বরেরই অভিপ্রায় তুমি পিসিমার কাছে যাবে। জানি, এ জায়গা ছেড়ে যেতে তোমার কষ্ট হবে। কিন্তু এটা ঈশ্বরের আদেশ, লঙ্ঘন করা যায় না। তাছাড়া ভেবে দেখেছ, তোমার হাতে টাকা এলে কত দুঃস্থ গরীব-দুঃখীকে সাহায্য করতে পারবে। তোমার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের করুণা তাদের দ্বারে পৌঁছবে।

নতমস্তকে ধীরে ধীরে ভার্জিনিয়া অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, এই যদি ঈশ্বরের অভিপ্রায় এবং আপনাদের ইচ্ছা হয়, তাহলে আমি যাব।

দুই গাল বেয়ে জলের ধারা নেমে আসছে ভার্জিনিয়ার। সে রাত্রিতে কারোরই কিছু খাওয়া হলো না। রাত্রির অন্ধকারে পল ও ভার্জিনিয়া বাইরে বেরিয়ে এলো। কলাবাগানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে পল বিষাদখিন্ন কণ্ঠে বলল. তুমি তাহলে আমাদের ছেড়ে যাচ্ছ?

—ঈশ্বরের আদেশে যাচ্ছি। নিজের ইচ্ছায় কখনোই তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।

গভীর বেদনার সুর মূর্ত হয়ে উঠল ভার্জিনিয়ার প্রতিটি কথায়। পলের অভিমান দূর হলো না। সে বলল, কিন্তু তোমার কি সম্পত্তির জন্য একটুও লোভ নেই? হয়তো অর্থের সঙ্গে পাবে কোনো অভিজাত পরিবারের তরুণের বন্ধুত্ব। আমার তো তেমন বংশমর্যাদা নেই। হায় নিষ্ঠুর রমণী, একবার ভাবলে না, এখানে

আমার দিনগুলি কেমন করে কাটবে? শোনো, আমি তোমার সঙ্গে যাব। ক্রীতদাসের মতো তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব। কোনো কথাই শুনব না।

ভার্জিনিয়া ব্যথিত কণ্ঠে বলল, তুমি কেন বুঝতে পারছ না পল? আমি তো তোমার কথা ভেবেও যাচ্ছি। আমাদের সবাইকে খাওয়াবার জন্য তোমাকে যে কঠোর পরিশ্রম করতে হয় তার জন্য আমি প্রতিদিন গভীর কষ্ট অনুভব করি। যদি কিছু টাকা নিয়ে আসতে পারি তাহলে তোমার কষ্ট লাঘব হবে, আমরা সুখে-শান্তিতে থাকতে পারব, আমাদের বন্ধুত্ব হবে নিবিড়তর।

ভার্জিনিয়াকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে পল বারবার বলতে লাগল, আমি তোমার সঙ্গে যাব, কেউ ঠেকাতে পারবে না। তোমাকে ছাড়া বাঁচব না আমি।

ভার্জিনিয়ার মা যখন পলের সংকল্পের কথা শুনলেন তখন তিনি বললেন, বাবা, তুমিও যদি চলে যাও তাহলে আমাদের কে দেখাশুনা করবে?

একথা শুনে পল ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। পাগলের মতো চেঁচিয়ে বলল, তুমি আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবার ষড়যন্ত্র করেছ। সমুদ্র যেন ভার্জিনিয়াকে তোমার কাছে আর ফিরিয়ে না দেয়।

ভার্জিনিয়া ছুটে এলো তার কাছে। তিরস্কার করে বলল কি যা-তা বলছ। শপথ করছি, তোমার কাছে আবার আমি ফিরে আসব।

কান্নায় ভেঙে পড়ল পল।

তারপর নির্দিষ্ট দিনে ভার্জিনিয়ার জাহাজ ফ্রান্সের পথে পাড়ি দিল। পল পাহাড়ের চূড়ায় বসে সেই দিগন্তে বিলীয়মান জাহাজের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। দুপুর গড়িয়ে বিকেল, বিকেল হারিয়ে গেল সন্ধের অন্ধকারে, জাহাজ অদৃশ্য হয়ে গেছে কখন—তবু পল অপলক দৃষ্টিতে ভার্জিনিয়ার যাত্রাপথের দিকে চেয়ে অনড় হয়ে বসে রইলো।

লোকমুখে খবর পাওয়া গেল ভার্জিনিয়া নিরাপদে পৌঁছেছে। কিন্তু তারপর দু'বছর আর কোনো খবর নেই। হঠাৎ চিঠি এলো ভার্জিনিয়ার। আগে আরও চিঠি লিখেছিল মনে হয়, সম্ভবত ঠাকুরমার হাতে পড়ায় সেগুলি আসেনি। তিনি উপদেশ দিয়েছেন—মার নাম ভুলে যাও, এখানে কোনোদিন সে নাম উচ্চারণও করবে না। আর ভুলে যাও সেই হতচ্ছাড়া দ্বীপের জীবনের কথা। এখানে তোমার নবজন্ম, নতুন সমাজের মধ্যমণি হবে তুমি।

ভার্জিনিয়া লিখেছে: তাকে কনভেন্টে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে; বিলাসের জীবন যাপন করছে, কিন্তু হাতে একটি পয়সা দেওয়া হয় না। তবু অনেক করে পলের জন্য পাঠিয়েছে একটি ছোট্ট ব্যাগ-ভর্তি ফুলের বীজ। সেই ব্যাগের উপর চুল দিয়ে সেলাই করে দিয়েছে দুটি অক্ষর 'প' ও 'ভ'। পল দেখেই চিনল ভার্জিনিয়ার মাথার চুল। এমন সুন্দর সোনালী রেশমী চুল আর কার মাথায় থাকবে। পাগলের মতো বারবার সে অক্ষর-দুটির উপর চুমা দিতে লাগল, ছোট্ট

ব্যাগটি ভিজে গেল তার চোখের জলে।

এর কিছুদিন পরে দ্বীপে গুজব ছড়াল, ভার্জিনিয়ার শীগগীরই বিয়ে হচ্ছে ফ্রান্সের এক বড় ঘরে। উদভ্রান্ত পল একা-একা বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। মাঝে দুস্তর ব্যবধান, না হলে সে চলে যেতো ফ্রান্সে, জেনে আসত ভার্জিনিয়ার কাছ থেকে—অর্থের লোভ, সামাজিক মর্যাদার মোহ কি ভুলিয়ে দিল তোমার শপথ? ভুলে গেলে আজন্মের বন্ধু পলকে?

আবার কিছুদিন পরে খবর এলো, ভার্জিনিয়া ফিরে আসছে। বিয়ে হয়নি। গর্বে ও আনন্দে পলের বুক ভরে উঠল। সমৃদ্ধি ও মর্যাদার জীবনের এতবড় লোভ ত্যাগ করে ভার্জিনিয়া তার জন্যই ফিরে আসছে! পল রোজ খবর করে ফ্রান্স থেকে কোনো জাহাজ এলো কিনা। একদিন দূরে সমুদ্রের মধ্যে মাস্তুল দেখা গেল, ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ জাহাজটি চোখে পড়ল। পল ছুটে বন্দরে গেল। পাইলট পথ দেখিয়ে জাহাজ তীরে আনতে যাচ্ছে। তাকে গিয়ে বলল ভার্জিনিয়ার খবর করতে। কয়েক ঘণ্টা পরে পাইলট ফিরে এলো, জাহাজ কাল বন্দরে ভিড়বে। সে নিয়ে এসেছে ভার্জিনিয়ার চিঠি, মার কাছে লেখা। লিখেছে: ঠাকুরমা তার বিয়ে ঠিক করেছিলেন। কিন্তু সে বিয়েতে রাজী হয়নি বলে তাকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করে জাহাজে তুলে ফেরত পাঠিয়েছে।

ভোর হয়ে এসেছে। ভার্জিনিয়ার জাহাজ থেকে হঠাৎ বিপদসূচক সংকেত শোনা গেল। পল ছুটে গেল জাহাজ-বরাবর সমুদ্র-তীরে। গভর্নর এসেছেন একদল সৈন্য নিয়ে। সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠেছে, ঘূর্ণিঝড় দ্রুত এগিয়ে আসছে সমুদ্রের বুক থেকে। জাহাজের নোঙর ছেঁড়ার উপক্রম, টলমল করছে। বেশীদূরে নয়, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে জাহাজের সবকিছু, কিন্তু তীরে আসতে পারছে না। জাহাজ ও তীরের মধ্যে বড় বড় পাথরের চাঁই; তার উপর ভেঙে পড়ছে তালগাছের মতো উঁচু উঁচু ঢেউ। জাহাজ থেকে একে একে যাত্রীরা, নাবিকেরা সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। পল দেখতে পাচ্ছে ভার্জিনিয়া পেছনের ডেকে তীরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একজন নাবিক বলল, তোমাকে আমি তীরে পেঁছে দেব, ভয় নেই। কিন্তু তোমাকে কাপড়-টাপড় সব খুলে ফেলতে হবে। না হলে হাতে-পায়ে জড়িয়ে দু'জনেই মরব। ভার্জিনিয়া তা কিছুতেই পারবে না। বরং মৃত্যুবরণ করবে, তবু অপরিচিত পুরুষের চোখের সামনে বিবস্ত্র হতে পারবে না।

পল চেঁচিয়ে বলল—ভার্জিনিয়া, আমি তোমাকে নিয়ে আসতে যাচ্ছি। ভার্জিনিয়ার কাছে এ আশ্বাস পৌঁছয়নি। কিন্তু পল যখন সেই বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত, তখন কে একজন তাকে ধরে ফেলল। কিছুতেই যখন তাকে ধরে রাখা যাবে না, তখন তার কোমরে একটা দড়ি বেঁধে শক্ত করে কয়েকজন ধরে রইলো, আর পল গিয়ে সমুদ্রে নামল। অনেকদূর এগিয়ে গেল পল, ভার্জিনিয়ার মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। সে চিনতে পেরেছে পলকে। অকস্মাৎ দৈত্যের মতো একটা

ঢেউ পলের অচেতন রক্তাক্ত দেহটা বেলাভূমিতে রেখে গেল। আর একটা হিংস্র ঢেউ ডেকের উপর উঠে ভাসিয়ে নিল ভার্জিনিয়াকে। পরদিন তার দেহ পাওয়া গেল সমুদ্রের তীরে। যেন এতদিন পরে প্রবাস থেকে ফিরে নিশ্চিন্ত আরামে মায়ের কোলে ঘুমিয়ে আছে। তার ডানহাত মুষ্টিবদ্ধ। অনেক কষ্টে মুষ্টি খুলে পাওয়া গেল একটি লকেট, তাতে পলের ছবি আঁকা। পলের উপহার। ভার্জিনিয়া কথা দিয়েছিল, দেহে প্রাণ থাকতে পলের দেওয়া উপহার সে হাতছাড়া করবে না। কথা রেখেছে ভার্জিনিয়া।

দু'মাস পরে মৃত্যু হলো পলের। ভার্জিনিয়ার কবরের পাশেই তাকে কবর দেওয়া হলো। কোনো শিলালেখ দ্বারা কবরদুটিকে চিহ্নিত করা হয়নি। আজ মরিসাস দ্বীপে গেলে কেউ তাদের কবর নির্দেশ করতে পারবে না। ঘাসে-জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেছে। প্রকৃতির দুই সন্তান একাত্ম হয়ে গেছে প্রকৃতির সঙ্গে।

□ শেষ বই □

প্রথম বই লেখকের মনে যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করে, শেষ বইয়ে প্রায়ই তার অভাব দেখা যায়। প্রথম বই লেখকের সাহিত্য জগতে প্রবেশের পরিচয়পত্র; সাফল্যের প্রথম নিদর্শন। সারাজীবনের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও লেখকের শেষ বই প্রায়ই সাহিত্যের ইতিহাসে একটি নাম মাত্র হয়ে থাকে। সমগ্র জীবন যিনি লেখক হিসাবে মর্যাদা লাভ করেছেন, তাঁর শেষ বইও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবহেলিত হয়। নিছক যেন অভ্যাসের বশেই লিখেছেন, লেখার পশ্চাতে প্রেরণা নেই। তবু শেষ বইয়ের সঙ্গে লেখকের কত আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যক্তিগত জীবনের কত সুখ-দুঃখের কথা জড়িত থাকে। কয়েকটি শেষ বইয়ের কথা আলোচনা করলে এদিকটা স্পষ্ট হবে।

অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে শেষ বই লেখকের খ্যাতির কারণ হয়েছে। সফোক্লিস তো আশি থেকে নব্বুই বছরের মধ্যে যে সব নাটক লিখেছেন, তাদের উপরেই নাকি তাঁর খ্যাতি নির্ভর করছে।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দান্তে আলিঘিয়েরির কথা। যে মহাকাব্যের জন্য তিনি বিশ্বসাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন, সেই 'ডিভাইন কমেডি' তাঁর জীবনের শেষ রচনা। দান্তের প্রথম গদ্য গ্রন্থ (মাঝে মাঝে কবিতা আছে) 'নবজীবন' আত্মজীবনীমূলক। নয় বছর বয়সে মানসী বিয়াত্রিচের সঙ্গে কেমন করে দেখা হলো এবং তারপর থেকে কেমন করে বিয়াত্রিচকে জীবনের যা কিছু সুন্দর ও মহৎ তার আদর্শ হিসাবে সামনে রেখে নতুন জীবন লাভ করলেন—তারই বর্ণনা আছে এই গ্রন্থে। বিয়াত্রিচের সঙ্গে তাঁর মিলন হয়নি। বিয়াত্রিচের মৃত্যু হয় বিয়ের কিছুদিন পরেই—পূর্ণ যৌবনে। এ মৃত্যু দান্তেকে গভীরভাবে আঘাত করেছিল। সান্ত্বনা লাভের জন্য তিনি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করেন। এরই ফলস্বরূপ রচনা করেন 'দি ব্যাঙ্কোয়েট' (সম্পূর্ণ হয়নি)। লাতিন ভাষার পরিবর্তে ইতালিয়ান ভাষার ব্যবহারের সমর্থনে এবং রাজনীতি সম্পর্কে আরও দুটি বই লিখেছেন দান্তে। সর্বশেষ গ্রন্থ 'ডিভাইন কমেডি'তে দান্তের সারাজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, তাঁর কবিপ্রতিভা এবং গভীর জ্ঞান রূপলাভ করেছে। দান্তে এই মহাকাব্যের নাম দিয়েছিলেন 'দি কমেডি অব দান্তে আলিঘিয়েরি'। ষোড়শ শতক থেকে এর নাম বদলে হয় 'দি ডিভাইন কমেডি'। 'ডিভাইন কমেডি' তিন খণ্ডে বিভক্ত। এই তিন খণ্ডে নরক থেকে স্বর্গ পর্যন্ত ভ্রমণের অপূর্ব কাব্যমণ্ডিত বিবরণ আছে। দান্তের জন্ম হয়েছিল ফ্লোরেন্সে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ায় তাঁকে জীবনের অধিকাংশ সময় নির্বাসনে কাটাতে হয়। জীবনের শেষ কয় বছর 'ডিভাইন

কমেডি' রচনায় সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর আশা ছিল এই মহাকাব্যের গুণে মুগ্ধ হয়ে কর্তৃপক্ষ তাঁকে সসম্মানে ফ্লোরেন্সে ফিরে যেতে আহ্বান করবেন। কিন্তু সে আশা সফল হয়নি। র‍্যাভেনায় তাঁর মৃত্যু হলো; মৃত্যুর সময় তাঁর পড়ার ঘরে টেবিলের উপর পড়ে ছিল 'ডিভাইন কমেডি'র শেষ ক'টি সর্গের পাণ্ডুলিপি। অনেক বছর পরে র‍্যাভেনার কবর থেকে দান্তের দেহাবশেষ সসম্মানে তুলে নিয়ে যাবার জন্য ফ্লোরেন্টাইনবাসীরা চেষ্টা করেছে, কিন্তু র‍্যাভেনার অধিবাসীরা তাতে সম্মত হয়নি।

'ডন কুইক্সট'-এর লেখক সার্ভেন্টিস লিখতে শুরু করেন আটত্রিশ বছর বয়সে। এর আগে তিনি যুদ্ধ করতে গিয়ে বাঁ হাত হারিয়েছেন, শত্রুর হাতে বন্দী হয়েছেন, কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। ১৫৮৪ সালে বিয়ে করবার পর অর্থ উপার্জনের জন্য লিখতে আরম্ভ করেন। প্রথম প্রকাশিত হলো দীর্ঘ কাব্যগ্রন্থ; তারপর বিশ থেকে ত্রিশটি নাটক এবং অনেকগুলি ছোটগল্প লিখেছেন। এসব লেখা দিয়ে তাঁর অর্থের অভাব মেটেনি। কিন্তু দুই খণ্ডের ব্যঙ্গাত্মক উপন্যাস 'ডন কুইক্সট' থেকে অর্থ ও খ্যাতি দুই-ই লাভ করেছেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে। পনেরো বছরের মধ্যে এর দশটি সংস্করণ হয়। সে সময়ের পক্ষে এটা ছিল অভূতপূর্ব সাফল্য। এই সাফল্যের অর্থকরী দিকটায় আকৃষ্ট হয়ে একজন অজ্ঞাতনামা লেখক বেনামীতে 'ডন কুইক্সটের' দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করে। কাহিনী ও চরিত্রগুলিকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য সার্ভেন্টিস তখন নিজেই 'ডন কুইক্সটের' দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত করেন। এই খণ্ডের ছাপার কাজ দেখতে দেখতে শোথ রোগে সার্ভেন্টিসের মৃত্যু হয়। জীবনের শেষ গ্রন্থ দিয়েই সার্ভেন্টিস সাহিত্য জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।

বিখ্যাত ফরাসী ব্যঙ্গ-নাট্যকার মোলিয়েরের যে শেষ কমেডি রচনা করেছিলেন তার নাম 'দি ইমাজিনারি ইনভ্যালিড'। ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ করা হয়। এই নাটকে মোলিয়ের চিকিৎসকদের বিদ্রূপ করেছেন। নায়ক আরগাঁ ব্যাধি-কল্পনা-রোগে ভোগে। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কেন্দ্র করেই নাটক জমে উঠেছে। ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে, মোলিয়ের নিজে আরগাঁর পার্ট স্টেজে অভিনয় করতে করতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ব্যাধি-কল্পনা থেকে সত্যিকার অসুখ হয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি তাঁকে বাড়ী নিয়ে আসা হলো; অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা গেলেন।

শাতোব্রিয়াঁর শেষ বই তাঁর জীবনস্মৃতি—'মেময়র্স ফ্রম বিয়ণ্ড দি টুম'। বাস্তব ও কাব্যের এমন সুন্দর সমন্বয় আর কোনো আত্মজীবনীতে হয়েছে কিনা সন্দেহ। ফরাসী রোমাণ্টিক লেখকরা শাতোব্রিয়াঁর রচনার দ্বারা বিশেষরূপে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন—এঁদের মধ্যে লামারতিন, উগো, ফ্লোবেয়ার প্রমুখ আছেন। এবং এই প্রভাবের অনেকটাই এসেছে জীবনস্মৃতি থেকে। শাতোব্রিয়াঁর স্টাইলের সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় এই গ্রন্থে।

আলেকজান্দার দ্যুমা (বড়) বহু উপন্যাস, নাটক ও গল্প লিখেছেন। লিখেছেন টাকার জন্য। শোনা যায় অন্যের বই নিজের নামে ছাপিয়েছেন টাকার লোভে। তাঁর তিনটি উপন্যাস—'থ্রি মাস্কেটিয়ার্স', 'দি কাউণ্ট অব মণ্টিক্রিস্টো' এবং 'দি ব্ল্যাক টিউলিপ'—সকল দেশের গল্প-পাঠকের নিকটই সুপরিচিত। কিন্তু দ্যুমার শেষ বই উপন্যাস নয়, রন্ধনবিদ্যার অভিধান। সারাজীবন তিনি নাটক-গল্প-উপন্যাস লিখেছেন অর্থ-উপার্জনের তাগিদে, কিন্তু খাদ্য-অভিধান সংকলন করেছিলেন ভালোবাসার প্রেরণায়। দ্যুমা ছিলেন জীবনবিলাসী, খাওয়া খুব ভালোবাসতেন। তাই জীবনের অন্য সব কাজ চুকিয়ে খাদ্যের অভিধান সংকলন আরম্ভ করেছিলেন। সংকলন শেষ করে ছাপাখানায় দেবার পর দ্যুমার মৃত্যু হয়। এ বই তিনি দেখে যেতে পারেননি। বইটির জনপ্রিয়তা বিংশ শতকের প্রথম তিন দশক পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

স্তাঁদালের শেষ বই 'দি চার্টারহাউস অব পার্মা'। অনেক সমালোচকের মতে এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। অবশ্য 'দি রেড অ্যাণ্ড দি ব্ল্যাক' অনেক বেশী পরিচিত। ফরাসী সাহিত্যে বাস্তবতা ও মনোবিশ্লেষণের সূত্রপাত করেন স্তাঁদাল। 'দি চার্টারহাউস অব পার্মা' ৪ঠা নভেম্বর থেকে ২৬শে ডিসেম্বর, ১৮৩৮—এই ৫২ দিনের মধ্যে লেখা। এক অভূতপূর্ব সৃষ্টির প্রেরণায় তিনি বইটি শেষ করেছেন। এই দ্রুতগতির জন্য কিছু কিছু ত্রুটি থেকে গেছে। বালজাক পাণ্ডুলিপি পড়ে বলেছিলেন প্রথম পঞ্চাশ পৃষ্ঠা বাদ দিতে এবং স্টাইলের সংস্কার করতে। পঞ্চাশ পৃষ্ঠা বাদ দিয়ে বালজাকের উপদেশ আংশিক রক্ষা করেছিলেন স্তাঁদাল।

'দি চার্টারহাউস অব পার্মা'র পটভূমিকা ইতালী। নায়ক ফেব্রিসের বিভিন্ন প্রেমের কাহিনী উপন্যাসের বিষয়বস্তু। 'দি রেড অ্যাণ্ড দি ব্ল্যাক'-এর মতো এখানে মনোজগতের উদ্ঘাটন নেই। বেরুবার পরই তিন হাজার কপি বিক্রি হয়েছিল।

'জার্মিনাল' ও 'নানা'র লেখক জোলার আরও একটি বড় পরিচয় আছে। তিনি সত্যের সমর্থনে নির্ভীকভাবে সংগ্রাম করেছেন। ক্যাপ্টেন আলফ্রেড ড্রেফুসকে মিথ্যা অভিযোগে পদচ্যুত করে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে। বছর তিনেকের মধ্যেই এমন সব তথ্য ফাঁস হলো যা থেকে স্পষ্টই বোঝা গেল যে ড্রেফুস সম্পূর্ণ নিরপরাধ। কিন্তু সেনাবিভাগের কর্তারা নিজেদের মুখরক্ষা করবার জন্য তাঁকে মুক্তি দিল না। সমগ্র ফ্রান্স এর জন্য ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। এই ক্ষুব্ধ জনসাধারণের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন জোলা। তিনি তখন ফরাসী সাহিত্যের প্রবীণ নেতা। সংবাদপত্রে জোরালো চিঠি লিখলেন ড্রেফুসকে সমর্থন করে। যারা সত্যিকার অপরাধী তাদের নাম উল্লেখ করে বললেন, আমি তোমাদের অভিযুক্ত করছি! ফলে তাঁর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করা হলো। জোলা তাই চেয়েছিলেন। ভেবেছিলেন আদালতে গেলে সুবিচার হবে। কিন্তু হলো না। বরং উল্টো মানহানির দায়ে তাঁকে মোটা টাকার জরিমানা এবং এক বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত

করা হয়। শাস্তি এড়াবার জন্য জোলা আশ্রয় নিলেন ইংলণ্ডে। জোলার মৃত্যুর চার বছর পরে ড্রেফুস সসম্মানে মুক্তি পেয়ে পূর্বপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

জোলার জীবনের শেষ ক'বছর এই ড্রেফুস-ব্যাপার নিয়েই কেটেছে। লেখার মধ্যেও এর গভীর প্রভাব পড়েছে। জোলা চার খণ্ডের একটি উপন্যাস রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন। উপন্যাসটির নাম 'ফোর গস্‌পেলস'। প্রথম খণ্ডের নাম 'ফেকাণ্ডিটি'; দ্বিতীয় খণ্ড 'লেবর'; তৃতীয় খণ্ড 'ট্রুথ' ড্রেফুস-কাহিনীর উপন্যাসরূপ। জোলা বলেছেন যে, এ বই লিখতে তিনি যত যত্ন নিয়েছেন—অন্য কোনো বইয়ের জন্য তা নেননি। লেখাটি তাঁর মনের মতো হয়েছিল। ৮ই আগস্ট, ১৯০২, 'ট্রুথ' সমাপ্ত হয়; তাঁর মৃত্যু হয় ২৯শে সেপ্টেম্বর। 'গস্‌পেলের' চতুর্থ খণ্ড লেখার সময় পাননি।

জোলার মতো প্রতিষ্ঠাপন্ন আর কোনো লেখক এমন সর্বশক্তি দিয়ে সক্রিয়ভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করেননি। তাই আনাতোল ফ্রান্স জোলা সম্বন্ধে বলেছেন. 'হি ওয়জ এ মোমেণ্ট অব হিউম্যান কনসায়েন্স।'

বিশ্বসাহিত্যে যে ক'টি গ্রন্থ অবিসংবাদী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, তার মধ্যে গ্যেটের 'ফাউস্ট' অন্যতম। এই মহান কাব্য-নাটক গ্যেটে আরম্ভ করেছিলেন তেইশ বছর বয়সে, সমাপ্ত করেছেন বিরাশি বছর বয়সে। প্রথম খণ্ডে (১৮০৮) মানুষের পার্থিব সুখের অভিজ্ঞতা লাভের জন্য আকুতি; এ কাজে মানুষের সহায়ক শয়তান। মানুষ নিজের সৃষ্ট নরকে জ্বলেপুড়ে মরে। 'ফাউস্টে'র দ্বিতীয় খণ্ড (১৮৩১) গ্যেটের শেষ গ্রন্থ। এই খণ্ডের নাটকীয় গুণ অপেক্ষাকৃত অনেক ম্লান। দার্শনিক চিন্তা এখানে প্রাধান্য লাভ করেছে। প্রথম খণ্ড ব্যক্তিকেন্দ্রিক; দ্বিতীয় খণ্ডে সমাজভাবনা বড় হয়ে উঠেছে। মার্গারেট ছিল ফাউস্টের প্রেয়সী; কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডের ট্রয়ের হেলেন ব্যক্তিবিশেষের দয়িতা নয়, সে প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রতীক। গ্যেটে দ্বিতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত কেন যে সীলমোহর করে রেখেছিলেন তার কারণ বোঝা যায় না।

মোপাসাঁর মৃত্যু হয় ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। ছোট ভাই হারভের পাগলা গারদে মারা যায় ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে। ভাইয়ের মৃত্যুর পর থেকেই মোপাসাঁ আশঙ্কা করছেন তিনিও পাগল হয়ে যাবেন। শরীর ভেঙে পড়ছে। তবু এরই মধ্যে তিনি আশ্চর্য সুন্দর চারটি গল্প লিখলেন। গল্পগুলি 'ইউসলেস বিউটি' নাম দিয়ে গ্রন্থাকারে বেরিয়েছিল। এটি তাঁর শেষ বই। মোপাসাঁ তাঁর প্রকাশককে লিখেছেন যে, এ বইয়ের অন্তর্ভুক্ত 'ইউসলেস বিউটি' গল্পটি তিনি যত গল্প লিখেছেন তার মধ্যে সবচেয়ে ভালো। এই গল্পটি খুব সম্ভব মেরি কাহনকে নিয়ে লেখা। মেরি ও তাঁর বোন ছিলেন প্যারিসের সেরা সুন্দরী। সকলের মুখে মুখে তাঁদের নাম। মার্সেল প্রুস্ত তাঁদের রূপের প্রশস্তি করেছেন। মেরির সঙ্গে মোপাসাঁর কিছুদিনের জন্য ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। যে রূপ শুধু জ্বালার সৃষ্টি করে, সংসারে

শান্তি আনে না, সেই রূপের ট্র্যাজেডিই গল্পের বিষয়বস্তু। সংকলনের আর একটি গল্পে—'কে জানে'—লেখকের ভবিষ্যৎ জীবনের ছায়া পড়েছে।

অস্কার ওয়াইল্ড এক নতুন সাহিত্য আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন। রচনার নতুনত্ব ছাড়া তাঁর নিজের চালচলন ছিল অভিনব। লম্বা চুল রাখতেন, পোশাক ছিল অদ্ভুত, আর বক্তৃতা দেবার সময় হাতে রাখতেন একগুচ্ছ ফুল। তিনি কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও নাটক লিখেছেন। তাঁর কমেডিগুলি মঞ্চে উল্লেখযোগ্য সাফল্যলাভ করেছিল। নাটকে ওয়াইল্ড যে ধারার সূত্রপাত করেন, বার্নার্ড শ'র রচনায় তারই পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়।

ওয়াইল্ডের অভিনব জীবনযাত্রা এবং নতুন ধরনের সাহিত্য-সৃষ্টির প্রয়াসকে ব্যঙ্গ করে একটি নাটক লেখা হয়েছিল। মার্কুইস অব কুইনসবেরির বিরুদ্ধে ওয়াইল্ড মানহানির মামলা এনেছিলেন। মামলায় জিৎ হলো না ; বরং এমন সব তথ্য প্রকাশ পেল যা থেকে আদালত সিদ্ধান্ত করলেন যে, ওয়াইল্ড সমমৈথুনের অপরাধে দোষী। এই অপরাধে তাঁর দু' বছর জেল হলো। জেলে বসে ওয়াইল্ড লিখেছেন শেষ বই 'ডি প্রোফান্ডিস'। প্রকাশিত হয়েছে ১৯০৫ সালে। বন্ধু লর্ড আলফ্রেড ডগলাসকে জেল থেকে যে দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন—'ডি প্রোফান্ডিস' তারই পরিমার্জিত সংস্করণ। এই বইয়ে তিনি জীবনের ভুল-ভ্রান্তি স্বীকার করে অনুশোচনা প্রকাশ করেছেন। জেলখানায় বসে তিনি দুঃখের শিক্ষা উপলব্ধি করেছেন, বুঝেছেন পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য মানুষকে শুধু ছলনা করে। লাঞ্ছনা ভোগ করেও তিনি নিরাশ হননি ; সমাজ যদি তাঁকে ত্যাগ করে তাহলে তিনি প্রকৃতির কোলে আশ্রয় নেবেন। এটাই তাঁর সান্ত্বনা।

দস্তয়েভস্কির শেষ উপন্যাস 'দি ব্রাদার্স কারামাজোভ' সম্প্রতি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনার স্বীকৃতি লাভ করেছে। মানুষের অন্তরে পাপপুণ্যের দ্বন্দ্বের এমন নিপুণ ছবি অন্য কোথাও দেখা যায় না। তৎকালীন রাশিয়ান সমাজের জীবন্ত ছবি এঁকেছেন লেখক। কাহিনীর তিন ভাই সমাজের তিনটি শ্রেণীর প্রতীক—সৈন্য, বুদ্ধিজীবী এবং ধার্মিক। দস্তয়েভস্কির উদ্দেশ্য ছিল 'দি লাইফ অব এ সিনার' নাম দিয়ে বিস্তৃত পটভূমিকায় এক বিরাট উপন্যাস লিখবেন। তারপর পাঁচ খণ্ড খুব বড় হয়ে যাবে দেখে কমিয়ে দু' খণ্ডের পরিকল্পনা করা হলো। কিন্তু মাত্র প্রথম খণ্ড –'দি ব্রাদার্স কারামাজোভ'—সম্পূর্ণ করতে পেরেছেন দস্তয়েভস্কি।

মৃত্যুর পূর্বে শেলি ইংরেজী সাহিত্যের অন্যতম শোকগীতি 'অ্যাডোনেইস' (১৮২১) সমাপ্ত করেন। কীটসের অকালমৃত্যু তাঁকে গভীরভাবে আঘাত করেছিল। কীটসের জন্য শোক এবং সমালোচকদের বিরুদ্ধে আক্রমণ—এই দুটি ধারা কাব্যে ফুটে উঠেছে। সমালোচকদের নিষ্ঠুর সমালোচনা কীটসের মৃত্যু ত্বরান্বিত করেছে, এই ধারণা থেকেই শেলি তাদের আঘাত করেছেন। কিন্তু শেলি জানতেন না যে যখন তিনি কীটসের মৃত্যুর বেদনায় উদ্বেল হয়ে শোকগাথা রচনা করছেন, তখন অলক্ষ্যে তাঁর

নিজের মৃত্যু এগিয়ে আসছে। কিছুদিন পরে শেলি সমুদ্রে ডুবে প্রাণত্যাগ করেন।

রবার্ট ব্রাউনিং-এর মৃত্যুদিনে তাঁর শেষ বই 'অ্যাসোল্যান্ডো' (১৮৮৯) প্রকাশিত হয়। শেষ বই হলেও ব্রাউনিং-এর স্বভাবসিদ্ধ সুদৃঢ় আশাবাদ এই কাব্যগ্রন্থেও জোরের সঙ্গে ঘোষণা করা হয়েছে। নিজের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, আমি কখনো পশ্চাতে তাকাইনি, বিপদের মেঘ কেটে যাবে—এই বিশ্বাস নিয়ে নির্ভয়ে এগিয়ে চলেছি।

স্যামুয়েল বাটলার এখন তাঁর একটিমাত্র উপন্যাসের জন্য পরিচিত। সে বইটি 'দি ওয়ে অব অল ফ্লেশ' (১৯০৩)। ভিক্টোরিয়ান আমলের একটি পরিবারের সঙ্কীর্ণতা ও নীচতার বাস্তব চিত্র এই বইয়ে পাওয়া যাবে। পরবর্তী অনেক লেখক এ বইয়ের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন। বাটলার দীর্ঘ বিশ বছর যাবৎ পরিশ্রম করে 'দি ওয়ে অব অল ফ্লেশ' সম্পূর্ণ করেছিলেন। কিন্তু ছাপিয়ে বেরুবার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়।

জেমস জয়েসের শেষ বই 'ফিনেগানস্ ওয়েইক' (১৯৩৯) দীর্ঘ সতেরো বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। এই উপন্যাসকে 'ইউলিসিসের' পরিপূরক বলা যেতে পারে। 'ইউলিসিস' নায়কের চেতন মনোজগতের কাহিনী; 'ফিনেগান' অবচেতন স্তরে আলোকসম্পাতের প্রচেষ্টা। এই কাহিনী রচনায় জয়েস ভাষা নিয়ে অভিনব পরীক্ষা করেছেন। নানা ভাষার শব্দ এনেছেন, পূর্বসূত্র ও প্রতীকের ছড়াছড়ি। পড়ে বোঝা কঠিন। একজন সমালোচক বলেছেন, ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে এই বইয়ের আলোচনা নিরর্থক, কেননা এর ভাষা ইংরেজী নয়।

শেষ বই যেসব ক্ষেত্রে কোনো-না-কোনো কারণে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে, তারই কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো। যেসব বইয়ের কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, অথচ খ্যাতনামা লেখকরা তাদের জনসাধারণের হাতে তুলে দিয়েছেন, সেসব বইয়ের উল্লেখ করে লাভ নেই। কারণ তেমন বইয়ের সংখ্যাই বেশী। মৃত্যুর পূর্বে লেখা বলেই অনেক সময় তাদের প্রতি লেখকের দুর্বলতা থাকে। কিন্তু পাঠকরা গ্রহণ করে না। জীবন সায়াহ্নে সেই এক করুণ ট্র্যাজেডি। যে যুগে একটি গ্রন্থ সম্পূর্ণ করতেই সমস্ত জীবন কেটে যেত (—যেমন বাল্মীকির 'রামায়ণ' তাঁর সারাজীবনের সাধনা—) তখন পড়ন্ত প্রতিভার স্বাক্ষর-বহনকারী দুর্বল রচনা পাঠকদের হাতে তুলে দেবার সুযোগ ছিল না।

□ দান্তে ও বিয়াত্রিচ □

বিশ্বসাহিত্যের অমর কাব্য 'দি ডিভাইন কমেডি'র লেখক দান্তে আলিঘিয়েরি সাতশ' বছর আগে ১২৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইতালীর ফ্লোরেন্স নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। সে সময় ইতালী অনেকগুলি নগর-রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সর্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকত। রোমান চার্চ এই পারস্পরিক কলহে উৎসাহ দিত নিজেদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে। তাছাড়া ছিল রাজনৈতিক দলাদলি। ইতালীর দুটি প্রধান বিবদমান দল ছিল গুয়েল্‌ফ্‌স্‌ এবং ঘিবেলাইন্‌স্‌। ফ্লোরেন্সের গুয়েল্‌ফ্‌স্‌ দলের আবার দুটি শাখা ছিল—সাদা আর কালো।

দান্তের জন্ম হয়েছিল গুয়েল্‌ফ্‌স্‌ দলভুক্ত এক অভিজাত পরিবারে। সেই সময়ের তুলনায় তাঁর শিক্ষার মান খুব উচ্চ ছিল। ধর্ম দর্শন সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে যা কিছু পড়বার ছিল, সবই তিনি সমাপ্ত করেছিলেন। তবে কাব্য পড়তে, আবৃত্তি করতে ও লিখতে তাঁর খুব ভালো লাগত অল্প বয়স থেকেই। কবিতা লেখা ও আলোচনার উদ্দেশ্যে কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে তিনি একটি গোষ্ঠী গড়ে তুলেছিলেন।

কিন্তু শুধুমাত্র বিদ্যাচর্চা ও কাব্যসাধনা করে তাঁর দিন কাটেনি। সমকালীন রাজনৈতিক আবর্তেও তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন। দান্তে দুটি সামরিক অভিযানে যোগ দিয়েছিলেন এবং ফ্লোরেন্স নগরীর শাসন-পরিষদের সভ্য হয়েছিলেন কিছুদিনের জন্য। পোপ অষ্টম বোনিফেস যখন ফ্লোরেন্সের উপর তাঁর দাবি জানালেন, তখন এই দাবির বিরুদ্ধে যাঁরা দাঁড়ালেন তাঁদের মধ্যে দান্তেও ছিলেন একজন। এই বিষয়ে পোপের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য দান্তে রোম যাত্রা করলেন। রোম পৌঁছবার পূর্বেই কিন্তু ফ্রান্সের রাজার ভাই চার্লস অব ভ্যালোয়কে পোপ ফ্লোরেন্সের শাসনভার দিয়ে দিলেন। ফ্লোরেন্সের নতুন সরকার দান্তেকে সুনজরে দেখলেন না। ১৩০২ খ্রীষ্টাব্দে দান্তেকে দেশ থেকে বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া হলো এবং তাঁর সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হলো। দান্তের স্ত্রী গেম্মা ছেলেমেয়েদের নিয়ে ফ্লোরেন্সেই রয়ে গেলেন। দান্তে তো ফ্লোরেন্সের বাইরে আগেই চলে গেছেন! সুতরাং তাঁর আর দেশে ফিরে আসা হলো না।

একা দান্তে নন, তাঁর মতো আরও কয়েকজন ফ্লোরেন্সের নাগরিককে নতুন সরকার দেশত্যাগে বাধ্য করেছেন। তাঁদের সঙ্গে মিলে দান্তে ফ্লোরেন্সকে মুক্ত করবার জন্য বিদ্রোহের পরিকল্পনা করলেন। এ খবর যখন ফ্লোরেন্সে পৌঁছল তখন কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করলেন—দান্তেকে ধরতে পারলে পুড়িয়ে মারা হবে। সুতরাং বিদেশে ঘুরে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া তাঁর আর পথ রইলো না। লুক্সেমবুর্গের সপ্তম

হেনরির সহায়তায় নিজের মনের বাসনা পূর্ণ করবার চেষ্টা করেছিলেন দান্তে। এই সম্পর্কে তাঁর চারটি চিঠি পাওয়া যায়। ফ্লোরেন্সে তাঁর ফিরে আসা সম্ভব হয়নি। তাঁর শেষ জীবন কাটে র‍্যাভেনায়। পড়া নিয়ে লেখা নিয়ে তাঁর সময় কেটে যেত ; র‍্যাভেনায় তিনি সম্মান পেয়েছেন, খ্যাতিলাভ করেছেন এবং বাইরে থেকে মনে হত তিনি শান্তিতেই আছেন। কিন্তু ফ্লোরেন্স থেকে নির্বাসিত হবার বেদনা তিনি কখনো ভুলতে পারেননি। ১৩২১ খ্রীষ্টাব্দে দান্তের মৃত্যুর পর ফ্লোরেন্সের অধিবাসীরা তাঁর দেহাবশেষ নিয়ে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু র‍্যাভেনাবাসীরা তাতে সম্মত হয়নি।

দান্তের পরিচয় তাঁর জীবনের কয়েকটি ঘটনার মধ্যে ধরা পড়ে না। বিজ্ঞান ও দর্শনে তিনি যেমন পারদর্শী ছিলেন, তেমনি ছিলেন সাহিত্যেও। দান্তে মধ্যযুগ ও রেনেসাঁসের মধ্যে সেতুস্বরূপ। শুষ্ক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না তিনি। তাঁর ছিল তীব্র অনুভূতি, অসামান্য ভাবাবেগ ও কল্পনাশক্তি। পৃথিবীর সকল মহৎ শিল্পীর মতোই তিনি একাধিক জগতে বাস করতেন। যে জীবনের কয়েকটি ঘটনার কথা উপরে বলা হয়েছে তা বাইরের জগৎ। এ জগতে রাজনীতিক দ্বন্দ্ব, বন্ধুদের সহায়তা, আশা, ব্যর্থতা, পারিবারিক দায়িত্ব ইত্যাদি সবই আছে। কিন্তু এসব একান্তরূপে বাইরের জিনিস।

আর এক জগৎ, অন্তরের জগতে তিনি ভাবলোকের বাসিন্দা। এ জগতের অধিষ্ঠাত্রী নায়িকা বিয়াত্রিচ। তাঁর কাব্যের প্রেরণা, অন্তরের আলোকবর্তিকা। ন' বছর বয়সে বিয়াত্রিচকে তিনি প্রথম দেখেন। দু'জনেই সমবয়সী। কিন্তু কেউ কারো সঙ্গে কথা বলেননি। অথচ দান্তের মনে সেই 'প্রথম দেখা' অবিস্মরণীয় হয়ে রইলো। বিয়াত্রিচ ন' বছরের বালকের মনে যে প্রেম জাগ্রত করল, তার প্রভাব জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। প্রেম আচ্ছন্ন করেছিল তাঁর পাণ্ডিত্য, স্বদেশপ্রীতি এবং জীবনের আর সব কর্তব্য।

ন' বছর পরে ফ্লোরেন্সের পথে আর একবার তাঁদের দেখা হয়। তরুণী বিয়াত্রিচের পরিধানে পবিত্রতার প্রতীক শুভ্র পোশাক, সঙ্গে দু'জন বয়স্কা মহিলা। এবারও তাঁদের মধ্যে কোনো কথা হলো না। লজ্জারক্তিম মুখ একবার তাঁর দিকে তুলে ধরেছিল বিয়াত্রিচ, তারপর নীরবে অনির্বচনীয় ভঙ্গিতে অভিবাদন জানিয়ে চলে গেল।

বিয়াত্রিচের সঙ্গে আর একবার মাত্র দেখা হয়েছিল। দান্তের নীরব পূজা সম্বন্ধে বিয়াত্রিচ অবহিত ছিল না। সিমন বার্দি নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে ১২৯০ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হয় বিয়াত্রিচের। কিন্তু মৃত্যু হয়নি দান্তের মানসলোকে। তাঁর কাছে বিয়াত্রিচ সৌন্দর্যের, পবিত্রতার এবং সকল মাধুর্যের চির-উজ্জ্বল প্রতীক।

বিয়াত্রিচের মৃত্যুর দু' বছর পরে দান্তে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মানস-প্রতিমাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখা। বাইরে একজন নারীকে সঙ্গিনী

করে হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রীকে আড়াল করা। মুখরা বদমেজাজী স্ত্রীর সঙ্গে কখনো তাঁর অন্তরের মিল হয়নি। দান্তের সুপ্রচলিত চিত্রে এক চির-বিরহীকে সহজেই চেনা যায়।

দান্তে তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'লা ভিটা নুভা' বা 'নবজীবনে' নিজের জীবনের কথা বলেছেন। গদ্যে-পদ্যে রচিত এই গ্রন্থ থেকে বিয়াত্রিচের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার এবং এই সাক্ষাতের প্রভাব জানতে পারি। সেন্ট অগাস্টিনের 'কনফেসান্স্'-এর পরে মধ্যযুগে এমন জীবনী আর লেখা হয়নি।

বিয়াত্রিচের অকালমৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে দান্তে বলেছেন যে, স্বয়ং ভগবান তাকে আহ্বান করে নিয়েছেন,

'Such an exceeding glory went up hence
That it woke wonder in the Eternal Sire,
Until a sweet desire
Entered Him for that lovely excellence,
So that He leade her to Himself aspire ;
Counting this weary and most evil place
Unworthy of a thing so full of grace.'

এই গ্রন্থে দান্তে তাঁর একটি স্বপ্নের কথা বর্ণনা করেছেন। তা থেকে বোঝা যায় বিয়াত্রিচের প্রতি তাঁর আকর্ষণ পার্থিব নয়। এই রহস্যময় স্বপ্নটি হলো এই: দান্তে দেখলেন, প্রেমের দেবতা বিয়াত্রিচকে আলিঙ্গন করে জোর করে তাঁর হৃদ্পিণ্ড খাইয়ে দিলেন তাকে। তারপর দু'জনে চলে গেলেন স্বর্গে। দান্তে পৃথিবীতে থেকে গেলেন বটে, কিন্তু তাঁর হৃদয় বিয়াত্রিচের সঙ্গে চলে গেছে স্বর্গে। দান্তে অঙ্গীকার করেছেন, ঈশ্বর সহায় হলে তিনি বিয়াত্রিচকে নিয়ে এমন কাব্য রচনা করবেন যা কোনো নারীকে নিয়ে কেউ কোনোদিন লেখেনি।

এই প্রতিশ্রুতির ফল 'দি ডিভাইন কমেডি'। দান্তে এই মহাকাব্যের নাম দিয়েছিলেন 'দি কমেডি অব দান্তে আলিঘিয়েরি'। এখানে কমেডি কথাটি তিনি প্রচলিত অর্থেই ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ, জীবনে যদিও বিয়াত্রিচের সঙ্গে মিলন হয়নি, পরলোকে মিলন হয়েছে। তাই তাঁর জীবন ট্র্যাজেডি নয়, কমেডি। ষোড়শ শতকে শ্রদ্ধার বশবর্তী হয়ে পাঠকরাই নামের আগে 'ডিভাইন' কথাটি যোগ করে দিয়েছে।

'ডিভাইন কমেডি' তিনটি খণ্ডে বিভক্ত—নরক, পারগেটরি ও স্বর্গ। পারগেটরির বাংলা প্রতিশব্দ নেই। পারগেটরি নরকের মতো ভীষণ স্থান নয়। ছোটখাট অন্যায়ের জন্য পারগেটরিতে শাস্তি দেওয়া হয়। প্রত্যেকটি খণ্ডে তেত্রিশটি করে সর্গ ; এছাড়া ভূমিকা হিসাবে প্রথমেই আছে একটি সর্গ। সুতরাং মোট ১০০ সর্গে মহাকাব্য সম্পূর্ণ।

ভূমিকায় কবি বলেছেন: একদিন তিনি এক ঘোর অন্ধকার বনে পথ হারিয়ে ফেলেন

(অন্ধকার বন জীবনের ভ্রান্তির প্রতীক)। দূরে একটা আলোকিত পাহাড় দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু কবি সেদিকে এগিয়ে যেতে পারছেন না। কারণ কতকগুলি হিংস্র জন্তু পথ আগলে রয়েছে। সেই সময় কবি ভার্জিল এসে দেখা দিলেন। দান্তে তাঁকে পথ দেখাবার জন্য অনুরোধ করলেন।

প্রথম দেখলেন নরক। বহু ঐতিহাসিক ব্যক্তি শাস্তি পাচ্ছে দেখা গেল। পাপের গুরুত্ব অনুসারে শাস্তির কঠোরতা। তারপর এলেন পারগেটরিতে। এখানে দান্তে মুক্ত হলেন সপ্ত পাপের পরিণাম থেকে। কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার, ঈর্ষা, লোভ, আলস্য এবং পেটুকতা সংসারের প্রায় প্রত্যেক মানুষকেই স্পর্শ করে। দান্তেও এই সাতটি পাপের কবল থেকে মুক্ত ছিলেন না।

এরপর দান্তে লেথি নদীর জলে স্নান করে পৃথিবীর কথা ভুলে গেলেন। এবার বিয়াত্রিচের আবির্ভাব হলো। অপরূপ স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত মূর্তি। ভার্জিল বিদায় নিলেন। এবার পথপ্রদর্শক বিয়াত্রিচ। স্বর্গের নয়টি স্তর। প্রথম তলাতে প্রবেশ করতেই দান্তে আলোর সমুদ্রে পড়লেন। তাঁর অন্তরের শ্রবণেন্দ্রিয় যেন কোন জাদুমন্ত্রে খুলে গেল। প্রত্যেক স্তরে কত মহাত্মাকে দেখলেন। যাঁরা যত পুণ্যবান, তাঁরা তত উঁচু স্তরে আছেন। সর্বোচ্চ স্তরে ঈশ্বরের আসন। এখানে এসে বিয়াত্রিচ দান্তের ভার দিলেন সেন্ট বার্নার্ডের হাতে। তিনি দান্তেকে বুঝিয়ে দিলেন মানব-জীবনের উদ্দেশ্য। দান্তে উপলব্ধি করলেন, সৃষ্টির মূলে আছে প্রেম। নিষ্কাম প্রেমের শক্তিতেই সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র ঘুরছে।

'ডিভাইন কমেডি'কে মধ্যযুগের কোষগ্রন্থও বলা যেতে পারে। মধ্যযুগের দর্শন, ধর্মচিন্তা, নীতিবোধ, রাজনীতি, সৃষ্টিতত্ত্ব ইত্যাদি সবই অপূর্ব কাব্যরূপ পেয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, এর অতুলনীয় কাব্যগুণ। তত্ত্ব ও তথ্যের দ্বারা সে গুণ ব্যাহত হয়নি। কবির বর্ণনার গুণে একটি কল্পনার জগৎ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। রূপক ও প্রতীকের বহুল ব্যবহার সত্ত্বেও কাব্যধারা সাবলীল গতিতে বয়ে চলেছে। একবার পাঠক-অপরিচিত মোহময় দান্তের জগতে প্রবেশ করলে বেরিয়ে আসতে ইচ্ছা হয় না।

স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল নিয়ে এই মহৎ কাব্যের নায়িকা বিয়াত্রিচ। কিন্তু দান্তে কী গভীরভাবে বিয়াত্রিচকে ভালোবেসেছিলেন, তা সে জানতে পারেনি।

□ চার্লস ডিকেন্স □

লেখকের জীবনের চেয়ে তাঁর রচনার আকর্ষণ বেশী। জীবনের যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা লেখক তাঁর লেখার মধ্যে নিঃশেষে দান করেন। যাঁর বই পড়ে পাঠক হেসেছে, কান্নায় উদ্বেল হয়ে উঠেছে, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার পর তাই স্বপ্নভঙ্গের বেদনা ভোগ করতে হয় প্রায়ই। ব্যতিক্রম আছেন কয়েকজন। এঁদের জীবন একটি মহাগ্রন্থের মতো, যা বারবার পড়লেও পুরনো হয় না। চার্লস ডিকেন্স সেই মুষ্টিমেয় লেখকদের একজন। তাঁর রচনা তাঁর জীবনের কয়েকটি বিচ্ছুরিত স্ফুলিঙ্গ। তাঁর জীবন তাঁর রচনাবলীর চেয়ে ছিল অনেক বড়। সমকালীন পাঠক সেই জীবনের সঙ্গে পরিচিত হতে না পারলে হয়তো সেদিন এমন করে তাঁর গ্রন্থাবলীকে গ্রহণ করতে পারত না।

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারি এক নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে চার্লস ডিকেন্সের জন্ম হয়। বাবা জন ডিকেন্স নেভি পে অফিসের কেরানী—মাসিক বেতন শ' আড়াই টাকা। তখনকার দিনে এ টাকায় সংসার মোটামুটি চলে যাবার কথা। কিন্তু জন ছিলেন বরাবরই বেহিসাবী, আয়ের কথা ভেবে ব্যয় করা তাঁর স্বভাবে ছিল না। তাই প্রায়ই তাঁকে দেনায় জড়িয়ে পড়তে হত। পাওনাদারদের তাগিদ ছিল জীবনের নিত্য সঙ্গী। দেনার দায়ে তাঁকে জেলেও যেতে হয়েছে। ডিকেন্স জ্ঞান হবার পর থেকেই কুশ্রী দারিদ্র্যের পরিচয় লাভ করেছেন। আর ছেলেবেলা থেকেই সকলের কাছে শুনতেন, এই দারিদ্র্যের জন্য দায়ী তাঁর বাবা। তবু বাবার উপর কোনো বিদ্বেষ ছিল না তাঁর। সরল, আমুদে, স্নেহশীল কিন্তু উড়নচণ্ডী এই লোকটির উপর ডিকেন্সের ছিল গভীর মমতা। ডেভিড কপারফিল্ডের চিরদরিদ্র বন্ধু হিসাবে অমর করে রেখেছেন তাঁকে। মিকওবার চরিত্রটি ইংরেজী ভাষার অভিধানে ডিকেন্সের আরও অনেক চরিত্রের মতো স্থান পেয়েছে বিশেষ অর্থে। যে অলস ব্যক্তি নিজে উদ্যোগী না হয়ে কেবল আশা করে থাকে কিছু একটা সুরাহা হয়ে যাবেই, ইংরেজীতে তাকেই বলে মিকওবার।

একদিকে দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা, অন্যদিকে অর্থের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা—এই দুই পরস্পর-বিরোধী মানসিকতার মধ্যে ডিকেন্সের ছেলেবেলা কেটেছে। বাবাকে কেন্দ্র করে যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল, মামাবাড়ীতেও তার অভাব ছিল না। দাদামশাই সরকারী তহবিলের লাখখানেক টাকা তছরুপের দায়ে অভিযুক্ত হন। দেশত্যাগ করায় কারাবাস এড়াতে পেরেছিলেন।

ডিকেন্সের বয়স যখন মাস-ছয়েক, তখন থেকেই পরিবারের আর্থিক অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে। ভালো বাড়ী থেকে বাবা উঠে এলেন অপেক্ষাকৃত কম

ভাড়ার ছোট বাড়ীতে। এরপর কেবলই চলেছে বাড়ী বদল ; আর চাকরিতে স্থান পরিবর্তন। ল্যান্ডপোর্ট থেকে লন্ডন, লন্ডন থেকে চ্যাথাম, আবার লন্ডন। চার্লস নিয়মিত স্কুলে পড়ার সুযোগ পাননি। বাবার চাকরিতে বদলি এর কারণ নয়। অর্থাভাবটাই বড় কথা। সামান্য ইংরেজী শিক্ষা এবং ল্যাটিন বর্ণমালার প্রথম পাঠ মায়ের কাছেই হয়েছিল। চ্যাথামে থাকবার সময় কিছুদিনের জন্য স্কুলে পড়বার সুযোগ পেয়েছিলেন। সেখানকার শিক্ষক উইলিয়াম গাইল্‌স্‌ চার্লসের কল্পনাবিলাসী মন উদ্দীপ্ত করেছিলেন নানা গল্প বলে।

বালক চার্লস রোমাঞ্চকর আনন্দের উৎস আবিষ্কার করেছিলেন বাবার একটা পুরনো কাঠের বাক্সে। চিলেকোঠায় পড়ে থাকত বড় বাক্সটা। ডালা খুলে চার্লস একদিন বের করে আনলেন চামড়ায় বাঁধানো সোনার জলে নাম লেখা মোটা মোটা বই ঃ 'ডন কুইকসট', 'রবিনসন ক্রুসো', 'টম জোন্স', 'ভিকার অব ওয়েকফিল্ড' ইত্যাদি। বইয়ের রাজ্যে মন বন্দী হয়ে পড়ল। সব বোঝা যায় না ; কিন্তু একটা অচেনা মায়াময় জগতের আভাস পাওয়া যায়। অভাব-অনটন, মা-বাবার কলহ, পরিবারের ছেলেদের অনুকম্পা—এইসব থেকে অনেক দূরে চলে যাওয়া যায় বইয়ের মধ্যে ডুব দিয়ে।

বাবাও বুঝতে পেরেছেন, চার্লস তাঁর অন্য সাতটি ছেলেমেয়ের মতো নয়। অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ, বড় বেশি অভিমানী এই ছেলের ওপর টান তাঁর সবচেয়ে বেশী। যদিও স্কুলে পড়াবার সামর্থ্য নেই, সর্বদা সেজন্য নিজেকে অপরাধী মনে হয়, তবু তাঁর বিশ্বাস চার্লস একদিন পরিবারের আশার গণ্ডি অতিক্রম করে অনেক বড় হবে। কেমন করে, তা জানা নেই। বন্ধুদের অফিস থেকে আমন্ত্রণ করে আনেন। চার্লস তাঁদের কবিতা বা নাট্যাংশ আবৃত্তি করে শোনায়। চার্লসের কল্পনাদীপ্ত চোখ, উজ্জ্বল মুখশ্রী এবং আবেগাপ্লুত কণ্ঠস্বর তাঁদের মুগ্ধ করে। ভবিষ্যৎ জীবনে ডিকেন্সের অভিনয়-প্রীতির পটভূমিকা এইভাবেই রচিত হয়েছিল।

চার্লসের বয়স যখন এগারো, তখন বাবা বদলি হলেন চ্যাথাম থেকে লন্ডনে। জন ডিকেন্স ছ'টি সন্তানের পিতা। সংসার কিছুতেই চলছে না। লন্ডন যাবার ঠিক আগে বাড়ীর পুরনো কিন্তু বড় প্রিয় চেয়ার-টেবিলগুলি বিক্রি করে দেওয়া হলো। লন্ডনে এসে চার্লসের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল। স্কুল নেই ; সর্বদা কেবল অভাবের কথা। পাওনাদাররা এসে বাড়ীতে চড়াও হয়। বাবা ঘরের এককোণে আত্মগোপন করে থাকেন। তাদের অপমানজনক কথাগুলি কিশোর বালককে চাবুক মারত। চার্লসের একটা বড় কাজ ছিল পাড়ার মহাজনদের দোকানে দোকানে ঘোরা। মা ঘরের বাসন-কোসন তাঁর হাতে তুলে দিতেন। চার্লস সেইসব বন্ধক দিয়ে টাকা নিয়ে আসতেন। সেদিন চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এসেছিল, যেদিন পুরনো কাঠের বাক্সটা খুলে একে একে প্রিয় বইগুলিকেও দোকানে নিয়ে যেতে হয়েছিল।

এই যন্ত্রণাদায়ক পরিবেশ থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র উপায় ছিল লণ্ডনের অলিগলিতে ঘুরে বেড়ানো। দশ মাইল-পনেরো মাইল বেড়ানো ছিল প্রায় প্রাত্যাহিক ঘটনা। কিন্তু এই স্বাধীনতাটুকুও বেশীদিন রইলো না। পরিবারের এক আত্মীয় প্রস্তাব দিলেন, 'চার্লস কেন মিথ্যে বসে আছে। আমার শিশি-বোতলের কারখানায় কাজে ঢুকে পড়ুক।'

মা-বাবা সম্মতি দিলেন। দিনে বারো ঘণ্টা খাটুনি। সপ্তাহে ছয় শিলিং মজুরি। চার্লসের আশা ছিল, মা-বাবা তাকে এই বয়সেই এমন কঠোর মজুরের কাজে নিশ্চয়ই যেতে দেবেন না। পড়াশুনা করবে, লিখবে,—কত স্বপ্ন ছিল! সব এক মুহূর্তে ভেঙে গেল। সংসারের বোঝা, একজনকে কম খাওয়াতে হলেই মা-বাবার স্বস্তি। বুকভরা অভিমান নিয়ে চার্লস কাজে যোগ দিলেন।

এর অল্পদিন পরেই দেনার দায়ে জন ডিকেন্সকে গ্রেফতার করা হলো। সে সময় বন্দীর পরিবারকে জেলে থাকতে দেওয়া হতো। ভরণ-পোষণের দায়িত্ব সরকারের। মা অন্য ভাই-বোনদের নিয়ে জেলের মধ্যে চলে গেলেন। চার্লসকে ফ্যাক্টরির কাছে থাকবার জায়গা খুঁজে নিতে হলো। একটা কাঠের গুদামের উপরে ছোট্ট ঘর ; কনকনে ঠাণ্ডা, কিন্তু সস্তা ভাড়া। বারো বছরের কিশোর এই প্রথম একা থাকছেন। রাত্রিতে বড় ভয় করে। ভূতের, আরো কত কিছুর ভয়! তার উপর মাঝে মাঝে কিডনির দুঃসহ ব্যথা উঠলে কাউকে কাছে পাবার উপায় নেই। আশঙ্কা হয় রাতটা বুঝি কাটবে না, আর ভোরের আলোতে চোখ খুলবে না। এই দুঃখের দিনগুলির কথা চার্লস কোনোদিনই ভুলতে পারেননি। নানা কাহিনীতে বারবার এই বেদনার ইতিহাস স্থান পেয়েছে।

এক আত্মীয়ের উইল থেকে অকস্মাৎ কিছু টাকা পাওয়ায় জন ডিকেন্স ঋণ শোধ করে কারামুক্ত হতে পারলেন। কাজ ছাড়িয়ে ছেলেকে বাড়ী নিয়ে এলেন তিনি— আর্থিক সচ্ছলতার জন্য নয়, এ ধরনের কাজে বংশমর্যাদার হানি হয় বলে। কিন্তু মা এর জন্য ঝগড়া শুরু করে দিলেন। ছেলেকে বাড়ীতে বসিয়ে খাওয়াবে কে? আর্থিক সামর্থ্য কই! মা চেয়েছিলেন, চার্লস আবার শিশি-বোতলের কারখানায় কাজে যাক। ডিকেন্স এজন্য মাকে কখনো ক্ষমা করতে পারেননি। অনেক দোষ থাকা সত্ত্বেও বাবাকে ভালোবাসতেন, মাকে নয়। মায়ের সম্বন্ধে অনেক কঠোর মন্তব্য করেছেন, তাঁর যত্ন নেওয়ার কথা মনে হয়নি ; এমনকি, মৃত্যুর পরে কবরের উপর স্মৃতিফলকে কিছুই লেখেননি তাঁর সম্বন্ধে।

পরিণামের কথা না ভেবে বাবা চার্লসকে ফ্যাক্টরির কাজে ফিরে যেতে দিলেন না। কোথা থেকে টাকা আসবে তার হিসাব না করেই ছেলেকে ভর্তি করিয়ে দিলেন লণ্ডনের এক স্কুলে। বছর দুই মাত্র সেখানে পড়া হলো। তারপরে মাত্র পনেরো বছর বয়সে চার্লস এক সলিসিটরের অফিসে কনিষ্ঠ কেরানীর চাকরিতে ঢুকলেন। কিন্তু এই বৈচিত্র্যহীন কাজ তাঁর ভালো লাগত না। তাঁর ইচ্ছা

সাংবাদিক হবার। পয়সা আর বৈচিত্র্য দুই-ই আছে। কিন্তু সাংবাদিকতায় সাফল্য লাভ করতে হলে দুটি শর্ত পালন করতে হবে। এক, নানা বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান থাকা চাই। এর জন্য চার্লস ব্রিটিশ মিউজিয়মের মেম্বার হয়ে গেলেন। সময় পেলেই চলে যেতেন সেখানকার রীডিং রুমে, পড়তেন নানা বিষয়ের বই। দুই, উন্নতি করতে হলে জানা চাই শর্টহ্যাণ্ড। পার্লামেণ্টের বক্তৃতার রিপোর্ট নির্ভুল হলেই কৃতিত্ব। আর এর জন্য শর্টহ্যাণ্ডের জ্ঞান অপরিহার্য। অল্প সময়ের মধ্যে চার্লস চমৎকার আয়ত্ত করে ফেললেন শর্টহ্যাণ্ডের কৌশল। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছে তাঁকে। অল্পদিনের মধ্যেই দেখা গেল এই নবযুবক সঠিক রিপোর্টিংয়ে অনেক প্রবীণ সাংবাদিককেও হার মানিয়েছে। সুতরাং চাকরি পেতে অসুবিধা হলো না।

সাংবাদিক হবার পূর্বে চার্লসের একবার ইচ্ছা হয়েছিল অভিনেতা হিসাবে থিয়েটারে যোগ দেবার। বিজ্ঞাপন দেখে আবেদন করেছিলেন এবং সাক্ষাৎকারের জন্য দিনও ঠিক হয়েছিল। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে সর্দিজ্বর হওয়ায় নিয়োগকর্তার সঙ্গে দেখা করতে পারেননি। তা না হলে হয়তো আমরা ঔপন্যাসিক ডিকেন্সকে পেতাম না। তাঁর অভিনয়প্রীতি সারাজীবন শৌখিনই রয়ে গেছে।

সাংবাদিক হিসাবে চার্লসের বেশ নাম হয়েছে। এটুকুতে তিনি সন্তুষ্ট নন। আরও উন্নতি করতে হবে, দ্রুত উন্নতি। এর জন্য যে কোনো কষ্ট বরণ করতে তাঁর দ্বিধা নেই। কর্মোদ্যমের পশ্চাতে এসেছে নতুন প্রেরণা। ভালোবাসা। জীবনের প্রথম প্রেম। ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখছেন। কিন্তু তার জন্য আরও অর্থ এবং কর্মজীবনে প্রতিপত্তি চাই। ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের মেয়েকে ঘরে আনবার স্বপ্ন দেখছেন যে!

১৮২৯ সাল। চার্লস মাত্র আঠারো বছরের যুবক। যেন যৌবন-চাঞ্চল্যের প্রতিমূর্তি। চলায়-বলায় জীবনীশক্তি ঝিকমিকিয়ে ওঠে। সবচেয়ে আশ্চর্য, মুখ। ভাসা ভাসা উজ্জ্বল চোখ। মুখের দিকে তাকালে যেন চলচ্চিত্রের মতো লোকটি ধরা পড়ে। লী হাণ্ট, শ্রীমতী কার্লাইল এবং এমনি আরও কত বিখ্যাত লোক চার্লসের মুখশ্রী দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। সেই মুখ আকৃষ্ট করল মারিয়া বীডনেলকেও। মারিয়া চার্লসের চেয়ে এক বছরের বড়। কিন্তু দেখে তা মনে হয় না। কঠোর দারিদ্র্যের জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে চার্লস এই প্রথম একটি সচ্ছল পরিবারে সুন্দরী তরুণীর সান্নিধ্য লাভ করলেন। রোমাণ্টিক স্বভাবের নবযুবক প্রথম আলাপেই প্রেমে পড়লেন মারিয়ার। মারিয়াও চার্লসের আকর্ষণ এড়াতে পারেননি। চার্লস ঘন ঘন আসতেন মারিয়াদের বাড়ীতে। দুজনে কত গল্প, কত কথা, কত হাসি। তাদের যেন এক আলাদা জগৎ। আর কে আছে বাড়ীতে, খেয়াল নেই। সংবাদপত্রের অফিসের কাজ সেরে অনেক রাত্রিতে চার্লস ইচ্ছা করেই মারিয়াদের বাড়ীর সামনেকার পথ দিয়ে ফিরতেন। হয়তো মারিয়াকে ব্যালকনিতে দেখা যাবে!

মারিয়ার মা-বাবার দৃষ্টি এড়ায়নি। ছেলেটি তো দেখতে বেশ, কথায়-বার্তায়ও খুব ভালো। কিন্তু শুধু ছেলে দেখে মেয়ে দেবার মতো প্রতিষ্ঠা চার্লসের তখনও হয়নি। পরিবারের খোঁজ করতে গিয়ে তাঁরা চমকে উঠলেন। চার্লসের বাবার জেল হয়েছিল দেনার দায়ে। এমন পরিবারে মেয়ের বিয়ে কিছুতেই হতে পারে না। মারিয়ার মন ফিরিয়ে নিতে হবে। কিছুদিন দূরে থাকলেই চার্লসকে ভুলে যাবে মারিয়া। সুতরাং প্যারিস পাঠিয়ে দেওয়া হলো মারিয়াকে। চার্লস জানলেন, মারিয়া তার পড়া শেষ করতে প্যারিস যাচ্ছে।

দীর্ঘ দু'বছরের বিচ্ছেদ। চার্লসের মনে কোনো আশঙ্কা নেই। মারিয়া তো তাঁরই। অপেক্ষাটা দুর্বিষহ লাগছে। ফিরে আসতেই ছুটে গেলেন। একটু অন্যরকম। সেই আন্তরিকতা নেই। শুধু ভদ্রতা, বন্ধুত্ব। তার বেশী যেন এগুতে চায় না। মান-অভিমানের পালা হলো অনেক। কিছুদিন যাবার পর আবার যেন পুরনো মারিয়াকে ফিরে পাওয়া যায় কখনো কখনো। এক-একবার মন গুটিয়ে নেয়, আবার প্রসারিত করে। দ্বন্দ্ব চলছে মারিয়ার মনে। এই দ্বন্দ্বের যত তাড়াতাড়ি অবসান ঘটে ততই মঙ্গল। চার্লসের একুশ বছর পূর্ণ হলো, এবার তিনি সাবালক। সেই উপলক্ষে পার্টির আয়োজন করা হলো। মারিয়া এই পার্টির মধ্যমণি। কথাটা পাকা করে নেবার এই তো সুযোগ। একপাশে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। বুকে টেনে বললেন, 'তুমি আমার হবে?'

মারিয়া নিজেকে মুক্ত করে বলল, 'তুমি তো এখনো ছেলেমানুষ!'

ছেলেমানুষ! চাবুকের ঘা খেলেন চার্লস। মাথা নিচু করে চলে এলেন। এই আঘাতে মন যে ভাঙল তা আর জোড়া লাগেনি। মারিয়া যে স্বামীর ঘর করতে গেল, চার্লসের তুলনায় তাঁর বয়স এবং সামাজিক মর্যাদা দুই-ই বেশী ছিল।

চার্লস মারিয়াকে জীবনে কোনোদিন ভুলতে পারেননি। রক্তমাংসের মারিয়া নয়—তাঁর কল্পনার মারিয়া, সমগ্র নারীজাতির প্রতীক যে রমণী, প্রথম যৌবনের সব স্বপ্ন যে রঙীন করে তুলেছিল, সে সত্যিকার মারিয়াকেও অতিক্রম করে চার্লসের হৃদয়ে অমর হয়ে রইলো। জীবনে আসেনি বলেই স্বপ্নে এমন করে বেঁচে থাকতে পেরেছে। চার্লস পরবর্তী জীবনে নানা শ্রেণীর নারীর সংস্পর্শে এসেছেন। কিন্তু আর কাউকে একান্তভাবে ভালোবাসতে পারেননি, ভালোবেসে সুখী হতে পারেননি। মারিয়া যে আদর্শ নারীর ছবি রেখে গেছে তার সমকক্ষ আর কেউ হতে পারে না।

সাংবাদিক যশোপ্রার্থী চার্লস যখন ঔপন্যাসিক হিসাবে দেশে-বিদেশে খ্যাতি লাভ করলেন, তাঁর বই যখন লোকের ঘরে ঘরে, তখন মারিয়াও আবিষ্কার করে বিস্মিত হলো আজকের খ্যাতিমান লেখক তারই প্রত্যাখ্যাত প্রেমিক। বেদনাও বোধ করল নিশ্চয়। এই খ্যাতির একটা অংশ তো মারিয়াও পেত!

তারপর বাইশ বছর কেটে গেছে। ডিকেন্সের নাম এখন লোকের মুখে মুখে। 'ডেভিড কপারফিল্ড' প্রভৃতি বিখ্যাত উপন্যাসগুলি বেরিয়ে গেছে। কপারফিল্ডের

ডোরা স্পেনলো মারিয়াকে মনে করেই লেখা। ডিকেন্স বিয়ে করেছেন, ন'টি সন্তানের পিতা ; যশ ও ঐশ্বর্য জীবন পূর্ণ করেছে। তবু একা যখন থাকেন তখন প্রায়ই মারিয়ার কথা মনে পড়ে যায়। সেই অতৃপ্ত প্রেমের আকাঙ্ক্ষা জীবনের সকল সফলতাকে যেন বিস্বাদ করে দেয়।

একদিন বই পড়ছিলেন। বেয়ারা এসে একতাড়া চিঠি রেখে গেল। রোজ এমনি কত চিঠি আসে। ভক্তদের চিঠি। সব পড়বার সময় হয় না। আজও বই নামিয়ে চিঠিগুলির উপর চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলেন। একটি খামের উপর মেয়েলী লেখার বিশেষ ছাঁদে চোখ আটকে গেল। হঠাৎ বুকে কেমন একটা ব্যথা বোধ করলেন। না, ভুল হবার নয়। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপর খুললেন ধীরে ধীরে। হ্যাঁ, মারিয়ার চিঠি। লিখেছে, ডিকেন্সের সব খবরই সে রাখে। জানিয়েছে নিজের কথা। এখন সে মিসেস উইন্টার ; স্বামী ব্যবসা করেন। দুটি মেয়ের জননী। ডিকেন্স চলে গেলেন সেই প্রথম যৌবনের দিনগুলিতে। সেদিনকার মারিয়া আবার তাঁর কল্পনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। যেন তাঁর বয়স হয়নি, বিয়ে করেননি, ন'টি সন্তানের পিতা নন। সেই বাইশ বছর আগেকার জীবন ফিরে এসেছে। সেদিনকার আবেগ নিয়ে উত্তর দিলেন। একটি অপূর্ব প্রেমপত্র। মারিয়া আশ্বস্ত হলো। ভোলেনি তাহলে।

মারিয়া একদিন দেখা করতে এলো। না এলে ভালো হতো। লাবণ্যময়ী তরুণী মারিয়া হারিয়ে গেছে। চুয়াল্লিশ বছরের বিপুলকায়া মহিলাকে দেখে ডিকেন্স মারিয়ার সঙ্গে কোনো যোগ খুঁজে পেলেন না। শুধু দেহের নয়, মনেরও আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। কেমন যেন একটু নির্বোধ মনে হয়। বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য কোথায় হারিয়ে গেছে।

মারিয়া ঘনিষ্ঠ হতে চায়। থিয়েটারে, অন্যত্র ডিকেন্সকে আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। ডিকেন্স এড়িয়ে যান ; কথা দিয়েও কথা রাখেন না। মারিয়া অপেক্ষা করে করে ফিরে যায়। ডিকেন্স মারিয়ার মধ্যে তাঁর মানসীর অপমৃত্যু প্রত্যক্ষ করবার বেদনা সহ্য করতে পারতেন না, তাই এড়িয়ে চলতেন।

কয়েক বছর পরে স্বামীর ব্যবসা ফেল পড়লে মারিয়া টাকা চেয়ে পাঠিয়েছিল। ডিকেন্স তাঁর অক্ষমতা জানিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরও মারিয়া ষোল বছর বেঁচে ছিল। ডিকেন্স তাঁকে ভালোবাসতেন—একথা লোকের কাছে প্রচার করতে দ্বিধা ছিল না। শ্রোতারা লোলচর্ম প্রগলভা এই বৃদ্ধার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত অবিশ্বাসের সঙ্গে।

ডিকেন্সের জীবনে এইটে দেখা যায় : প্রেমের দেবতা বারবার তাঁকে বঞ্চনা করেছেন ; অথচ সেই ব্যর্থতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লেখক হিসাবে পরপর সাফল্যের সিঁড়িগুলি পার হয়ে এসেছেন। মারিয়াদের পরিবার যখন তাঁর আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে প্রত্যাখ্যান করল তখন ডিকেন্স সংকল্প করলেন জীবনে সাফল্য লাভ

করতে হবে, টাকা ছাড়া অন্য কোনো পথে, যে পথে প্রতিযোগিতা করবার ক্ষমতা মারিয়াদের নেই।

কোন্ পথ? লেখাই তাঁর পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ পথ। রিপোর্ট তো লিখতেই হয় রোজ। আর একটু যত্ন আর অধ্যবসায় থাকলে হয়তো কিছু লেখা সম্ভব হবে। অবসর সময়ে কতকগুলি নকশা লিখলেন। একদিন তারই একটি—'এ ডিনার ইন পপলার ওয়াক'—চুপিচুপি 'মান্থলি ম্যাগাজিনের' ডাকবাক্সে ফেলে এলেন। তারপর থেকে প্রত্যেক মাসে একবার করে স্টলে দাঁড়িয়ে দেখে যান লেখা বেরুলো কিনা। ১৮৩৩ সালের শেষ ভাগে সেই আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। তাঁর লেখা বেরিয়েছে। ভবিষ্যতের পথ স্থির হয়ে গেল সেই মুহূর্তে।

স্কেচ লিখতে লাগলেন একের পর আর-এক। ছাপা হতে লাগল। নিজের নামে নয়, ছোট ভাইয়ের ডাকনাম 'বজ্'—সেই নামে। বই হিসাবে নকশাগুলি বের হলো ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে। দ্রুত কতকগুলি সংস্করণ বিক্রি হয়ে গেল। স্কেচেস্ বাই বজ্-এর নাম তখন সকলের মুখে মুখে। নতুন প্রকাশক লেখার ফরমায়েশ নিয়ে এলো। তাদের জন্য ধারাবাহিক লিখতে আরম্ভ করলেন 'পিকুইক পেপার্স'। ডিকেন্স এই গ্রন্থে দুটি অবিস্মরণীয় চরিত্র সৃষ্টি করেছেন—পিকুইক এবং স্যাম্ ওয়েলার। এই বইটি লেখক হিসাবে ডিকেন্সকে প্রতিষ্ঠিত করে।

জর্জ হগার্থ প্রবীণ সাংবাদিক। ডিকেন্সের সহকর্মী। সেই সূত্রে হগার্থের বাড়ী যাতায়াত করেন। তিন মেয়ে তাঁর। ক্যাথারিন বড়; তারপর কিশোরী মেরী; জর্জিনা সকলের ছোট। ক্যাথারিন সুন্দরী, সরল, পরম বিশ্বাসী। মারিয়ার কাছ থেকে আঘাত পেয়ে এমনি এক তরুণীর মধ্যে আশ্রয় নিয়ে ডিকেন্স শান্তি পেলেন। বিচার করার শক্তি ছিল না। 'পিকুইক পেপার্স' বেরুবার দু'দিন পরে ক্যাথারিনকে বিয়ে করে ডিকেন্স নতুন সংসার পাতলেন। ক্যাথারিন পুতুলের মতো সুন্দর, আদর করবার জিনিস। কাজকর্মে অগোছালো। কিছুই করে উঠতে পারে না। রান্নার কাজটাও ভালো করে জানা নেই। বছরখানেক পরে প্রথম ছেলে হবার পর ক্যাথারিন যখন আরো অকর্মণ্য হয়ে পড়ল তখন মেজো বোন মেরী এলো ঘর সামলাতে। ষোলো বছরের মেয়ে, কিন্তু একেবারে পাকা গিন্নী। সব দেখেশুনে কাজ করতে ওস্তাদ।

ডিকেন্স মেরীর মধ্যে খুঁজে পেলেন সত্যিকার অন্তরের সঙ্গী। বেড়াতে বের হন দু'জনে একসঙ্গে; নতুন কিছু লিখলেই পড়ে শোনান মেরীকে। মেরী শুধু যে চুপ করে শোনে তা নয়, ভালো-মন্দ মন্তব্যও করে। সাহিত্যের রস উপভোগ করবার ক্ষমতা আছে। ক্যাথারিন এমন করে স্বামীর জীবনে স্থান করতে পারেনি। বই পড়বার অভ্যাস তার ছিলই না বলা যেতে পারে।

কিন্তু মেরীর সাহচর্যের আনন্দ বেশীদিন ডিকেন্স পাননি। একদিন দু'জনে থিয়েটার দেখে ফেরার একটু পরেই হঠাৎ মেরী অসুস্থ হয়ে পড়ল। তার পরদিন

মেরী ডিকেন্সের বুকে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। মেরী যে তাঁর জীবনে কত বড় স্থান অধিকার করেছিল, ডিকেন্স তা পূর্বে কখনো উপলব্ধি করতে পারেননি। হঠাৎ যেন সংসার থেকে, সমাজ থেকে সকল আলো নিভে গেল। মেরীকে হারাবার বেদনা তিনি কখনো ভুলতে পারেননি। মেরীর আংটি তিনি আজীবন নিজের হাতে পরেছেন। 'ওল্ড কিউরিয়সিটি শপ'-এর লিটল নেল চরিত্রের মধ্যে ডিকেন্স মেরীকে অমর করে রেখেছেন। নেলও মেরীর মতো অল্প বয়সেই মারা গিয়েছিল। ডিকেন্স তাঁর ভক্তদের কাছ থেকে অসংখ্য চিঠি পেতেন—নেলের যেন মৃত্যু না হয়। ডিকেন্সও তো তাকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন ; কিন্তু নিয়তির অমোঘ নিয়ম। ডিকেন্স লেখক হিসাবে কতটুকু করতে পারেন ? নেলের মৃত্যু তাঁকে দেখাতে হলো। ইংলন্ডে সেদিন সার্বজনীন শোকের ছায়া পড়ল। ল্যান্ডর ও কালহিলের চোখ দিয়ে জল পড়েছে নেলের মৃত্যুর বর্ণনা পড়ে। কতো উচ্চমর্যাদা-সম্পন্ন ব্যক্তি রেলগাড়িতে ও অন্যত্র প্রকাশ্যে কাঁদতে লাগলেন নেলের দুঃখে। আজকাল অবশ্য কোনো কোনো সমালোচক বলেন, এটা ডিকেন্সের সস্তা ভাবাবেগ ছাড়া আর কিছু নয়। ডিকেন্সের রচনার একটি ত্রুটি। কিন্তু আজকের রুচি দিয়ে সেদিনকার সাহিত্যকে যথার্থ বিচার করা চলে না। সেদিন ইংলন্ড ও আমেরিকার পাঠক-পাঠিকারা নেলের শোকে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল, একথা সত্য।

'পিকুইক পেপার্স'-এর পরেই ডিকেন্স পাঠকদের হাতে তুলে দিলেন নতুন উপন্যাস 'ওলিভার টুইস্ট' (১৮৩৮)। সমাজবিরোধীদের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন লেখক। অসহায় শিশুদের উপর ওয়ার্ক হাউসে যে অমানুষিক অত্যাচার করা হতো তারই মর্মন্তুদ বিবরণ এই কাহিনীতে পাওয়া যাবে। প্রকৃতপক্ষে ডিকেন্সের উদ্দেশ্য ছিল পুওর ল'-এর নিষ্ঠুর ধারাগুলির প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। এই উপন্যাসের সফলতা থেকে ডিকেন্স উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তাঁর শক্তির উৎস কোথায়। সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি অক্লান্তভাবে লিখে গেছেন। পরের বছর বের হলো নতুন উপন্যাস 'নিকোলাস নিকোলবি'। শিক্ষার নামে যে ব্যবসা চলছিল তখন ইংলন্ডে, ডিকেন্স তারই মুখোশ খুলে দিয়েছেন। 'দি ওল্ড কিউরিয়সিটি শপ' এবং 'বার্নাবি রুজ' একই সঙ্গে বের হয়। প্রথমটিতে আমরা অনেকগুলি অবিস্মরণীয় চরিত্রের মিছিল পাই। কিন্তু লিটল নেল অন্য সবাইকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। স্কটের আদর্শে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার প্রয়াস 'বার্নাবি রুজ'।

সস্ত্রীক আমেরিকা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে লিখলেন 'মার্টিন চাজলউইট'। আমেরিকার জীবনযাত্রার সমালোচনার জন্য স্বভাবতই এ উপন্যাস ওদেশে সমাদর লাভ করেনি। আমেরিকা তখন কোনো মূল্য না দিয়েই যে কোনো বই ছাপিয়ে নিত। এ ব্যাপারের প্রতিকারের জন্য ডিকেন্স যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কপিরাইটের সুবিধা তিনি নিজে ভোগ করে যাননি। এই আন্দোলনের জন্য এবং

আমেরিকানদের সম্বন্ধে 'মার্টিন চাজলউইটে' বিরূপ মন্তব্য থাকায় ওদেশে তাঁর জনপ্রিয়তা অনেকটা কমে গিয়েছিল।

'ডেভিড কপারফিল্ড' ডিকেন্সের নিজের মতে তাঁর সবচেয়ে ভালো বই। এই আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসে অন্য অনেক পরিচিত চরিত্রের মধ্যে আছে বাবা এবং মারিয়ার প্রতিচ্ছবি। সমালোচকরা ডিকেন্সের উপন্যাসের মধ্যে 'ব্লীক হাউস'কে শ্রেষ্ঠ বলে অভিমত দিয়েছেন। লাল ফিতার ফাঁস এবং বিচারের বিলম্ব যে জীবনে কত বড় ট্র্যাজেডি সৃষ্টি করতে পারে, এই উপন্যাসে তাই দেখিয়েছেন লেখক। 'হার্ড টাইমস'-এ ডিকেন্স তাঁর উদ্দেশ্য গোপন রাখবার কোনো চেষ্টা করেননি। সমাজে যারা অবহেলিত ও অত্যাচারিত, ডিকেন্স তাদের পক্ষ নিয়ে কথা বলেছেন। এখানে শিল্পনগরী ম্যাঞ্চেস্টারে শ্রমিকদের যে পশুর মতো জীবনযাপন করতে হয় তার বিরুদ্ধে ডিকেন্স কলম ধরেছেন। মনে হয় কোথাও কোথাও শিল্পীর নিরপেক্ষতা অতিক্রম করে লেখকের ক্রোধ প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর চোখে সকল শ্রমিক আদর্শ চরিত্রের মানুষ এবং সকল মালিক দানব। খ্রীষ্টান অনুকম্পার প্রয়োগ ছাড়া শ্রমিক-মালিক বিরোধের জন্য অন্য কোনো মীমাংসা তিনি উপস্থিত করতে পারেননি। এরপরে প্রকাশিত হয় 'লিটল ডোরিট'। অধমর্ণদের অবস্থা, বিশেষ করে জেলের অভ্যন্তরে তাদের জীবনের কথা এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। কার্লাইলের 'ফ্রেঞ্চ রিভলিউশনের' প্রভাবে এরপরে তিনি লিখলেন 'এ টেল অব টু সিটিজ'। এটি তাঁর জনপ্রিয় উপন্যাসগুলির অন্যতম।

সার্থক শিল্পকলার দিক থেকে 'গ্রেট এক্সপেকটেশান' (১৮৬১) ডিকেন্সের শেষ উপন্যাস। নায়ক পিপের ভাগ্যবিপর্যয়ের এবং সেই সঙ্গে এস্টেলাকে লাভ করে জীবন পূর্ণ হবার আশার মধ্যে কাহিনীর সমাপ্তি।

'আওয়ার মিউচুয়াল ফ্রেন্ড' (১৮৬৫) ডিকেন্সের সর্বশেষ সম্পূর্ণ উপন্যাস। 'দি মিস্ট্রি অব এডউইন ড্রুড' ডিকেন্স সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি। আরও কয়েকটি বই—বিশেষ করে ভ্রমণ কাহিনী এবং ছোটগল্প লিখেছেন।

ডিকেন্স সমকালীন ঔপন্যাসিকদের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তাঁর জীবিত-কালেই কোনো উপন্যাস লক্ষাধিক কপি বিক্রি হয়েছিল। তিনি অধিকাংশ কাহিনী রচনা করেছেন সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায়। একসঙ্গে দু-তিনটি উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে লিখেছেন। পাঠকরা প্রত্যেকটি কিস্তির জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত। কোন্ চরিত্রের কি হবে তা জানতে লেখককে চিঠি দিত। পাত্রপাত্রীদের সুখ-দুঃখ সমগ্র পাঠক-সমাজের সুখ-দুঃখে পরিণত হতো। পাঠকদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য ডিকেন্স ব্যগ্র ছিলেন। এই যোগাযোগ হত দু'ভাবে। নাটকে অভিনয় করতেন মাঝে মাঝে। আর নিজের লেখা থেকে পাঠ করে শোনাতেন; শত শত লোক শোনবার জন্য ভিড় করত। পাঠ শোনাবার জন্য দর্শনীর ব্যবস্থা ছিল। প্রথম কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের জন্য ডিকেন্স পাঠ করতেন; তারপরে অর্থ

উপার্জনের উদ্দেশ্যেই নিয়মিত পাঠ করতে হতো প্রচুর। বিশেষ করে দ্বিতীয়বার আমেরিকা ভ্রমণ করতে গিয়ে বহু জায়গায় পাঠের আয়োজন করে বর্তমান মূল্যের প্রায় চার লক্ষ টাকা পেয়েছিলেন।

কিন্তু একালের সমালোচকরা ডিকেন্সের রচনায় অনেক ত্রুটি দেখতে পান। সহজ ভাবপ্রবণতা, নাটকীয়তার আধিক্য, টাইপ চরিত্রের প্রাচুর্য এবং অনেক ক্ষেত্রে প্লটের শৈথিল্যের জন্য তাঁর রচনার এক বৃহৎ অংশের শিল্পগুণ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কিন্তু এই ত্রুটিগুলি পাঠকদের নিকট বড় হয়ে দেখা দেবার সুযোগ পায়নি। কারণ ডিকেন্স তাঁর কাহিনী কেন্দ্র করে এমন একটি জগৎ সৃষ্টি করতেন, যেখানে প্রবেশ করলে সব কিছু সহজ ও স্বাভাবিক মনে হতো। আজকের নতুন পরিবেশে ডিকেন্সের রচনার আকর্ষণ নিশ্চয়ই অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু তাঁর উপন্যাসে আধুনিক চিন্তাধারার অভাব নেই। সমাজের অত্যাচারিত ও অবহেলিত অংশের জন্য তাঁর গভীর সহানুভূতি ছিল। একালের কোনো কোনো সমালোচক তাঁকে মার্ক্সবাদী বলে দাবি করেছেন। 'লিটল ডোরিট'-এ জেলখানার অব্যবস্থার কথা আছে। মনে হয় সমাজও তার নানা বিধিনিষেধের সমষ্টি নিয়ে এক বৃহত্তর কারাগার মাত্র। বার্নার্ড শ' এ বই সম্বন্ধে বলেছেন, মার্ক্সের ক্যাপিট্যালের চেয়েও অধিকতর রাজদ্রোহজনক।

'লিটল ডোরিট' শেষ করে আর কোনো লেখা আরম্ভ করতে পারছেন না বলে ডিকেন্সের মন অস্থির। এই অস্থিরতার মধ্য দিয়েই এমন এক দুর্বলতা এলো তাঁর জীবনে, যার ফল হয়েছিল বিষময়। উইলকি কলিন্স বয়সে অনেক ছোট হলেও তখন ডিকেন্সের অন্তরঙ্গ সহচর। কলিন্সের লেখা একটি নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা হলো। ডিকেন্স এবং আরও অনেকের সঙ্গে সেই অভিনয়ে যোগ দিয়েছিলেন ষোড়শী এলেন টার্নান। ছেচল্লিশ বছরের প্রৌঢ় এলেনের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। এলেনের মধ্যে পেতে চাইলেন মারিয়া বীডনেলকে।

এলেনের প্রতি আকর্ষণ হয়তো ক্যাথারিনের সঙ্গে বিচ্ছেদের প্রত্যক্ষ কারণ। ডিকেন্স বিবাহে সুখী হতে পারেননি। ক্যাথারিন তাঁকে দশটি সন্তান উপহার দিয়েছে; কিন্তু সঙ্গিনী হতে পারেনি। খ্যাতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ডিকেন্সের সামাজিক দায়িত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। তার অংশ গ্রহণ করবার মতো গৃহিণী নেই। লেখা সম্বন্ধে দুটো কথা বলা যায় না। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন ডিকেন্স। সর্দি-কাশি, স্নায়বিক দুর্বলতা, পায়ে বাতের যন্ত্রণা এবং সর্বদা প্যারালিসিস হবার আশঙ্কা। এর জন্য যে সেবা-যত্ন প্রয়োজন, ক্যাথারিনের পক্ষে তার দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব ছিল না। তাঁর নিজের স্বাস্থ্যও এখন ভেঙে পড়েছে। একমাত্র রূপ দেখেই ডিকেন্স মুগ্ধ হয়েছিলেন। সেই রূপও হয়েছে অন্তর্হিত। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এখন আছে কেবল খিটিমিটি, সর্বদা অশান্তি। এলেন তাঁদের মধ্যে আসায় অশান্তি আরো বাড়ল।

এই অশান্তির মধ্যে লেখার কাজ অসম্ভব। তাই ক্যাথারিন এবং ডিকেন্স স্থির

করলেন তাঁরা পৃথক থাকবেন। শুধু বড় ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ক্যাথারিন চোখের জল ফেলতে ফেলতে অন্য বাড়ীতে চলে গেলেন। এরপর থেকে তাঁর জীবনে রইলো একমাত্র গৌরব. একদিন ডিকেন্সের মতো প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ভালোবেসে তাঁকে বিয়ে করেছিলেন !

অন্য ছেলেমেয়েদের নিয়ে রইলেন ডিকেন্স। তাঁর সংসার দেখতে রয়ে গেলেন জর্জিনা, ক্যাথারিনের কনিষ্ঠা ভগ্নী। নিজের ঘর বাঁধবার বাসনা ত্যাগ করে ডিকেন্সের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছেন। শান্ত, বুদ্ধিমতী এবং সকল কাজে তৎপর। ডিকেন্স নতুন লেখা তাঁকে পড়ে শোনাতেন ; কখনো বলে যেতেন, লিখে নিতেন জর্জিনা। ডিকেন্স জর্জিনার প্রশংসায় ছিলেন পঞ্চমুখ। এ কি জর্জিনার শুধুই নিঃস্বার্থ সেবা ? ভালোবাসার কোনো আকর্ষণ ছিল না ? হ্যাঁ, অভিযোগ উঠেছে দিদির কাছ থেকে। জর্জিনার মা-ও এই নিয়ে তিরস্কার করেছেন। কিন্তু সকল অপবাদ মাথায় করে জর্জিনা ডিকেন্সের সেবা করে গেছেন।

জীবনের শেষ ক'বছর ডিকেন্সের স্বাস্থ্য ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ছিল। যশ ও প্রতিষ্ঠা যত বাড়ছিল, তিনি যেন ততই অক্ষম হয়ে পড়ছিলেন। রানী ভিক্টোরিয়া আলাপ করবার জন্য ডেকেছেন তাঁকে। খুব সম্মানের কথা। কিন্তু রীতি অনুসারে দেড় ঘণ্টা যাবৎ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে হলো। রানীর সামনে বসতে নেই। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পায়ের ব্যথাটা অসহ্য হয়ে উঠল। মনে হলো সম্মানের চেয়ে স্বস্তি ভালো।

স্বাস্থ্য খারাপ হবার একটা বড় কারণ ছিল তাঁর উপর নানা দিক থেকে অর্থের দাবি। নিজের তো বৃহৎ সংসার। ছেলেরা কেউ তেমন কিছু সুবিধা করতে পারেনি। তাছাড়া ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন সকলেই সাহায্যের প্রত্যাশী। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে লেখার পরিমাণ কমে যাচ্ছে। সুতরাং আয়ের অন্য পথ বেছে নিতে হলো। অর্থের বিনিময়ে নিজের বই থেকে পাঠ করে শোনানো। নগদ টাকা পাওয়া যায় সঙ্গে সঙ্গে। পরিশ্রমও কম নয়। পড়তে পড়তে শ্রান্ত হয়ে পড়তেন। শ্রোতাদের সংবর্ধনা তাঁকে উৎসাহ দিত, প্রেরণা যোগাতো। প্রায় সাড়ে চারশ' পাঠের আসরে তিনি বিভিন্ন বই থেকে আবৃত্তি করে শুনিয়েছেন। প্রত্যেক আসরে তিনি পারিশ্রমিক পেতেন একশ পাউণ্ড। মৃত্যুকালে তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ ছিল তিরানব্বই হাজার পাউণ্ড। প্রায় অর্ধেকই উপার্জন করেছিলেন আবৃত্তি করে।

আটান্ন বছর বয়সেই ডিকেন্স একেবারে বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুন। সারাদিন 'এডুইন ড্রুডের' কাহিনী লিখেছেন। সন্ধ্যার সময় খাবার টেবিলে এসে বসেছেন। টেবিলের উল্টো দিক থেকে জর্জিনা তাঁর মুখে বেদনার চিহ্ন দেখে চমকে উঠল। ডিকেন্স একটু বেদনার সঙ্গে বললেন, ঘণ্টাখানেক যাবৎ বড় ব্যথা হচ্ছে। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন ; বললেন, আমাকে এখুনি একবার লণ্ডন যেতে হবে।

লণ্ডন দূরের কথা, একটি পা ফেলতে গিয়েই পড়ে যাবার উপক্রম হলো। জর্জিনা তাড়াতাড়ি ধরে না ফেললে মেঝেতে পড়ে যেতেন। সহচরদের সহায়তায় জর্জিনা ডিকেন্সকে সোফার উপর শুইয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো শ্বাসকষ্ট। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের কাছে খবর পাঠানো হলো। পরদিনও অচেতন অবস্থায় রইলেন। ছেলেমেয়ে, ঘনিষ্ঠ বন্ধু, এলেন টারনান—সবাই শেষ দেখা দেখতে এসেছেন। শুধু ক্যাথারিনকে খবর দেওয়া হয়নি। ৯ই জুন সন্ধ্যায় একটু নড়ে উঠল ডিকেন্সের দেহ। ডান চোখ থেকে একফোঁটা জল বেরিয়ে গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। আর সেই সঙ্গেই সব শেষ। মৃত্যুর পরে খবর পাঠানো হলো ক্যাথারিনকে। ক্যাথারিন আসেননি।

ডিকেন্সের ইচ্ছা ছিল তাঁর সমাধি হবে অনাড়ম্বর। দেশের লোক দাবি তুলল লণ্ডনে এনে যেখানে খ্যাতনামা ইংরেজ লেখকদের সমাধি—সেই ওয়েস্ট মিনস্টার অ্যাবিতে কবর দিতে হবে। এই দাবি মেনে নেওয়া হলো। কিন্তু শোকযাত্রায় কোনো আড়ম্বর হলো না। শুধু পরিবারের লোক এবং কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এঁদের মধ্যেও ক্যাথারিনকে দেখা যায়নি।

□ টলস্টয় □

রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ লেখক লিও নিকোলায়েভিচ টলস্টয়ের জন্ম ১৮২৮ ও মৃত্যু ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে। আমাদের মনে ভাবনা জাগে, কেন তাঁকে আজও স্মরণ করি? তাঁর জীবনে ও চরিত্রে নানা গুণের সমন্বয়। তিনি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক। সাহিত্যের একটি শাখাতেই নিবদ্ধ রাখেননি নিজেকে। লিখেছেন গল্প, উপন্যাস, নাটক, আত্মজীবনী, শিল্প-সমালোচনা, পাঠ্যপুস্তক এবং ধর্ম, দর্শন ও সমাজবিদ্যার বই। আবার শুধু লেখক নন, তিনি সমাজসেবী, শিক্ষক, ধর্মসংস্কারক, সৈনিক, সফল গৃহকর্তা এবং এক নতুন জীবনদর্শনের উদ্গাতা। অর্থাৎ এক জীবনে এক ব্যক্তির মধ্যে বহু ব্যক্তিত্বের সমন্বয়।

এর স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবেই তাঁর মধ্যে সমালোচকেরা পেয়েছেন স্ব-বিরোধিতার সন্ধান। প্রথম জীবনে যিনি ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ছিলেন, পরে তিনিই যুদ্ধের বিরোধিতা করেছেন। নিজে পড়া সমাপ্ত না করেই বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়েছেন; কিন্তু তিনিই নতুন পদ্ধতিতে গ্রামের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেবার জন্য স্কুল খুলেছেন, পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন। শিক্ষা-সংক্রান্ত পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। যৌবনে শিথিল জীবন যাপন করে বয়সে হয়ে উঠলেন পিউরিটান। স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক ছিন্ন করে শুরু করলেন সংযমের সাধনা। তাঁর চিন্তাধারাতেও আছে এমনি পরস্পরবিরোধী ভাবনা।

কিন্তু জীবনের প্রতি তাঁর ভালোবাসা কখনো শিথিল হয়নি। মৃত্যুর সাগর জীবনের দ্বীপটুকু ঘিরে রেখেছে, কবে মৃত্যুর ঢেউ এসে ভাসিয়ে নেবে, ডুবিয়ে দেবে —ঠিক নেই। সুতরাং এরই মধ্যে জানতে হবে জীবনের অর্থ কী, রেখে যেতে হবে এমন এক পুষ্ট সম্ভাবনাময় বীজ, যা জীবনকে শাশ্বত করে রাখবে। সত্য হলো সেই বীজ, যা জীবনের মন্থনদন্ড। জীবনের যা কিছু মহৎ তা সত্যই উদ্ভাসিত করতে পারে। টলস্টয় একথা শুধু বিশ্বাস করতেন তাই নয়, বিশ্বাসকে জীবনে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন, যেমন চেয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধী। তাই তাঁর সঙ্গে সংঘাত বেধেছিল সরকারের, চার্চের এবং পরিবারের। কিন্তু তাঁর সত্যের উপর আস্থা ছিল অবিচল। তাই আস্তাপোভা রেল স্টেশনে মৃত্যুর পূর্বে তাঁর মুখ থেকে শেষ যে কটি বিচ্ছিন্ন শব্দ শোনা গিয়েছিল তা হলো, 'Truth...I love much.... they all...'

টলস্টয়ের জন্ম ইয়াসনায়া পোলিয়ানায়, ৯ই সেপ্টেম্বর ১৮২৮। জন্মের কয়েক বছরের মধ্যেই মা ও বাবা দু'জনকেই হারালেন। মানুষ হয়েছেন ঠাকুমা ও পিসিমার কাছে। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চলে এলেন পিসিমার বাড়ী কাজানে।

তথাকথিত অভিজাত সমাজের সঙ্গে এখানেই তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটবার সুযোগ হয়। পার্টি, নাচ, হল্লার আকর্ষণ কিশোর টলস্টয়কে অনেকটাই ভুলিয়ে দিল ছাত্রজীবনের কর্তব্য। পড়াশুনায়, বিশেষ করে পাঠ্যপুস্তক পড়তে ভালো লাগত না তাঁর। সাত বছর পরে কাজান বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে ফিরে এলেন দেশের বাড়ীতে। অবশ্য এর মধ্যেই তিনি অভিজাত সমাজের জীবনযাত্রার উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছেন।

বাড়ী ফিরে নিজের প্রজা এবং ভূমিদাসদের অবস্থা উন্নয়নের জন্য কাজ আরম্ভ করলেন। কিন্তু হঠাৎ-আসা এই উপকারীকে গ্রহণ করতে দ্বিধা ছিল স্থানীয় লোকদের। তাঁর পরোপকারের উৎসাহে ভাটা পড়ল, আবার সেণ্ট পীটার্সবার্গে এলেন। এবার আর সমাজসেবা নয়। মদ, শিকার আর জুয়াখেলায় মত্ত হয়ে রইলেন। বেশীদিন এভাবে চলল না; দেনায় ডুবে থামতে হলো।

জীবিকা দরকার। দাদা কাজ করতেন সেনাবাহিনীতে। তিনি তাঁকে গোলন্দাজ বাহিনীতে ঢুকিয়ে দিলেন। সেনাজীবনের ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ তিনি লিখতে আরম্ভ করলেন। প্রথম বই 'চাইল্ডহুড' তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যপত্রে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। আত্মজীবনীমূলক আরো দুটি বই 'বয়হুড' এবং 'ইয়ুথ' বেরুলো পর পর। কিন্তু লেখক হিসাবে খ্যাতিলাভ করলেন 'সেবাস্তোপোলের গল্প' বেরুবার পর। যখন ক্রিমিয়ার যুদ্ধ চলছে, তখন যুদ্ধের ফাঁকে এই গল্পগুলি লিখেছেন।

সেনাবাহিনী থেকে বিদায় নিয়ে এলেন সেণ্ট পীটার্সবার্গে। টুর্গেনিভ এবং অন্য প্রতিষ্ঠিত লেখকদের সঙ্গে পরিচয় হলো। বেশ কিছুকাল লেখকদের সাহচর্যে কাটল। ভালো লাগল না এঁদের দলাদলি এবং সংকীর্ণচিত্ততা। বেরিয়ে পড়লেন দেশভ্রমণে। জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালী, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ ঘুরে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফিরে এলেন ইয়াসনায়া পোলিয়ানায়। যেসব ভূমিদাস তাঁর জমি চাষ করত, তাদের তিনি সকল বন্ধন থেকে মুক্ত করে দিলেন। ফ্রয়েবলের আদর্শানুযায়ী স্কুল খুললেন; নিজেই লিখলেন পাঠ্যপুস্তকের একটা সিরিজ। সফল হলো তাঁর উদ্যম। তাঁর স্কুলের আদর্শে নানা জায়গায় স্কুল গড়ে উঠতে লাগল। নানা কারণে দু'বছরের বেশী স্কুল চলেনি। গভর্নমেণ্ট এ উদ্যোগে সহায়তা না করে বাধা দিয়েছে।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে সোফিয়া বেহরকে বিয়ে করে সংসারী হলেন। তেরোটি সন্তানের পিতা। সংসারের প্রয়োজনে জমির পরিমাণ বাড়িয়েছেন। বিয়ের পর থেকে বছর পনেরো টলস্টয় ছিলেন রীতিমত সংসারী। এই সময়ের মধ্যেই তিনি লিখেছেন তাঁর বিখ্যাত দুটি বই—'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' এবং 'আনা কারেনিনা'। বিয়ের পর কুড়ি বছরের মধ্যে টলস্টয় সাত-আট লাখ টাকার সম্পত্তির মালিক হলেন। স্ত্রীর বিষয়বুদ্ধির জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে।

টলস্টয় সভয়ে একদিন উপলব্ধি করলেন, তিনি ধীরে ধীরে বিষয়-সম্পত্তি ও সংসারের নানা সমস্যায় জড়িয়ে পড়ছেন। অথচ তাঁর বিবেকের নির্দেশ বিষয়-বাসনা থেকে মুক্ত হবার! সেন্সারের কাজে, ভূমিসংস্কারের সালিশী করতে এবং দুর্ভিক্ষে ত্রাণ করতে গিয়ে নিচুতলার মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার সুযোগ হয়েছে তাঁর। সেই অভিজ্ঞতার মূল কথা হলো সম্পত্তির মালিকানাই সকল সামাজিক অন্যায়ের গোড়ার কথা। তাই মালিকানা ত্যাগই সামাজিক সুবিচারের প্রথম শর্ত।

নিজের জীবনে এই শর্ত পালনের উদ্যোগ করতেই দেখা দিল প্রচণ্ড বিরোধ। স্ত্রী এবং ছেলেরা রুখে দাঁড়াল। সম্পত্তির স্বত্ব ত্যাগ করা চলবে না। দীর্ঘকাল অশান্তি করে বাধ্য হলেন স্ত্রীর নামে সম্পত্তি লিখে দিতে। ১৮৮০ পর্যন্ত লেখা সমস্ত বইয়ের কপিরাইটও দিয়ে দিলেন। এর পরের বইগুলোর কোনো কপিরাইট সংরক্ষণ করলেন না, যার খুশি ছেপে প্রচার করতে পারবে।

সম্পত্তির দায় থেকে মুক্তি পেয়ে টলস্টয় তাঁর জীবনধারা পাল্টে দিলেন। মদ ও তামাক ছাড়লেন; কৃষকের পোশাক উঠল গায়ে; নিজের সব কাজ নিজের হাতে করা আরম্ভ করলেন। প্রতিদিন খুব সকালে উঠে মাঠে কাজ করতে যেতেন। ঠিক কৃষকের মতোই চাষ-আবাদের সব কাজ করতেন। শিখে নিলেন জুতো তৈরী করতে; এরপর থেকে পরতেন নিজের হাতে তৈরী জুতো।

'ওয়ার অ্যান্ড পীস' এবং 'আনা কারেনিনা' লেখার পর থেকে তাঁর রচনায় নতুন ধারা এলো। শুধু শিল্পসৃষ্টির জন্য লেখা নয়, নৈতিক আদর্শ পাঠকের নিকট তুলে ধরাই হবে লক্ষ্য। 'My confession', 'Resurrection', 'The Death af Ivan Ilyich', 'The Kreutger Sonata', 'The power of Darkness' প্রভৃতি গ্রন্থে এবং অনেকগুলি ছোটগল্পে নীতিগত বক্তব্যেরই প্রাধান্য। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে 'What is Art' গ্রন্থে তিনি শিল্প-সাহিত্যের বিচার করেছেন নৈতিক আদর্শের দৃষ্টিকোণ থেকে। অনেক বিখ্যাত সাহিত্যকীর্তিকেও তিনি অস্বীকার করেছেন শুধু নীতিবোধের অভাব লক্ষ্য করে। নীতিবোধ ও মানবপ্রীতি না থাকলে কোনো রচনাই মহৎ হিসাবে স্বীকৃতি পেতে পারে না। টলস্টয়ের আদার্শ অনুযায়ী হোমার, শেক্সপীয়রের অনেক রচনা এবং বীঠোভেন ও ভাগনার রচিত সঙ্গীত শিল্পপদবাচ্য নয়।

প্রচলিত খ্রীষ্টান ধর্মে তাঁর আস্থা ছিল না। তিনি বলতেন যীশুর প্রকৃত শিক্ষাকে বিকৃত করে চার্চ প্রচার করছে। যীশু ছিলেন অহিংসার প্রতিমূর্তি।

অথচ তুরস্কের সঙ্গে যখন রাশিয়ার যুদ্ধ চলছে তখন পাদরীরা জনসাধারণের সহায়তা লাভের জন্য প্রচার করতেন যীশুর নাম করে। বাইবেলে, তাঁর মতে, এমন অনেক কিছু আছে যা প্রক্ষিপ্ত। কেননা, এসব অযৌক্তিক। ধর্ম অযৌক্তিক হতে পারে না। যুক্তির অন্য নাম ঈশ্বর। তাঁর জীবনদর্শনের মূল কথা হলো: প্রতিদিন কাজ করতে হবে; অন্যের পরিশ্রমের উপর অলস জীবন-যাপন করা অন্যায়। এ শিক্ষা তিনি পেয়েছেন বাইবেল থেকে এবং নিজের জীবনে তা পালন করেছেন।

সরলতাই জীবনের সৌন্দর্য এবং শান্তির উৎস। রুশো তাঁকে শিখিয়েছেন, প্রকৃতির কোলেই সুখ, কৃত্রিম নাগরিক জীবন দুঃখের কারণ। এটা তাঁর নিজের জীবনেরও অভিজ্ঞতা, নাগরিক ও প্রাকৃতিক জীবনের প্রতি তুলনা তাঁর রচনায় অনেকবার ফিরে ফিরে এসেছে।

বাইবেল থেকেই শিখেছেন, 'দি কিংডম অব গড ইজ উইদিন ইউ'। ভগবান অন্তরেই বসে আছেন, সেখান থেকে নির্দেশ দেন, তা শুনে চললে জীবনে ভুল হয় না। মানুষকে ভালোবাসার, তাদের ভালো করবার জন্য ত্যাগের প্রেরণাও পেয়েছেন বাইবেল থেকে। ভালোবাসার সঙ্গে অহিংসা ও ত্যাগের বৃত্তি অচ্ছেদ্যরূপে জড়িত।

কিন্তু জীবন সম্বন্ধে টলস্টয় কোথায় কি বলেছেন, সেটা বড় কথা নয়। যা বলেছেন তা জীবনে প্রয়োগ করেছেন, কোথাও বা প্রয়োগ করতে চেয়ে সংঘাতের সম্মুখীন হয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা তাঁর বিশ্বাসের প্রচণ্ড শক্তি। কত ভালো ভালো কথা বইয়ের পাতায় বন্দী হয়ে থাকে। টলস্টয় জীবন সম্বন্ধে যা বলেছেন, নিজের জীবনে তা কার্যে পরিণত করেছেন ; বিশ্বাসের জোর না থাকলে এটা সম্ভব হত না। সমাজবাদ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা নিজের জীবনে প্রয়োগ করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁকে বলা হয় পৃথিবীর প্রথম 'প্র্যাকটিজিং সোসালিস্ট'।

রাশিয়ার জনসাধারণের সঙ্গে টলস্টয়ের যোগাযোগ ছিল। তিনি বুঝেছিলেন, বিপ্লব আসন্ন। কিন্তু তিনি মার্ক্সের মতো 'ইকনমিক ডিটারমিনিজম' কিংবা শ্রেণীসংগ্রামের কথা বলেননি। মুষ্টিমেয় পুঁজিবাদী বা সাম্রাজ্যবাদীর পীড়ন থেকে রক্ষা পাবার উপায় হলো প্রত্যেক নাগরিকের আত্মোন্নতি, তার নীতিবোধের বিকাশ। অহিংসা ও ভালোবাসা দিয়ে প্রতিপক্ষের শক্তির দুর্গে ফাটল ধরাতে হবে। অর্থাৎ, আসল কথা হলো আমাদের চরিত্র। ব্যক্তির চরিত্রবত্তা জাতিকে ঐশ্বর্যশালী ও শক্তিশালী করে—অন্য কিছুতে নয়।

এক অনন্যসাধারণ মহাপুরুষ হিসাবে টলস্টয়ের নাম ছড়িয়ে পড়েছে দেশে এবং বিদেশে। বহু লোক প্রত্যহ আসত তাঁকে দেখতে, তাঁর উপদেশ শুনতে। অনেকে প্রস্তাব দিল তাঁর আদর্শানুযায়ী নানা জায়গায় কলোনী গড়ে তোলবার। সেই কলোনীতে টলস্টয়ের শিষ্যরা বাস করবেন তাঁরই উপদেশ অনুযায়ী। টলস্টয় সম্মতি দেননি। গুরু বা তাঁর উপদেশ বড় নয়, বড় কথা হলো ব্যক্তির চরিত্রবত্তা। তিনি তাঁদের বোঝালেন, 'The truth that brings happiness cannot be preached ; it can be achieved only by individuals who honestyly look with in themselves.'

টলস্টয়ের মতামত সরকার ও চার্চের কর্তৃপক্ষ উভয়কেই বিরূপ করেছিল। চার্চ তো তাঁকে বহিষ্কার করেছে। তাঁর অনেক লেখা সেন্সর কর্তৃপক্ষ দেশে ছাপবার অনুমতি দেয়নি। 'রিসারেকসানের' পূর্ণ পাঠ ১৯৩৬-এর আগে রাশিয়ায়

প্রকাশিত হতে পারেনি। নানান প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে তাঁকে চলতে হয়েছে।

ঘরে-বাইরে নানা সংঘাতের সম্মুখীন হয়েও টলস্টয় জীবন-বিদ্বেষী হননি। জীবনকে তিনি গভীরভাবে ভালোবাসতেন। বিশেষ করে 'ওয়ার অ্যান্ড পীস' এবং 'আনা কারেনিনা'য় তিনি জীবনবিলাসী লেখক। ১৮০৫-১৪—এই কালখণ্ডের রাশিয়ার জীবন মূর্ত হয়ে উঠেছে 'ওয়ার অ্যান্ড পীসে'। নেপোলিয়নের রাশিয়া আক্রমণের প্রতিক্রিয়ার ছবি। সমাজের সকল স্তরের মানুষ এখানে স্থান পেয়েছে। ফ্রান্সের ও রাশিয়ার সম্রাট, সরকারী কর্মচারী, সৈনিক, অভিজাত সম্প্রদায়, কৃষক সবাই এসে ভিড় করেছে। আছে শহর ও গ্রামাঞ্চল। জীবনের সকল স্তর উপন্যাসের পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছে। আছে জন্ম, শৈশব, যৌবন, প্রেম, বিবাহ ও মৃত্যু। আছে তাঁর চেনা অনেক লোকের মুখ। নায়িকা নাতাশা তাঁর শ্যালিকা তানিয়াকে মনে পড়িয়ে দেয়। দুই পরস্পর-বিরোধী চরিত্র পীয়ের ও আন্দ্রে তাঁর নিজের চরিত্রের দ্বন্দ্বকেই রূপায়িত করেছে। যুদ্ধক্ষেত্রের এবং পারিবারিক জীবনের আশ্চর্য বাস্তব ছবি ফুটে উঠেছে বইয়ের পাতায় পাতায়। জীবনের এক চলন্ত মিছিল বই থেকে উঠে আসে। পাঠককে মুগ্ধ করে। অবশ্য মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্ত হয় পাঠকের মন—যেসব জায়গায় লেখক ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, সমাজ প্রভৃতি সম্বন্ধে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। যুদ্ধ শুধু রণাঙ্গনে নয়, গৃহাঙ্গনেও চলে। রণাঙ্গনের যুদ্ধ একদিন থেমে যায়, কিন্তু গৃহাঙ্গনের যুদ্ধ এবং সেই সঙ্গে জীবনপ্রবাহ চলে অনন্তকাল। তাই যুদ্ধ ও মৃত্যুর চেয়ে জীবন বড়।

শিল্পকর্ম হিসাবে 'আনা কারেনিনা' অধিকতর সার্থক। প্লটের যে ইউনিটি এখানে রয়েছে 'ওয়ার অ্যান্ড পীসে' তা নেই। প্রথমদিকে কিছুটা পেসিমিজমের ভাব থাকলেও শেষের দিকে তা পাঠকের মন থেকে দূর হয়ে যায়। আনা ও ভ্রনস্কির অবৈধ প্রণয় অনেকটা আড়াল করেছে লেভিন ও কিটির সুস্থ স্বাভাবিক প্রেম।

নিজের জীবনের বহু ঘটনা এবং চিন্তা-ভাবনা টলস্টয় তাঁর বইয়ের মধ্যে এনেছেন। স্ত্রীর সঙ্গে শেষ জীবনে তাঁর যে বিচ্ছেদ ঘটল, তার সূচনা কি 'ওয়ার অ্যান্ড পীসে' দেখা যায়? বিয়ের বছর তিনেক পরেই এ বইটি লেখা হয়। এত অল্পদিনের মধ্যেই কি তিনি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন?

'ওয়ার অ্যান্ড পীসে' প্রিন্স অ্যান্ড্রু পীয়েরকে বলছে, 'Never, never marry, my dear fellow...My wife is an excellent woman...but what would I not giye now to be unmarried,'

আরও বলা হয়েছে, নেপোলিয়নের স্ত্রী নেই বলেই তাঁর সাফল্য এসেছে। (হয়তো যুদ্ধে স্ত্রী সঙ্গে নেই বলে একথা বলা হয়েছে, অথবা প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর তখনও দ্বিতীয়বার নেপোলিয়নের বিয়ে হয়নি।) স্ত্রী নেই বলে

নেপোলিয়ন একান্ত মনে আপন উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য কাজ করতে পারেন। 'But tie yourself up with a woman, and like a chained convict you lose all freedom !...Drawing rooms, gossip, balls, vanity, and frivolity – these are the enchanted circle I can not escape from.' কাহিনীর শেষের দিকে নাতাশা দাবি করছে তার স্বামীর (পীয়ের) প্রতিটি মুহূর্ত তার জন্য অথবা পরিবারের জন্য ব্যয় করতে হবে।

টলস্টয়ের বিবাহিত জীবন শেষের দিকে যে সুখের ছিল না—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অবশ্য এর জন্য স্ত্রীর এবং তাঁর নিজের দায়িত্ব কতটা, তা নিয়ে মতভেদ আছে। তবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, সোফিয়া স্বামীর আদর্শ পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেননি। সম্পত্তির মালিকানা ত্যাগ করবার প্রস্তাব তিনি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন। মৃত্যুর তেরো বছর পূর্বেই টলস্টয় সংকল্প করেছিলেন, তিনি প্রাচীন যুগের হিন্দুদের মতো বানপ্রস্থ অবলম্বন করবেন। ঐ সময়টা ভগবানের কাছে যাবার জন্য প্রস্তুতির পর্ব। কিন্তু তেরো বছর বাড়ী ছেড়ে যাওয়া হয়নি। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এক রাত্রিতে নিঃশব্দে বাড়ী ত্যাগ করে চলে গেলেন, রেখে গেলেন ছোট্ট একটি চিঠি : আমার খোঁজ কোরো না, ফিরব না।

পরদিন সকালে সেই চিঠি পড়ে সোফিয়া উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেলেন। ছুটে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন বাগানের পুকুরে। অজ্ঞান অবস্থায় তাঁকে জল থেকে টেনে তোলা হলো। ২৯শে অক্টোবর স্বামীর অবস্থান অনুমান করে এক চিঠি লিখলেন। এই চিঠিতে স্বামীর প্রতি ভালোবাসা এবং নিজের ব্যবহারের জন্য অনুশোচনা—দুই-ই প্রকাশ পেয়েছে। তিনি লিখেছেন, 'Levochka, my dear one, my darling, return home ! Save me from a second suicide, Levochka my lifelong freind. I will do everything, everything, that you wish ! I will cast aside luxury, your freinds shall be mine, I will undergo a cure and will be mild, tender and kind, Do come back to me. You must save me.'

আস্তাপোভা রেলওয়ে স্টেশনে টলস্টয় নিউমোনিয়া রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। খবর পেয়ে স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, বন্ধুবান্ধব এসে উপস্থিত। কিন্তু যতক্ষণ টলস্টয়ের জ্ঞান ছিল ততক্ষণ ডাক্তাররা সোফিয়াকে তাঁর সামনে যেতে দেয়নি। এ নিয়ে সারাজীবন সোফিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

কিছুকাল পূর্বে টলস্টয় তাঁর দিনলিপিতে লিখেছিলেন, অহিংস উপায়ে ভালোবাসা দিয়ে সোফিয়াকে জয় করব।

দেখা হলে হয়তো এমনি কোনো কথা হত। সেটা হত টলস্টয়ের জীবনাদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে নভেম্বর (নতুন পঞ্জিকা অনুযায়ী) টলস্টয় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মৃত্যুর পরে দেখা দিল সমস্যা। রাশিয়ার চার্চ তাঁকে বহিষ্কৃত করেছিল। তাই শেষকৃত্যের করণীয় কাজে গির্জার পাদরীরা আসবে না। উপায় কি হবে? চার্চই পরামর্শ দিল, তোমরা আমাদের বলো যে, শেষ মুহূর্তে টলস্টয় চার্চবিরোধী কাজের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন, তাহলে আমরা যাব।

পরিবারের লোক তাই বলল। আর একবার মৃত্যু হলো টলস্টয়ের।